মহান্
ভারত

মহান ভারত

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

শ্রী-ভিক্ষু

ভারতী-প্রকাশ
কলিকাতা

প্রকাশনা : শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
ভারতী-প্রকাশ
৩০, আশুতোষ চাটার্জ্জী রোড
ঢাকুরিয়া—কলিকাতা-৩১

প্রস্তুতি : শ্রীচন্দ্রমাধব ভট্টাচার্য্য
১৪, শ্যামবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

সহযোগিতা : শ্রীগৌতম সেন

মুদ্রণ : শ্রীহেমন্ত কুমার পোদ্দার
পোদ্দার প্রিন্টার্স
৪এ, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট : শ্রীসুপ্রকাশ সেন

বাঁধাই : ওরিয়েন্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

প্রথম প্রকাশ : জন্মাষ্টমী' ১৩৫৯

মূল্য : সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

নিবেদন

'মহান ভারতের' দ্বিতীয় পর্বও বের হ'লো।

একটা কিছু বিরাট প্রচেষ্টার পেছনে যে শক্তি সেটা যতই দুর্ব্বল হোক- 'উদ্বাহুরিব বামন'সদৃশ স্পর্দ্ধা তার যতই ভঙ্গুর হোক, জন-চিত্তে তার প্রতি যতই শ্লেষ বা অনুকম্পার উদয় হোক তবু তার একটা সান্ত্বনা আছে।

সে আশা করে—যদি কোনদিন কোন এক অধিকতর শক্তিমান তার ভুল, ত্রুটি সংশোধন কোরে স্বয়ং সেই আদর্শে মহিমতর সৃষ্টির বিকাশ করেন।

আমারও উদ্দেশ্য তাই, কাম্য তাই, প্রার্থনা তাই।

আমার যা কিছু বক্তব্য সবই বলেছি প্রথম ভাগে। যাঁদের আশীর্ব্বাদ পেয়েছি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি, অপরাধ-স্খালনের জন্য ক্ষমাও চেয়েছি। তবু আবার বলি আমার অকৃতকার্য্যতার ব্রণ—ক্ষুর-ধারে নিশ্চিহ্ন করবার চেষ্টায় ক্ষতাহত না কোরে—বন্ধু ভাবে সংশোধন করুন। সে শুদ্ধি গ্রন্থের বিত্তে ও গ্রন্থকারের চিত্তে পরিপূর্ণ সার্থকতা ও শান্তি এনে দেবে।

ইতি— বিনীত

যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং
যঃ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যঃ
যশ্চ সর্ব্বময়ো নিত্যং
তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥

প্রশস্তি

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের আশীর্ব্বাণী ও উপদেশ লাভে যে গ্রন্থ ধন্য, তারকেশ্বর মঠাধীশ হৃষিকেশ স্বামীর স্নেহময় উৎসাহ বাণীতে যে লেখনী আপ্লুত, পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর, শ্রীতারাচরণ সাহিত্যাচার্য্য প্রভৃতি অসংখ্য গুণীগণের সাধু-বাদে যে গ্রন্থ অলংকৃত—যাহার প্রশস্তি-বাণীতে আধুনিক শিক্ষানুরাগী ও অধ্যাপকগণ মুখর—সেই গ্রন্থখানি পাঠ করিবার কৌতূহল আমারও হয়।

গ্রন্থের মাধ্যমে বুঝিলাম একখানি গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন বিষয়—বেদ, উপনিষদ, দর্শন বা তন্ত্রাদি শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত, কর্ম্মকাণ্ড ও ধর্ম্ম-সংস্কারের বৈজ্ঞানিক যুক্তি কিম্বা সামাজিক তথ্য, রাজনৈতিক রীতিনীতির কথা ও গণিত ও বিজ্ঞানাদির নানা প্রসঙ্গ এমন সহজ ও সরল ভাবেই আলোচিত হইয়াছে যে—এতাদৃশ একটি মহৎ কার্য্যের প্রচেষ্টার জন্য শ্রীইন্দুমাধব ভট্টাচার্য্যকে অভিনন্দন জানাই।

শ্রীভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্র ভগবানের করুণায় শ্রী-পূর্ণ হোক—এই আমার তৃপ্ত চিত্তের একমাত্র কামনা।

ইতি—

শ্রীমধুসূদন ন্যায়াচার্য্য

অধ্যাপক—সংস্কৃত কলেজ

কলিকাতা।

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে তু শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ
শব্দ ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি
গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতত্ত্বতঃ
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেৎ গ্রন্থমশেষতঃ।

(ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ্)

—শব্দব্রহ্ম আর পরব্রহ্ম দুটি বিদ্যাই জানবার কিন্তু পরব্রহ্ম জানবার অধিকার আসে শব্দব্রহ্ম জানবার পর। তাই শব্দব্রহ্মরূপ গ্রন্থাদি পাঠ ক'রে মন যখন পরব্রহ্ম লাভেরপথে এগিয়ে যাবে তখন ঐ গ্রন্থ— ঐ জ্ঞান ও বিজ্ঞান সব দূরে ফেলে দেবে, যেমন ধানগুলো ঝেড়ে নিয়ে বিচুলি বা খড় অনাদরেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়।

গ্রন্থোক্ত বিভিন্ন বিষয়

বিষয় পৃষ্ঠা

স্বস্তিবাচন

Dr. Gourinath Sastri
M. A., P. R. S., D. Litt.
Principal.

SANSKRIT COLLEGE
Calcutta.

ভারতের মহনীয় ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক আমরা— কথা-প্রসঙ্গে প্রায়ই আমাদিগকে সেই ঐতিহ্যের গৌরব অনুভব করিতে দেখা যায়। অথচ ভারতীয় ঐতিহ্যের স্বরূপ কি, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে আমাদের মধ্যে অনেকেই নিরুত্তর হইয়া থাকেন। বহু শতাব্দির পর আজ আমরা স্বাধীন হইয়াছি। নূতন উদ্যমে কর্মজীবনে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইয়াছি। এই অবসরে যদি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি ব্যাপক ও গভীর হয় তাহাতে আমাদের কল্যাণই হইবে।

শ্রীভিক্ষু প্রণীত মহান ভারত নামক গ্রন্থে সহজ ও সরল ভাষায় প্রাচীন ভারতের বৈশিষ্ট্যগুলি অপরূপ বৈচিত্র্যে রূপায়িত হইয়াছে। এই গ্রন্থ-পাঠে প্রত্যেক ভারতীয়ের সমূহ কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

প্রথম পর্ব্বে বলা হয়েছে সৃষ্টি-তত্ত্ব, সৌর-তত্ত্ব, আর্য্যসন্তানের ভারতে আগমন ও উপনিবেশ স্থাপনের কাহিনী এবং বেদ-উপনিষদের সারাংশের ইঙ্গিত। এরপর এই পর্ব্বে ভারতীয় দর্শনাদিশাস্ত্র, পুরাণ-প্রসঙ্গ এবং সমাজের ধর্ম্ম ও কর্ম্মকাণ্ডের নানাকথা বলা হচ্ছে।—

সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্
শান্তং শিবং অদ্বৈতম্

"অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।
বিশ্বজনার পায়ের তলে ধুলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গ ভূমি
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।"

—রবীন্দ্রনাথ

ধর্ম্মসূত্র ও কর্ম্ম-কাণ্ড

স্বর্গের দেবতা, আদি জনক জননীর সন্তান-সন্ততি এসে নামলেন ধরণীর ধূলায়। পঞ্চ নদীর ধারে ধারে—ব্রহ্মাবর্ত্তে, আর্য্যাবর্ত্তে তাঁরা উপনিবেশ বসালেন—দেশে দেশে অগ্নিস্থাপন করলেন, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে চল্লেন বেদ-গান। এই বেদই ছিল তখন তাঁদের একমাত্র সম্বল। সেই সম্বল নিয়ে তাঁরা গড়লেন সংসার। আবার সংসারের বাইরে—কাননে কান্তারে, নৈমিষারণ্যে স্থাপন করলেন আশ্রম। সেই সব আশ্রমেই উদ্গীত হ'লো ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মর্ম্মবাণী।

এই আশ্রমে থেকেই শিষ্যরা গুরুর কাছে পাঠ নিলেন—বেদ ও উপনিষদের পাঠ। এই আশ্রমই হ'লো জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থান। এ হ'লো আদি পর্বের কথা—যখন প্রথম দেবসন্তান 'আর্য্য' এলেন ভারতের বুকে।

ধীরে ধীরে তাঁরা এগিয়ে চল্লেন জ্ঞান হতে জ্ঞানান্তরে। শুধু পারলৌকিক কথা বা মুক্তির কথা নিয়েই আশ্রমে ঋষিরা জীবনপাত করলেন না, তাঁরা বাস্তব জগতে সৃষ্টি ও রক্ষণেরও কথা মানসচক্ষে 'দর্শন' করলেন। কিন্তু জ্ঞান তাঁদের সীমাবদ্ধ নয়, দৃষ্টি ছিল সুদূর-প্রসারী। তাই তাঁরা সৃষ্টিতত্ত্বাদির কথা নিয়ে পরম তত্ত্বের সঙ্গে তার সম্বন্ধ রেখে রচনা করলেন ষড়্‌দর্শন। আবার সংসারী লোকের কথাও তাঁরা ঐ সঙ্গে চিন্তা করলেন—আশ্রমের যজ্ঞ-কুণ্ডের পাশে বসেই গৃহীর আচার-বিচার নির্দেশ দিলেন। ষড়্‌দর্শনের পাশে এলো বিধি-নিষেধের অনুশাসন। এই অনুশাসন-নীতির অপর নাম হ'লো ধর্ম্ম-সংহিতা। মনুসংহিতা প্রভৃতি সেই সব গ্রন্থ ও অনুশাসনের মূলে তাঁরা ধর্ম্মকেই সার ধরেছেন। তাঁরা বল্লেন—

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো ন সত্যস্বিত্যতে পরম্
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যতি গচ্ছতি। (মনু)
নাস্তি সত্য সমোধর্ম্ম ন সত্যস্বিত্যতে পরম্
নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহবিত্যতে। (মহা)

ধর্ম্ম-জগতের প্রশস্তি বাক্য এ—ধর্ম্মের সমান সুহৃদ নেই, সত্যের সমান ধর্ম্ম নেই, আর সেই ধর্ম্মই সর্ব্ব দেবতা, সেই ধর্মানুচারী মানুষই দেবতার প্রতীক।

বেদ-পারগ বৈদিক আর্য্যসন্তান—ধীরে ধীরে বেদেরই পাতা থেকে বেদের সার কথা সংগ্রহ করে, সংসারের পথে নিত্যকার কর্ম্ম-ধারায়, জীবন-সংগ্রামের প্রতিটি ধাপে ধাপে বিবিধ অনুশাসন উপস্থাপিত করলেন। জীবনে আনলেন বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যই মানুষকে কর্ম্মজগতে অনুপ্রাণিত করলো। ধর্ম্মকে মূল ক'রে এই কাজের ধারা বেঁধে দিলেন মনু। তাই মনুসংহিতা হ'লো মর্ত্য-মানবের অতি প্রয়োজনীয় সংহিতা।

আমরা এবারে সেই সব কথাই ধীরে ধীরে বলবো।

বেদাঙ্গ

বেদ বা উপনিষদের পর প্রথম আলোচ্য বিষয় হ'লো বেদাঙ্গ।

অনেকের ধারণা বেদ উপনিষদ শুধু পরব্রহ্ম, অদ্বৈত উপাসনা বা সাধনার কথায় পূর্ণ। কিন্তু তা নয়।

জাগতিক সর্ব্ব বিষয়ের আলোচনা আমরা এই বেদাদি গ্রন্থে দেখতে পাই। কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক রীতি-নীতি, কি আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ, ব্রত—সাহিত্য, শিল্প, জ্যোতিষ, নাট্য, সংগীত, বাদ্য, প্রভৃতি সব কিছুরই বিশদ আলোচনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

এই বেদ-বেদাঙ্গের বাইরে বিশেষ কিছু নেই—যা আছে তারও ইঙ্গিত ঋষিরা এই সব গ্রন্থে দিয়ে গেছেন।

এই বেদাঙ্গকে প্রধানতঃ ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—কল্প, শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ।

কল্প-সূত্র

এই কল্প-সূত্রে আছে কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা। এই কল্পসূত্র-গুলিকেও তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্ম।

শ্রৌত কি? সরাসরি বেদ থেকে শুনে যে শ্রুতি তৈরী হয়েছিল —তারই মধ্যে যজ্ঞাদির যে বিবরণ ও নিয়ম তাই হ'লো শ্রৌত। বংশপরম্পরায় যা সকলে শুনে এসেছে, সেই শোনা কথায় অনুষ্ঠানাদি পালনকে শ্রৌত-সূত্র বলে। ঋষিরাও সে সব পালন করতেন।

যে অনুষ্ঠান গৃহীদের জন্যে পৃথক করে লেখা হ'লো—তার নাম গৃহ্যসূত্র। এ ছাড়া সামাজিক, পারমার্থিক এমন কি রাজনৈতিক নিয়ম-কানুনগুলোর কথাই আছে ধর্ম্মসূত্রে।

শ্রৌতসূত্র—হাজার হাজার বছর আগে কবে কে কি নিয়মে কোন্ যজ্ঞ করতেন আজ তা' নিরূপণ করা শক্ত, তবু গৌতম-সূত্রে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তা থেকে আমরা জানতে পারি, শ্রৌত যজ্ঞ চৌদ্দ রকমের। তার মধ্যে সাতটি যজ্ঞে হবি দ্বারা আহুতি করার উল্লেখ আছে। অপর সাতটিতে পাই সোমরসের প্রাধান্য। অগ্ন্যাধান, অগ্নিহোত্র, দশপূর্ণমাস, আগ্রহায়ণ, চাতুর্মাস্য, নিরূঢ়-পশুবন্ধ এবং সৌত্রামণী প্রভৃতি সাতটি যজ্ঞ, চরু ঘৃত প্রভৃতির দ্বারা করা হ'তো। আর অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র এবং আপ্তোর্যাম প্রভৃতি সাতটি যজ্ঞে সোমরসের ব্যবহারই প্রধান। প্রয়োজন অনুযায়ী এই সব যজ্ঞের বিবরণ শিষ্যেরা গুরুর কাছ থেকেই জেনে নিতেন এবং এই যজ্ঞাদি করতেন ও কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে।

গৃহ্যসূত্র—আশ্রমের বাইরে গৃহীর কাজ ছিল গৃহ্যসূত্রের অনুসরণ। এই অনুষ্ঠান ছিল তখন প্রতি গৃহীর নিত্য কর্ত্তব্য। সেইজন্যে এই যজ্ঞকে শ্রৌত যজ্ঞ থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হ'তো। এর অপর নাম পাকযজ্ঞ। এই পাকযজ্ঞ বা গৃহ্যযজ্ঞ সাত রকমের। পিতৃগণের শ্রাদ্ধ, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার ব্রতাদি, মাংসের দ্বারা অষ্টকা-শ্রাদ্ধ, শ্রাবণ মাসের শ্রাবণী যজ্ঞ, আশ্বিন মাসের আশ্বযুজী যজ্ঞ,

অগ্রহায়ণের জন্যে আগ্রহায়ণী ও চৈত্রের চৈত্রী যজ্ঞ—এই হ'লো গৃহীদের সপ্ত যজ্ঞ। অনেকের মতে আশ্বিনের আশ্বযুজীই আজকের কোজাগরী এবং আগ্রহায়ণীই বর্ত্তমানে নবান্ন।

এ ছাড়াও গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্রে অপর পাঁচটি মহাযজ্ঞ বা পঞ্চ-যজ্ঞের কথা আছে—এগুলি বিশেষ দিনের জন্যে নয়, প্রতিমাসের জন্যেও নয়—এ নিত্যকার যজ্ঞ। বড় বড় যজ্ঞ অনুষ্ঠান, ব্রত কামনায় বা মুক্তির জন্যে পরব্রহ্ম লাভের আশায় যা করা হ'তো, ঋষিরা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেছেন নিত্যকরণীয় এই কর্ত্তব্যকে।

ধর্ম্মসূত্রের বিধিতে এই কথাই বলা হয়েছে—যিনি আত্মসংস্কার বিশিষ্ট কিন্তু সদ্‌গুণবিশিষ্ট নন, তিনি পরব্রহ্মকে পাবেন না বা পরমলোকে যাবেন না। কিন্তু যিনি জীবনের অবশ্য করণীয় কয়েকটি কর্ত্তব্য মাত্র করেন তিনি পরব্রহ্ম লাভ করেন।

গৌতম বশিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রেও এ কথার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যত যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানই কর না কেন, মনে ও কর্ম্মে সদ্‌গুণ বিশিষ্ট না হলে বেদ ও বেদাঙ্গের কোনো উপদেশই কাজে লাগবে না।

সত্য, সদাচার আর ধর্ম্মই হ'লো হিন্দুধর্মের মূল কথা। সেই ধর্ম্মকে মূলে রেখে বা তাকে আদর্শ করে, ঋক্ সাম যজু সব বেদেরই পৃথক পৃথক কল্পসূত্র তৈরী হয়েছে। যাঁরা যে আশ্রমের বা যে গোষ্ঠীর তাঁরা সেই বেদের কল্পসূত্র মেনেছেন। আসলে সবই এক। আজ যেমন দেশভেদে বিয়ে-পৈতের নানা বিধি, নানা আচরণ দেখা যায় তেমনি দেখা যায় বিভিন্ন শ্রৌত্র বা গৃহ্যসূত্রে।

এবারে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাচ্ছে।

ঋগ্বেদীয় কল্পসূত্র

ঋগ্বেদীয় কল্পসূত্রের মধ্যে প্রধান দুটী আশ্বলায়ন ও সাঙ্খ্যায়ন সূত্র।

আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত এবং যজ্ঞাদির কথায় পূর্ণ।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে আছে মোট চারটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে

বিবাহাদি সংস্কার, অমাবস্যা পূর্ণিমাদির পার্বণ, গোদান, যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির রীতিনীতি—দ্বিতীয় অধ্যায়ে গৃহ-নির্ম্মাণ, গৃহ-প্রবেশ, আশ্বযুজী, আগ্রহায়ণী বা অষ্টক প্রভৃতি ব্রতপর্ব। তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চযজ্ঞের কথা। চতুর্থ অধ্যায়ে পিণ্ডদান, তর্পণ ও পিতৃযজ্ঞ ছাড়া নিত্যকর্ম্ম, ব্রহ্মযজ্ঞ, অতিথি-সেবা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কথা।

তাছাড়া প্রাচীনকালের বহু ঋষি মহর্ষির নাম ও বিবরণ এতে আছে, আর আছে যুদ্ধে আচরিত নিয়মাদির কথা, বিপদকালে আচরণীয় কর্ত্তব্য প্রভৃতি।

সাঙ্খ্যায়ন-সূত্র এরই একটু অদল-বদল মাত্র। এতেও আছে ছয়টি অধ্যায়। কিন্তু এই ছয়টি অধ্যায় সেই একই কথায় পূর্ণ, তবে দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন।

ঋগ্বেদীয় ধর্ম্মসূত্র

ঋগ্বেদীয় ধর্ম্মসূত্রের মধ্যে বশিষ্ঠের ধর্ম্মসূত্রই প্রধান। এতে আছে ত্রিশটি অধ্যায়। এই ত্রিশটি অধ্যায়ে আর্য্যাবর্ত্তের সীমা-নির্দ্দেশ, পাঁচটি মহাপাতক, ছয়টি বিবাহ, ভিন্ন ভিন্ন জাতির কর্ত্তব্য, বেদপাঠের আবশ্যকতা, স্ত্রী-ধর্ম্ম, নর-নারীর কর্ত্তব্য, ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থের আচরণীয় ধর্ম্ম, ভিক্ষুধর্ম্ম, আশ্রম চতুষ্টয়, উপনয়নাদি সংস্কার, অতিথি-সেবা, স্নাতকের ধর্ম্ম, খাদ্য-বিচার, পোষ্যপুত্র গ্রহণ, রাজকীয় বিধি, উত্তরাধিকার বিধি, মিশ্রজাতির তথ্য, রাজধর্ম্ম এবং প্রায়শ্চিত্ত, দান, দক্ষিণা প্রভৃতির কথা সবিস্তারে লিখিত আছে।

সামবেদীয় কল্পসূত্র

জীবনের ক্ষেত্রে যাঁরা সামবেদকে আশ্রয় ক'রে, নিজ গুরু-সন্নিধানে থেকে সামবেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন তাঁরা বেদ থেকে বেদাঙ্গকে করলেন পৃথক। এতে দু-একটি বিষয়ের কথা নতুন মনে হলেও সবই প্রায় এক।

সামবেদীয় শ্রৌতসূত্র তিনখানি—মাশক, নাট্যায়ন ও দ্রাহ্যায়ন। নাট্যায়ন সূত্রেও দেখতে পাই প্রায় একই কথা বলা হয়েছে। অবশ্য

দু-একটি নতুন কথা যে না আছে এমন নয়। যেমন মগধদেশীয় ব্রহ্ম-বন্ধুর কথা। যে সম্প্রদায় ব্রাহ্মণত্বকে অস্বীকার ক'রে ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করলেন তাঁরাই হলেন মগধদেশীয় ব্রহ্মবন্ধু। অনেকে বলেন, এ বিধান বৌদ্ধদের জন্যেই করা হয়েছিল।

যাই হোক, এই নাট্যায়ন মতবাদ গ্রহণ করলেন কৌথুমী শাখা আর দ্রাহ্যায়ণ মতবাদ নিলেন রাণায়ন।

সামবেদীয় গৃহ্যসূত্রের মধ্যে গোভিল গৃহ্যসূত্রই প্রধান ও খ্যাত। সাধারণভাবে আজ এইটিই প্রচলিত। এতেও আছে চারটি প্রপাঠক।

প্রথম প্রপাঠকে আছে যজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, দশপৌর্ণমাসী প্রভৃতি অনুষ্ঠানের কথা। দ্বিতীয় প্রপাঠকে পাই বিবাহাদি সংস্কার। তৃতীয় প্রপাঠকে ব্রহ্মচর্য্য, গোপালন, গো-যজ্ঞ, অশ্বযজ্ঞ, শ্রাবণী, এবং চতুর্থ প্রপাঠকে নানারূপ কাম্য-সিদ্ধির উপায় বর্ণনা, গৃহ-নির্ম্মাণ প্রভৃতির কথা আছে।

সামবেদীয় ধর্ম্মসূত্রের মধ্যে গৌতমীয় ধর্ম্মসূত্রই প্রধান। আটাশটি অধ্যায়ে তা বিভক্ত। বিবাহ, জাতি-বিচার, অভিবাদন, আপৎকালে কর্ত্তব্য, আত্ম-সংস্কার, স্নাতক-ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, রাজকীয়-বিধি, বিচার, সাম্য, শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার, খাদ্য-বিচার, উত্তরাধিকার-তত্ত্ব, এবং প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির কথা এই সূত্রে আছে। আবার অষ্টবিধ বিবাহের কথাও এতে আছে। তার মধ্যে ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ, দৈব উৎকৃষ্ট—এবং গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ অপকৃষ্ট।

মিশ্র জাতি বলে ধর্ম্মসূত্র সে যুগেই আঠার রকম জাতির উল্লেখ করে গিয়েছেন। যেমন—অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ, দৌষ্যন্ত, পারাশব, সূত, মাগধ, আয়োগব, ক্ষত্তা, বৈদেহক, চণ্ডাল, মূর্ধাবসিক্ত, ধীবর, পুল্কস, ভূজ, কণ্ঠ, মাহিষ, যবন ও করণ।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় কল্পসূত্র

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় কল্পসূত্রের মধ্যে বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব ও হিরণ্যকেশী সূত্রগুলিই প্রধান। এদের মধ্যে বৌধায়ন সম্ভবতঃ

প্রাচীন। উনিশটি প্রশ্নে তার শ্রৌতসূত্র ও চারটি প্রশ্নে গৃহ্যসূত্র এবং চারটি প্রশ্নে ধর্ম্মসূত্র পূর্ণ। অন্যান্য কল্প ও গৃহ্যসূত্রের মতন এতেও পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের বিবিধ বিবরণ আছে।

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় কল্পসূত্র ঃ—শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় কল্পসূত্র মধ্যে কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ও পারাশর গৃহ্যসূত্রই প্রধান।

এইসব কল্পসূত্রাদির বিবরণে বোঝা যায় প্রাচীন আর্য্য-সন্তানগণ জীবনের সারা পথটাই নিয়ম ও সংযমে এবং রীতিনীতির শৃঙ্খলে বেঁধে চলেছেন। নিয়ম বা সূত্রগুলি এমনভাবেই রচিত যে, গুরু শিষ্যকে এবং গৃহী তাঁর আপন সন্তানকে অতি সহজেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেই নিয়ম-পথেই তারাও নিজেদের জীবনকে বেঁধেছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত—ইহলৌকিক নীতি পারলৌকিক তত্ত্বকথায় বেদ-বেদাঙ্গ পূর্ণ। দেশ ভেদে জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে তার আচার-বিচার ভিন্ন বলেই বিভিন্ন সূত্রের হয়েছে প্রয়োজন। এই কারণেই বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হয়েছে। যেমন—কৃষ্ণা ও গোদাবরী তীরে এবং অন্ধ্র প্রদেশে আশ্বলায়নী শাখা, আপস্তম্বী শাখা এবং হিরণ্যকেশী শাখা। আবার গুর্জর প্রদেশে সাঙ্খ্যায়নী ও মৈত্রায়ণী এবং অঙ্গ বঙ্গ ও কলিঙ্গে মাধ্যন্দিনী শাখা এবং কৌথুমী শাখার প্রসার। এবার দেশ ও জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিভিন্ন মতবাদে বিবাহাদি সংস্কারের বিবিধ বিবরণের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করবো, তবে তার আগে আমাদের জানা দরকার জাতি ও বর্ণবিচার। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মূল কথা না জানলে তাদের আচরণীয় ধর্ম্ম কি তা জানা যাবে না।

জাতি-তত্ত্ব

এই জাতির কথায় বলতে হবে প্রথমে আমরা দেববংশোদ্ভূত মানব জাতি। কিন্তু এই মানব জাতিকে আমরা নানা ভাগে ভাগ ক'রে নিয়েছি। যেমন আমরা বলি আর্য্যজাতি বা হিন্দুজাতি। আবার এই হিন্দু জাতিও ভাগ হয়েছে মালব, গুর্জ্জর বা বাঙালী জাতিতে। আরও বিভেদ বেড়েছে ব্রাহ্মণ শূদ্র নিয়ে।

কিন্তু প্রকৃত জাতি শব্দের অর্থ কি ? শ্রেণী, বর্ণ, গোত্র, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়—কত কথাই না এই একটি 'জাতি' শব্দে নিহিত ।

প্রাচীন শাস্ত্রে আমরা আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই জাতির উল্লেখ দেখতে পাই। আর পাই মিশ্র জাতির কথা। এই মিশ্র জাতির কথা আমরা গৌতম ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। আর্য্য ও অনার্য্যের সহজ অর্থ না হয় বোঝা গেল। যাঁরা আর্য্য হয়েও ক্রিয়া-কর্ম্ম না করে নাস্তিক হ'ল তারা অনার্য্য। কিন্তু আর্য্যও নয় অনার্য্যও নয়—অর্থাৎ যাঁরা গেলেন দূর-দূরান্তরে সাগরপারে, তাঁদের তবে বলবো কোন্ জাতি ? বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায় এ না হয় ভারতের মাটির জিনিস—কিন্তু জাতি ? মানবজাতি বলতে তো পৃথিবীর সকল মানুষকেই বোঝায়। যেমন—চীন, তাতার, জার্ম্মান প্রভৃতি। তাই জাতির বিচার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

সৃষ্টি-পরিক্রমায় জীবের মধ্যে পূর্ণায়ত জীব মানবের হ'ল উদয়। আর এই মানবের মধ্যেই হ'ল বিভিন্ন জাতি। এখন একটি কথা, সাধারণতঃ ছেলে বাপের মতনই আকৃতি পায়। এই বাপের মতন ছেলে বা বাঙালীর আকারেই বাঙালী অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার আকার বা কাছাকাছি আকার নিয়ে স্বায়ম্ভুব, বৈবস্বত কশ্যপ হ'ত কি সব একই রকম ? না—তা তো হয়নি। যত রকম মানুষ তত রকম চেহারা—আবার সে রকমটিও দেশ ভেদে প্রাকৃতিক আব-হাওয়ায় ভিন্ন হয়েছে। দুনিয়ায় সব মানুষই এক থেকে হ'লে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিল কেন ? নরসিংহ ও মহিষাসুর, ইন্দ্র আর বিশ্বামিত্র, রাবণ আর ধ্রুব, হনুমান আর প্রহ্লাদ নিশ্চয় এক রকম ছিলেন না। এই ভিন্ন ভিন্ন রূপ যদি ভিন্ন ভিন্ন 'জাতি' নাম পেয়ে থাকে তবে আবার নিষাদ, অনার্য্য, চণ্ডাল, পারশব, পারদ অথবা বঙ্গবাসী, গুর্জরবাসী নামগুলোরই বা মানে কি ?

আবার ইংরাজ আর চীন জাতি এও ভুল। তাই আধুনিক বৈজ্ঞানিকরাও বলে থাকেন যে—"জীববিদ্যায় দৈহিক গঠনের

ভিত্তিতে প্রাণী ও উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ অর্থেই জাতি শব্দ ব্যবহার করা উচিত।" অন্যগুলো শ্রেণী-বিভাগ মাত্র।

এখন এই যে গঠন, রূপ, আকৃতি এও যদি বাপ থেকে ছেলেতে হুবহু বর্ত্তাতো তবে তো আদিম পুরুষটির মতনই সবাই হ'ত। তাতো নয়। একটু-আধটু বদলে তো যাবেই। তবে মানুষের ছেলে ভালুকের মতন হবে না। মানুষের মতন মাথা, চোখ, চোয়াল হাত পা সব হবে—একটু হয়তো অদল-বদল হবে। আর তা প্রকৃতি এবং আরও দু'একটা কারণের জন্য।

সব জীবের সব জন্তুর স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমের ফলেই হয় সন্তান। মানুষের সঙ্গমে মানবীয় যৌন-কোষে মানবের দেহস্থ বীর্য্য যখন মিলিত হয় তখন বীজাণু মানব-জীব সৃষ্টি সুরু করে। অধুনা-খ্যাত 'জীন' নামের কতকগুলি জিনিস সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম রূপে তাতে মিলে গিয়ে 'ক্রোমোসোম' বা বর্ণরূপ নামক একটা জিনিস তৈরী হয়। আর তাও ৪৮টি টুকরা। এই টুকরাগুলোই প্রথম থাকে সরু কাঠির মতন তারপর হয় পুষ্ট। এরাই পিতার ন্যস্ত ধন—মাতার গর্ভে আগত সন্তান সৃষ্টির জন্য। এখন ঐ যে 'জীন' অংশগুলি এরা সকলেই প্রধান হয় না। আবার সমান সংখ্যক 'জীনে'ও, কোনও ক্রোমোসোম গঠিত হয় না। তাতে কম-বেশী থাকেই। আর সেই 'জীনের' সংখ্যার কম-বেশীতে আর ভগবানের বিচিত্র খেয়ালে জীনের আভ্যন্তরিক রসায়নের কিছু অদল-বদল হয়, তাকে আধুনিক পণ্ডিতেরা বলেন 'মিউটেশান', গুণান্তর বা রূপান্তর। এখন এই বিভিন্ন সংখ্যার 'জীনে' গঠিত ক্রোমোসোমের রূপান্তরিত পরিণতিতে যে দেহাবয়ব তৈরী হয় তারও অদল-বদল হয়। অতএব একই পিতার একই স্ত্রীর গর্ভে বিভিন্ন সন্তান একটু অদল-বদল হয়, আবার অন্য স্ত্রীর গর্ভে রূপ আরও বদলায় নিছক প্রকৃতির খেয়ালে। একই পুরুষের বীর্য্যে বা একই স্ত্রীর গর্ভে আবার দেশ-ভেদে শিশু আরও বদলাবে, আবার পিতা যদি বদলে যায় রূপান্তর আরও ঘটবে।

তবেই মোটমাট মূলে সেই সৃষ্টিকর্ত্তার খেয়ালেই জীনের মিলন ও রূপান্তরে অদল-বদল হয়। কেন হয় তা আজও আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্ বলতে পারেন নি। জীন নির্ব্বাচনের পদ্ধতি তাঁদের অজ্ঞাত।

তাহলেও একথা আধুনিকেরা মেনে নিয়েছেন যে বংশগত ধারায় আসা সন্তানের রূপের যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে তা কোন অজ্ঞেয় পুরুষেরই লীলা।

এদিকে সৃষ্টিতত্ত্বে জীবের আবির্ভাবের কথা বলতে গিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান বল্লেন ইতিহাসের 'তৃতীয় যুগে' 'ড্রায়োপিথেকস্' নামক এক শ্রেণীর প্রাণী ছিল। তবে আগের দুই যুগ? সেই আদিম সৃষ্টি? হয়তো তা অনন্ত শয্যা ও কমলবৃন্তে ব্রহ্মা বা অন্ততঃ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহের যুগই বা হবে; আর হয়তো সেই মধু-কৈটভের যুগেরই জীব ঐ ড্রায়োপিথেকস্। এরা মুঠো করে গাছ ধরে নানা দিকে ঘুরতো। এই ভূজ-চল-শীল প্রাণীগণই হ'ল মানুষ। বরাহ অবতারের পরেই তো নরসিংহ, মহিষাসুর, এমন কি জম্বুবান বা হনুমান। মৎস্যাদি দুই যুগ কাটিয়ে তৃতীয়ে এলেন এরা।

সে যুগের অদ্ভুত সেই সব জীবের কঙ্কাল ও চোয়ালও নাকি পেয়েছেন এ যুগের পণ্ডিতরা। যাক্ শেষ ঐ হনুমান থেকেই—ড্রায়োপিথেকাস্-বংশধর কপি-মানব বা এপ্ ম্যান থেকেই মানুষ পূর্ণরূপ পেল নরদেহ। বুদ্ধিও হ'ল পূর্ণ। তাই আমরা যখন বায়ু-নন্দনকে বুদ্ধিমান বলে নমস্কার করলাম, মহাবীর বলে পূজা করলাম, আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্ নাম দিলেন হোমোসোপিয়ানস্ অর্থাৎ 'বিজ্ঞ-মানব'। 'বিজ্ঞ-মানবের' আগের যে দল তার মধ্যে 'কপি-নর'কে তাঁরা বল্লেন পিথেকান্থ্রপাস্ বা 'জাভা-মানব'—তারা নাকি দক্ষিণে চলে গেছে। আমাদের পুরাণেও দক্ষিণ আগলে বসেছিল বালী ও সুগ্রীবের দল।

তার পরেই তাদের মতে 'সিনান্থ্রোপাস্' চীন-নর বা পিকিন-মানব। আমাদের পুরাণেও বলে তখন ইলাবৃতবর্ষে অথবা চীনের

কাছাকাছি জায়গায় ইন্দ্রে থেকে বলীরাজ পর্য্যন্ত ধারা চলে আসছে। কারণ তার পরেই তো 'বামন-অবতার'—'পিল্টডাউন' মানব। যার নাম আধুনিক নৃ-তত্ত্ববিৎ বল্লেন এয়োয়ানথ্রপিস্ বা 'উষানর' আইরিস্ বা আর্য্য সেই সময় থেকেই যেন এগিয়ে চল্ল ত্রিপাদ ভূমির কোলে—ত্রিভুবনে। তখনই তো তারা 'বিজ্ঞ-মানব' বা 'হোমো-সোপিয়ানস্'। অতি আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্ বল্লেন এই সময়ই হ'ল প্রকৃতির চরম বিপর্য্যয়। সে সেই 'আইস্ এজ'—হিমযুগ। সে যুগের প্লাবনে অর্দ্ধ-নর বা নরসিংহ বা বন-মানুষ প্রভৃতির দল লুপ্ত হয়ে যায়। তারপর সেই সৃষ্টিধারা থেকে বর্ত্তমান মানবের উৎপত্তি।

এ পর্য্যন্ত সৃষ্টিক্রমে অন্যান্য জীব থেকে মানুষ হ'ল বটে তবে তার আদি-পুরুষ একই।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বল্লেন "একই আদি পুরুষ হইতে উৎপন্ন এবং নির্ব্বাচন প্রভাবে সংরক্ষিত কতকগুলি বংশগত লক্ষণ, এক একটি মানব-গোষ্ঠীকে স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত করে। এইরূপ এক একটি গোষ্ঠী বুঝাইবার জন্যই বিজ্ঞানে 'জাতি' শব্দ ব্যবহার করা হয়।"

তবে বংশবৃদ্ধি, খাদ্যের অভাব, গৃহযুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ—এই সকল কারণে মানুষ দলে দলে দূর দেশে গিয়ে বাস করতে বাধ্য হয়। যাযাবর মানুষ নূতন বাসভূমির সন্ধানে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। এতে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের লোকেরাই পরস্পর যৌন-বন্ধনে আবদ্ধ হবার সুযোগ লাভ করে। ফলে অসংখ্য মানব মূর্ত্তি উৎপন্ন হ'য়ে ক্রমে ক্রমে লোকালয় পূর্ণ করেছে। মানুষ এখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ছোট ছোট পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে বাস করলেও এদের সকলের মধ্যেই ক্রমিক সাদৃশ্যের যোগসূত্র পাওয়া যায়। বোঝা যায় সবই সেই এক মানব-গোষ্ঠী, সবই সেই প্রাচীনতম আর্য্য-সন্তান।

এখন ভারতের বুকে, আগে বা পড়ে এসে যারা ঠাঁই নিল তাদের মধ্যে অবয়ব, গুণ, প্রকৃতি ও বৃত্তিগত পার্থক্য ধরে যে জাতি-বিচারে বর্ত্তমান নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ উপস্থিত হয়েছে—তা' একটু জানা দরকার।

তাঁরা বলেন মোটমাট সমস্ত ভারতীয় মানবগণকে ৬টি ও ১০টি জাতি বা উপজাতিতে ভাগ করা যায়।

১। নিগ্রোবটু জাতি (নিগ্রীটো)—মাথায় ছোট পাকান চুল, খর্ব্বকায়। এদের দেখা যায় আন্দামানে, কোচিন ও কানাড়া। বাইরের সংমিশ্রণে এদের মৌলিকত্ব অনেকটা নষ্ট হলেও এখনও এদের অস্তিত্ব বর্ত্তমান। বৃক্ষ বা অশ্বত্থাদির পূজা এদের দ্বারাই প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়।

২। আদি-অস্ত্রাল জাতি (প্রোটো-অষ্ট্রেলিয়ড)—এই অস্ত্রাল কথাটা যারা প্রথম অস্ত্র ব্যবহার করেছে তারা, না যাদের সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার সাদৃশ্য আছে তারা কে জানে? তবে এ অনেকটা নিগ্রোদেরই মতন। এদের চুল তত কুঞ্চিত নয়, ঘনত্বেও কম। পুলায়ান, ইউরাল, রেওয়ার, বইগা প্রভৃতি জাতি এদেরই ধারা। ঝাড়-ফুঁক, খাদ্যাদির বিধি নিষেধ, যাদু-বিদ্যায় বিশ্বাস, পংক্তি ভোজন, সগোত্র-বিবাহ এ সবই যেন এদের দান।

৩। মঙ্গোলীয়—চোখের কোণ উঁচু, তির্য্যক্ কটাক্ষ, মুখে গায়ে স্বল্প লোম, নাক যেন ঠিক বাড়তে পারেনি। তিব্বত ও সিকিমের মধ্যে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এদের কয়েকটি উপজাতি আছে। (ক) তিব্বতীয় মঙ্গোলীয়—তিব্বতীয়রা এদের প্রধান নিদর্শন। (খ) প্রাচ্য মঙ্গোলীয়দের আবার দুই শাখা, একটি আসাম বা ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে আছে। একটি থাকে ব্রহ্মদেশে। সেমা, লিপু ও লেপচা জাতিরাই এদের আদর্শ। মঙ্গোলীয়রাই এদেশে রেশম, কাগজ, চা-এর ব্যবহার সুরু করেছে প্রথম। গোষ্ঠী-গৃহ যেমন এদের প্রচলন—তেমনই নর-মুণ্ড শিকারই এদের খেয়াল ছিল।

৪। ভূ-মধ্য শ্রেণী—যে দল চলে যায় ভূমধ্যসাগরের দিকে। ভারতের একদল লোকের সঙ্গে এদের অদ্ভুত মিল আছে। মৃৎ-শিল্প, নারকেল ও আনারস চাষ এদের দ্বারাই প্রচলিত হয়। নরবলি প্রথাও প্রচলিত ছিল জমির উর্ব্বরা শক্তির বৃদ্ধির ব্যবস্থায়। এদের

মধ্যে মাতৃ-সত্তা বা নারী-প্রাধান্যের রীতি ছিল। এদের মধ্যে একদল প্রত্ন-ভূ-মধ্যশ্রেণী। এরা ঐ মাদুরার তামিল, কোচিনের নায়ার ও ভিজাগাপট্টমের তেলেগুদেরই মতন।

জার্মানীর এক পণ্ডিত তো নিগ্রোদের সংমিশ্রণে এদের 'মিলা-নিড' জাতি বলে পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তা মনে হয় না। এদেরও নাকে মুখে লোম অল্প, মাথার খুলি থেকে মুখ সরু, চুল কোঁকড়ান। তবু মনে হয় এরা অপেক্ষাকৃত সভ্য। এদের দেশটাকে আমরা পরশুরাম তীর্থ বলি। তার মানে 'কুঠারযুগ' বা প্রথম সভ্যযুগের আদিমাবস্থা।

ভূ-মধ্য সাগরীয় জাতি—বর্ত্তমান নম্বুদ্রি, মারাঠা, উত্তর পশ্চিম ও বাঙলার ব্রাহ্মণ অধিবাসীরাই প্রধান। অধিকতর সভ্যতা যেন এদের মধ্যে জেগে উঠেছে।

প্রাচ্য জাতি—'ওরিয়েণ্টাল' বলতে আমরা এখন যা বুঝি—এরা তাদেরই উদাহরণ।

পাশ্চাত্ত্যগণ এদের প্রাচ্য বলেছেন বটে কিন্তু অনেকে এদের সৌমিত জাতিও বলেছেন। নাক নিটোল ও সুন্দর। এদের আকৃতির মূলগত ঐক্য পাওয়া যায় ইহুদিদের মধ্যে। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রী, গুজরাটের নাগর পাঠান ও সিন্ধুর পুঞ্চ জাতি এদেরই জাতি। যতদূর মনে হয় এদেশে এই সময়ই সিন্ধু উপত্যকায় পুরাতন সভ্যতা প্রচলিত হয়। ভারতের সংস্কৃতি অনেকাংশে সেই ভূ-মধ্য শ্রেণীর আর্য্যগণেরই দান। ঘর বাড়ী তৈরী, ছবি আঁকা, মাটির বাসন তৈরী, জ্যোতিষ প্রভৃতির জন্যই ভারত যেন প্রথম ঋণী এদের কাছে।

এছাড়া আরও যে দু'টি জাতির উল্লেখ দেখি তাদের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের দু' একটি জাতির এত মিল যে সেই নামেই এদের নামকরণ হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রধান দু'টী। (১) পাশ্চাত্ত্য হ্রস্ব কপাল—(নর্ডিক), (২) প্রাচ্য হ্রস্বকপাল—নর্ডিক।

৫। পাশ্চাত্ত্য হ্রস্বকপালদের মতনই আছে কয়েকটি জাতি।

(ক) আল্পীয়—আল্পস্ পর্ব্বতের অধিবাসীদের সঙ্গে মেলে। তাদের বলা হয় আল্পীয়, বেশ মোটাসোটা, মুখে দেহে লোম প্রচুর। মাথা মুখ ছোট ও চওড়া। দেহের গড়ন বলিষ্ঠ।

(খ) দিনারীয়—দিনারীয় জাতির সঙ্গে এদের মিল। এদের আকার আরও দীর্ঘ, নাকের ডগা বাজপাখীর মতন সামনে ঝোঁকা।

(গ) আর্ম্মেনীয়—আর্ম্মেনীয়দের মতন। নাকের গঠন ও গায়ের লোম যেন আরও বেশী। এই রকম পাশ্চাত্ত্য জাতির আদর্শ আজও পাওয়া যায়— বেলুচিস্থানের ব্রাহুই, কাথিয়াবাড়ার বণিক ও বাংলার বাঙালী কায়স্থ এবং মাতুরা অঞ্চলের তামিল চেট্টোদের মধ্যে। কেহ কেহ বলেন বাঙলা ও গুজরাটের ধর্ম্মভাবের প্রবাহ এদেরই ভক্তি-উল্লাস থেকে প্রবাহিত।

(৬) প্রাচ্য হ্রস্ব-কপাল বা নর্ডিক জাতি—যে আর্য্যের দল ভারতে এসে পূর্ব্বকথিত জাতিদের পরে উপনিবেশ সুরু করে—তাদের মধ্যে একদল তো ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব, আর্য্যাবর্ত্তে, ব্রহ্মাবর্ত্তে, ছড়িয়ে পড়ল। অন্যদল ছিটকে গেল উত্তর পশ্চিম দিকে। সেখানে মিশ্রণ হ'ল ব্রাত্যদের সঙ্গে, তবে রয়ে গেল সেই সুগঠিত দেহ, দীর্ঘ চেহারা নিয়ে—এরাই নর্ডিক জাতি। নাক, চুল, লোম, গঠন সবই এদের সুগঠিত ও দীর্ঘ।

চিত্রালের খো, খালাস বা লাল কাফির এদেরই চিহ্ন। ভারতীয়ের সঙ্গে এদের সম্বন্ধও বহুদিনের। এই জাতিই আমাদের দিল ঘোড়া আর লোহার ব্যবহার। সমর ব্যবস্থার চরম সম্পদ। দুধ আর মদ, পাশা আর রথ, দৌড় বা রেস। সেলাই করা পোষাক সব এল এদের কাছ থেকে। আর পিতৃ-সত্তা বা পুরুষ-প্রাধান্য কায়েম হ'ল। নর্ডিক বা উদীচ্য জাতির শ্রেষ্ঠ দান আর্য্য-ভাষা। যত কাব্য, মহাকাব্য এই যুগে সুরু।

এইভাবে আর্য্য জাতি বৈদিক যুগ থেকেই—ব্রহ্মাবর্ত্তে, আর্য্যা-বর্ত্তে, সিন্ধু উপত্যকায় ও গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে ছড়িয়ে পড়লো।

ক্রমে ছড়াল হিমালয়ের কোলে—বিন্ধ্যপর্ব্বতের পারে, দাক্ষিণাত্যে, এমন কি বহির্ভারতে।

ভারতে এক এক জাতি এমনই করে এক এক অঞ্চলে বসবাস সুরু করলো। আর তাদের ভাষাও সর্ব্বত্র একই হ'লো না। কারণ ভাষা আর সামাজিক প্রথা বংশধারায় আসে না। তা অর্জ্জন করতে হয়। এক ভাষার স্থলে অন্য ভাষা শেখা যায়। কারণ সে আবার সংস্কার বদলাতে পারে। পারে হিন্দু মুসলমান হ'তে। কিন্তু নেপালীর দেহের গঠন কিছুতেই বাঙালীর মতন হবে না। রক্তের মিশ্রণে এল যে আকৃতির পার্থক্য, তাই নিয়েই হ'ল জাতি নির্ণয়—তারপর এল শিক্ষা স্বভাব, ভাষা ও কৃষ্টি। একজন বিভিন্ন ভাষা শিখতে পারে, কৃষ্টি অর্জ্জনও করতে সক্ষম, ধর্ম্ম তো সংস্কারের সঙ্গে মিলে থাকলেও পরিবর্ত্তন করা যায়—যায় না কেবল চেহারার পরিবর্ত্তন করা। রক্তের প্রবাহে কিংবা বীজাণু, জীন বা বর্ণের সঙ্গে যা আসে তার বদল হয় না। কোন অজ্ঞাত শক্তি রং মাটী দিয়ে গড়ে চলেছে তার পুতুল—এখন যে বাজারেই বিকোতে যাক, জাতের বিচার ধরা পড়বে তার গঠনে, রঙে, রূপে আর আকৃতিতে।

তারপর হয়েছে বাসভূমি নিয়ে একশ্রেণীর বিচার—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের লোক। আবার কাজের বিচার হয়েছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। ভাষার পার্থক্যও এসেছে শ্রেণী বিচারে। ভাষা গড়েছে দেশের সীমানা ধরে। আমরা সব তালগোল পাকিয়ে জাত ধরে বসে আছি। তা ভুল। হিন্দু মুসলমান জাত নয়—ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, শূদ্র জাত নয়—কর্ম্ম। বাঙালী, উড়িয়া, জাত নয়—দেশবাসী। আর হিন্দুস্থানী উর্দ্দু জাতি নয়—ভাষা। জাতের বিচার শুধু মানুষের আসে ভগবানের দেওয়া রূপ রং গঠনে—প্রকৃতির দান তা। মানুষের কোন হাত নেই তাতে। জাত হ'লো নেপালী আর নিগ্রো।

যাই হোক, এই জাতি বিচারেই আবার দেশের বুকে যুগে যুগে এক জাত আর এক জাতের সঙ্গে লড়েছে। আর নানা কাহিনী উঠেছে

কাব্যের বুকে। নাগ-বংশের উলুপী-বভ্রুবাহন কথা, অসুর-বংশের নানা কাহিনী—যবানাসুর আর লবণাসুরের কথা—এমন কি ক্ষত্রিয় রাজবংশের সঙ্গে জম্বুবানের গল্প-কথা ইতিহাসের রসভাণ্ডে ঠাঁই পেয়েছে। আজকের জাপান-জার্ম্মান যুদ্ধও তাই।

কিন্তু দেশের সিংহাসনে যখন যে জাতই থাক—বংশ তাদের যেখানেই ছড়িয়ে পড়ুক, তারা জাতে এই আর্য্যবংশই নিশ্চিত।

জাতি কথাটাকে বিস্তৃতভাবে বিচার না ক'রে অনেকে সেক্ষেত্রে 'গোত্র' শব্দকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, কিন্তু প্রাচীন যুগে 'গোত্র' কথাটি সাধারণ্যে প্রচার লাভ করলেও, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র প্রভৃতি সংজ্ঞাই জাতি হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন যে গোশালা বা গো-যূথ থেকে গোত্র কথাটির উৎপত্তি।

যাই হোক, একটা বিরাট সম্প্রদায়—যার মধ্যে আছে বন্ধুগোষ্ঠী বা গোত্র তাই জাতি—একথাই বা বলি কেমন করে?

আবার গুণকর্ম্ম বিভাগে যে শ্রেণীর উদ্ভব, তাও জাতি নয় বর্ণ।

"চাতুর্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগসঃ।"

গুণ এবং কর্ম্মের নানা ভেদে বর্ণ তৈরী হ'লো—তাই ব্রাহ্মণ শূদ্র জাতি নয়, বর্ণ। আবার শ্রেণীও নয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীকে শ্রেণী বলা হয়। যেমন রাঢ় দেশবাসীকে রাঢ়ী শ্রেণী, বরেন্দ্র দেশবাসীকে বারেন্দ্র বলে পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং গোত্র এবং বর্ণ এদের থেকে স্বতন্ত্র। শ্রৌত বা গৃহ্যসূত্রে যে কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তা ঐ বর্ণ নিয়ে। এখন জানা দরকার বর্ণ কি?

বর্ণ-বিচার

বর্ণ-বিচার নিছক হিন্দুর ব্যাপার। আর্য্যরা দেখলেন গুণ কর্ম্ম অনুসারে যদি এত বড় একটা বংশধারাকে ভাগ না করি তবে শাসন, শৃঙ্খলা কিছুই টিঁকবে না। তাই যাঁরা থাকবেন যাগ, যজ্ঞ, পূজা, উপাসনা বা সকল কুলের হিতের জন্য পৌরোহিত্য করতে তাঁরা

হবেন ব্রাহ্মণ। যাঁরা করবেন শাসন, যুদ্ধ, তাঁরা হবেন ক্ষত্রিয়। যাঁরা করবেন ব্যবসা শিল্প, কৃষি, তাঁরা হবেন বৈশ্য। এই তিন জাতিকে যাঁরা করবেন সেবা, যাঁরা দেবেন আরাম, আনন্দ—তাঁরা হবেন শূদ্র। শূদ্রের কোন প্রয়োজনই থাকবে না পূজা পাঠ বা যজ্ঞে। সেবাই হবে তাঁদের ধর্ম্ম।

সমাজের সব লোক সমান শক্তিধর হবেন না, সকলের মনের গতি হবে না সমান, সকলের রক্তে থাকবে না সমান প্রভাব—তাই হীন, দীন, রুগ্ন, শান্ত, শ্রমী ও ধর্মী, বিদ্বান ও কর্মী ভেদে বর্ণ বিভাগ করা হ'ল সামাজিক গণশক্তির।

আজও তা হয়—কারও অবসর নেই রাত্রে—তার রাত্রেরই চাকরী, কারও শক্তি নেই ক্ষেত-খামারের কাজে, আছে বুদ্ধি-বৃত্তি, কারও বিদ্যা নেই, অথচ শক্তিধর-যন্ত্র তৈরীতে সে ওস্তাদ। এমনই সব কার্য্য-বিভাগ নিয়েই হয়েছিল হয়তো এক একটী বর্ণ।

সোজা বলতে গেলে—আজ মন্ত্রী বা প্রধান মন্ত্রী এক জাত, আবার বৈজ্ঞানিক, ভাস্কর, চিত্রশিল্পী এক জাত, আবার বিড়লা, গোয়েঙ্কা এক জাত, আবার শস্য-ক্ষেত্রের কৃষি, তাঁতের ঘরের তাঁতি এক জাত। এই তো বর্ণ।

তবে বাটার কারখানায় কুলীন বামুনের ছেলে জুতো তৈরী করলেও সে থাকছে বামুন—আজও সে মুচি নয়।

নিজের হাতে বহুজন হল ধরেও হচ্ছেন হলধর, কিন্তু চাষী নয়—আবার অসিজীবী রাজপুতের দেশের লোক বৈশ্য-বৃত্তি নিয়ে হচ্ছে মাড়োয়ারী ধনী, আর জেলের ঘরের ছেলে সাগরপারে গিয়ে হচ্ছে বেদ-বেদান্তে পারদর্শী পণ্ডিত।

আজ যুগধর্মে হয়তো সবাই এ সবে বাধ্য হচ্ছে—কারণ মাটির শস্য, গোলার ধান, যজ্ঞাগারে যজ্ঞ আর গোধন নিয়ে মানুষ নিজের গ্রামে বসে নেই—তারা ছুটেছে সাগরপারে পাহাড়-কোলে—যন্ত্রের মন্ত্রে পাগল হয়ে। সেদিনও জামদগ্ন্য পরশু হাতে ক্ষত্রিয়

বৃত্তি নিয়েছেন, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হয়েছেন—কিন্তু তা ছিল বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ কারণে বিশেষ প্রভাবে। নইলে জাতি ও ধর্ম-বিচার আর্য্য ভারতের হিন্দুগোষ্ঠির সমাজ শৃঙ্খলার গোড়ার কথা।

সমাজের নিয়ম অটুট রাখতে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তারা ব্রাহ্মণের রক্তে গড়া ছেলেকে ব্রাহ্মণের সংস্কারে ব্রাহ্মণের বেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পালন করতেই বলেছেন, বৈশ্যকে করতে বলেছেন ব্যবসা—বাপ-ঠাকুর্দার পেশার নেশায় সে হবে মত্ত—ক্ষত্রিয় করবে শাসন ও যুদ্ধ, আর শূদ্র করবে সেবা। এদের সন্তানরাও সেইভাবে সেই পথে তৈরী হবে। সমাজে বিশৃঙ্খলা, স্বেচ্ছাচারিতা আর হিংসা দ্বেষ আসবে না কোনদিন।

এই হ'ল বর্ণ-বিচারের উদ্দেশ্য। বর্ণ-ভাগ না হলে সংস্কারের বিচার আসবে কি করে।

কিন্তু এই সংস্কার আবার আশ্রম-ভেদের কথা এনে ফেলে। প্রতি গৃহস্থ নিজ নিজ জীবনকে চারটি আশ্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাইলেন। শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্বে ও বার্দ্ধক্যের নানা পরিবেশে জীবনকে তারা সাজিয়ে নিতে বা মানিয়ে নিতে চাইলেন—চারটি আশ্রমে।

চতুরাশ্রম

সেই নির্দিষ্ট চারটি আশ্রম হচ্ছে প্রথম ব্রহ্মচর্য্য, দ্বিতীয় গার্হস্থ্য, তৃতীয় বানপ্রস্থ, চতুর্থ ভৈক্ষ্য। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পৈতে হবার পর ছেলে যাবে গুরুর কাছে থাকতে সেই বনে জঙ্গলে বাঁধা এক কুটীরে। সেখানে শিখবে বেদ, করবে যজ্ঞ, আনবে সমিধ্—মানে যজ্ঞের কাঠ, করবে ভিক্ষা গৃহস্থের ঘরে। ইন্দ্রিয় থাকবে সংযত, মন থাকবে উদার, কণ্ঠে সর্ব্বদা বেদ-পাঠ—সাম গান।

তারপর সেখান থেকে ফিরে আসাকে বলে সমাবর্ত্তন। তার পরই তার সুরু হবে গার্হস্থ্যাশ্রম। এ আশ্রমে এসেই হবে তার গৃহস্থের ধর্ম্ম সুরু—বিবাহ, বংশোৎপত্তি, সন্তান-পালন, শিক্ষা, দীক্ষা,

বেদ-সাধন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ সব। এ বড় আনন্দের আশ্রম—আবার বড় পেছল। পাপ যা মানুষ করে তা প্রায় এই আশ্রমেই করে। পঞ্চাশ বছর ধরে জীবনে এই আশ্রম-বাস করে—গৃহস্থ যাবে বনে—তার বানপ্রস্থে। "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"। সেখানে শুধু সাধনা, যোগ, তপ আর যজ্ঞ।

ইহলোকের সব ছেড়ে পরলোকের কাজের জন্য সে যখন হবে উন্মুখ, তন্ময়—যখন জীবনের সব কামনাই শুধু নয়, সাধনাও শেষ হবে, তখন সে হবে বনবাসী—বের হবে ভিক্ষু হ'য়ে তীর্থে তীর্থে ভিক্ষার ব্রত নিয়ে। আশ্রমে রাজার দান, ধনীর দান, শিষ্যের আহরণ কিছু থাকবে না—নিষ্কাম, পরম পুরুষ সে ভিখারীর বেশে সন্ন্যাসী হ'য়ে, বাউল হ'য়ে বের হবে পথে পথে। জীবন তাঁর এমন করেই কোন তীর্থে বা দেব-দেউলে শেষ হবে।

ব্রাহ্মণ যাঁরা তাঁরা চার আশ্রমের নিয়মই মেনে চলবেন। ক্ষত্রিয় শেষ বা ভৈক্ষ্য আশ্রম নেবেন না, বৈশ্যও বানপ্রস্থ বা ভৈক্ষ্য আশ্রম কোনটাই নেবেন না—শুধু ব্রহ্মচর্য্য ও গৃহস্থ-ধর্ম্মই তাদের বরণ করতে হবে। আর শূদ্র শুধু গার্হস্থ্য আশ্রমেই থাকবেন চিরদিন।

চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ
ব্রহ্মচর্য্যশ্চ গার্হস্থ্যবানপ্রস্থ্যশ্চ ভিক্ষুকঃ…।

গার্হস্থ্য আশ্রম পালনের মধ্যে আবার জীবনের কর্ত্তব্যকে নানা ভাগে ভাগ করতে, ঠিক করে নিলেন তারা দশবিধ সংস্কার। আগে নাম ক'টা বল্লেও এখানে তার একটু বিশদ আলোচনা করা যাক।

আর্য্যগণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত পুরো জীবনটাকে দশ রকম বিভাগে তৈরী ক'রে দশরকম ভাবে নিজের একটানা কর্ত্তব্যকে শেষ করবেন ঠিক করলেন। আর তাই নিয়ে যে সব অনুষ্ঠান—সত্যই তা একঘেয়ে কাজের চাকার চলার পথে বেশ বৈচিত্র্য আনে, উৎসব আনে, আনন্দ আনে। জন্মতিথির পূজা, পৈতে, বিয়ে,

অন্নপ্রাশন/ এসব যদি উঠে যেত, তবে শুধু খাও আর ঘুমোও, পড় আর শেখ এই নিয়েই লোক থাকত—মুখ হত মূক, আনন্দ যেত দূরে। এই দশবিধ সংস্কার ভারতে আমাদের রক্তের সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। আর্য্য-জীবনে উৎসবের কারণ হয়ে পড়েছে। এ আজকের ব্যবস্থা নয়—বেদের মন্ত্রে, অনুষ্ঠানের নিয়মে এ সব গাঁথা।

মানুষ জন্মাবার থেকেই সুরু হ'ল দশবিধ সংস্কারের পত্তন। জন্ম থেকে মৃত্যু—এই জীবনকালটি দশটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হ'ল।

● ● ●

সংস্কার

হয়তো অনেকে বলবেন কি প্রয়োজন এই সংস্কার-পদ্ধতিতে? কেনই বা ঠিক ঠিক দিনে, ঠিক ঠিক ভাবে নির্দিষ্ট জিনিসপত্রাদি দ্বারা একে সজ্জিত করা? প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। এই সংস্কার এবং সাধনার দ্বারা মানুষকে দ্বিজত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে—তাকে দিয়েছে নবজন্ম। মানুষ জন্মায় সংসারকে জানতে—কিন্তু তারও ঊর্দ্ধে যে সুখ তা জানতেই মানুষ নবজন্ম লাভ করে। অজানাকে জানাই মানুষের চরম লক্ষ্য ও পরম সাধনা। এখন কে সে অজ্ঞেয় আর কেমন করেই বা তাকে জানা যায়?

উপনিষদ বলেছেন—"গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্"— তিনি গুপ্ত, তিনি গভীর। তাঁকে বাইরে দেখা যায় না, তিনি প্রচ্ছন্ন।

সেই প্রচ্ছন্নকে জানতে পারি আমাদের গভীরতর অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা। বাহির থেকে জানা যায় না। "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"। বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে জানা যায় না বটে, কিন্তু তাঁকে পাবার ব্যাকুলতায় যখন সে বলবে—"ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্ত" তখন বাইরের ইন্দ্রিয়ই সজাগ হয়ে উঠবে—মন অন্তর্মুখী হবে। এই চেষ্টার নামই সাধনা।

সাধনা আমাদের প্রতি ক্ষেত্রে। চেষ্টা মাত্রই সাধনা। মানুষ নিয়ত চেষ্টা করছে। আহারের জন্য চাষ—তাও সাধনা, আবার গ্রহ-

নক্ষত্রকে জানতে আকাশ-পথে অন্বেষণ—এও সাধনা। মানুষ কত চেষ্টা করছে—মুক্তার খোঁজে সাগরে ডুব দিচ্ছে। অন্তর-লোকে যিনি আছেন তাঁকে জানতেও মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। ইন্দ্রিয়কে সংযত করার মধ্যেও এই চেষ্টা —এই সাধনা।

এই অভ্যাসকে আয়ত্ত করতে হলে, পরিবেশের সঙ্গে মানুষের বয়স, দৈহিক ও মানসিক পরিস্থিতিরও একটা সাম্যের প্রয়োজন আছে। প্রকৃতির নিয়মে শিশু যুবক হচ্ছে, যুবক হচ্ছে বৃদ্ধ। এদের প্রত্যেকের অভ্যাস স্বতন্ত্র। দেহের গতির সঙ্গে মনের গতির সংযম, সাধনা নিয়ত বদলাচ্ছে। শিশুর আচরণ থেকে যুবকের আচরণ, আবার যুবকের আচরণ থেকে বৃদ্ধের আচরণ সম্পূর্ণ পৃথক্।

প্রয়োজনে, পরিবেশে, সাধনার পথে এগুতে গিয়ে মানুষ নানা বয়সে নানাভাবে যেসব রীতি ও আচরণ গ্রহণ করে, তারই নাম সংস্কার।

অবশ্য এ কথাও সত্য, অতিরিন্দ্রিয় দ্বারা যে পরমাত্মাকে জানা—তাঁকে পাবার জন্যে এই যে খোঁজাখুঁজির পালা, বিধি-নিষেধ, যাগ-যজ্ঞ—এইগুলো অনেক সময় ঝোঁকে পরিণত হয়। তার ফলে এসে পড়ে আড়ম্বর। এই আড়ম্বরের মধ্য দিয়েই প্রতিমা-পূজা, ব্রত-পার্বণ ও উৎসবাদিতে গৃহাঙ্গন ও মন্দির ভরে ওঠে।

নইলে সংস্কার আমাদের বৈদিক প্রথারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। কিন্তু সে প্রথায় নেই নানা উপকরণ আড়ম্বরাদির আয়োজন। আছে অভ্যাস ও সংযমের কঠিন ব্যবস্থা।

ধরা যাক, শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ সংস্কার—উপনয়ন। এর মূল মন্ত্র হ'ল গায়ত্রী।

গায়নাৎ ত্রায়তি—অর্থাৎ যে গান বা মন্ত্র মানুষের মনে উদ্গীত হয় ত্রাণের জন্য তাই গায়ত্রী। আর মন্ত্র হ'ল, যা 'মননাৎ ত্রায়তি'। এই গায়ত্রীর গোড়ার কথা হচ্ছে—"ওঁ"। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বক্তব্যই এই ওঁকার ধ্বনি।

অসুর বিজয়ে দেবতারা যখন সাধনা সুরু করলেন—যখন

ইন্দ্রিয়ের দ্বারে আঘাত ক'রে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকার সাধন-বলে সেই বিজয় মন্ত্র পাবার চেষ্টা করলেন তখন অসুররা সে চেষ্টায় দিলেন বাধা। দেবতারা ভাবলেন ঘ্রাণশক্তির চরম উৎকর্ষতায় বুঝি পাবেন সেই সিদ্ধি—অসুররা সেখানেও দিলে বাধা। ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিকল হ'ল —ভাল-মন্দ দুই গন্ধই পেতে লাগলেন। দেবতারা চেষ্টা করলেন চক্ষুর সাধনা। এই চক্ষুর দ্বারা তাঁরা সৎ ও শুদ্ধকে জানবেন, দেখবেন—চরম ও পরম সুন্দরকে। বাধা এখানেও এলো—তাঁরা ঐ চোখে অ-সুন্দর এবং পাপকেও দেখতে লাগলেন। এমনিভাবে সর্ব-ইন্দ্রিয় যখন ব্যর্থ হ'লো তখন দেবতারা তাঁদের হৃদয়ের গোপন কন্দরে অধিষ্ঠিত প্রাণকে করলেন সাধনার আধার। ব্যর্থ হ'লো এবারে অসুরের চেষ্টা। এই প্রাণের সন্ধান তারা জানতো না। এই সাধনার ফলেই জন্মলাভ করলো উপনিষদ। এই হ'লো কাহিনী।

তবে এ কাহিনীর মধ্য থেকে একটা জিনিস আমরা উপলব্ধি করলাম—পাওয়ার চেষ্টা, যে চেষ্টা বা সাধনা, 'না'কে 'হাঁ' করায়—এই ব্যর্থতাকে করে সার্থক, তারই ধ্যান-বাণী এই "ওঁ"। আত্মা নিয়ত বলছে 'হাঁ'— এই ধ্বনিই হ'লো ওঁকার। এই ওঁকারের ব্যাখ্যায় উপনিষদের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে।

বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যে বা ভোগের মধ্যে সত্যিকার 'হাঁ' নেই—অন্তরেন্দ্রিয় যে প্রাণ, সেইখানে সব 'নেতি' লয় হয়ে, নিত্য ধ্বনি উঠছে 'হাঁ' বা ওঁকার।

ছান্দোগ্য বলেছেন—মিথুনের মাঝখানে অর্থাৎ দুই যেখানে মিলেছে সেইখানেই এই "ওঁ"। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—"যেখানে একদিকে ঋক্, একদিকে সাম—একদিকে বাক্য, এক দিকে সুর—একদিকে সত্য, একদিকে প্রাণ ঐক্যলাভ করেছে সেইখানে ঐ পরিপূর্ণ "ওঁ"।

যার মধ্যে কিছু বাদ পড়েনি—যার মধ্যে সমস্ত খণ্ডই অখণ্ড হয়েছে, সমস্ত বিরোধ মিলিত হয়েছে, আমাদের আত্মা তাঁকেই অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে 'হাঁ' বলে স্বীকার করেছে।

উপনিষদ এই "ওঁকারের" ব্যাখ্যা করেছেন— এই চরাচর বিশ্বের আধারস্বরূপ প্রধান রস পৃথ্বী, পৃথ্বীর আধারস্বরূপ প্রধান রস জল, আর জলের আধারস্বরূপ প্রধান রস ওষধি, ওষধির আধারস্বরূপ প্রধান রস মনুষ্যশরীর, আবার মানুষের শরীরের আধারস্বরূপ প্রধান রস বাণী, বাণীর আধারস্বরূপ প্রধান রস ঋক্, ঋকের আধারস্বরূপ প্রধান রস এই উদ্‌গীত ধ্বনি 'ওঁকার।'

এই ওঁকার রূপ যে উদ্গীত ধ্বনি তাই হ'লো শ্রেষ্ঠ ধ্বনি।

এই ধ্বনিই হ'লো ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয়। স্ত্রী-পুরুষের মিলনে যেমন পরস্পরের সঙ্গম উভয়েরই কামনা পূর্ণ করে, তেমনি প্রাণ ও বাণীর মিলনে এই ওঁকার সিদ্ধ হলেই প্রাণ ও বাণীর সাধনা পূর্ণকাম হয়।

অবশ্য উপনিষদের এই ব্যাখ্যার পরেও ওঁকারের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হয়েছে। তবে মোট কথা পরমকে পাবার যে চরম সাধনা তারই কামনা যখন পূর্ণ হয় তখন মানুষ বলতে চায় 'ওঁ'। এ ধ্বনি নিয়ত উঠছে—এই হ'লো আমাদের একমাত্র ধ্বনি, এই হ'লো দীক্ষামন্ত্র—দলের চরম বাক্য। দলের বা সঙ্ঘের slogan—বাক্-মন্ত্র বা ধ্বনি-মন্ত্র স্থির হ'ল—কিন্তু এখন প্রয়োজন দলের নির্দ্দিষ্ট বেশ ও আঙ্গিক চিহ্ন। যা হবে তাদের পরিচিতি। তাই তাঁরা গ্রহণ করলেন শিখা ও সূত্র—প্রতীক হিসেবে।

ধীরে ধীরে সংস্কারের মধ্য দিয়ে এমনি করেই এসে পড়লো একদিন—জাতি বা বর্ণের, আশ্রম বা গোষ্ঠীর পরিচিতির মধ্যে নানাবিধ বেশ-বাস, আঙ্গিক প্রতীক, বাণী বা আচার। এক কথায় সংস্কৃত রূপ ও নিয়ম অনুষ্ঠানে তৈরী হ'লো জীবনকে সুষ্ঠুভাবে চালনা করবার বিবিধ প্রক্রিয়া, যার ফলে গড়ে উঠলো নানাবিধ বিধি-নিষেধ, খাদ্যাখাদ্যের বিচার, পাপ ও পুণ্যের ইঙ্গিত। ধর্মের মাধ্যমেই তাঁরা সমাজকে সুদৃঢ় করলেন।

উদাহরণরূপে ধরা যায় উপনয়নের কথা। এমনি করেই

এলো সে উপনয়নের ব্যবস্থা, এলো নিত্য করণীয় কর্তব্য—যা *মানুষের জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজন।*

দ্বিজ হয়ে যা যা করতে হয় তার আলোচনা হবে উপনয়ন সংস্কারের প্রসঙ্গে, এখানে শুধু বলতে চাই উপনয়নের সে সব দৈনন্দিন মন্ত্র, বা সাধন, তা বিশেষ কিছুই নয়—নিছক আমাদের রোজ যা করা দরকার, তেমনই কয়েকটি কাজ—স্মরণ বা মনন। রোজ সৃষ্টিকর্তাকে—আমার যে স্রষ্টা, বিশ্বের যে স্রষ্টা—তাকে স্মরণ করতে হবে—আর সংসারে পুণ্য কাজ করি আর না করি, পাপ যা করি তার জন্য অনুতাপ করতে হবে। আর করতে হবে রোজকার কতকগুলি নিয়ম পালন। এই সব মিলিয়েই মোটমাট ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা, আহ্নিক বা সংস্কারের পালন।

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ, স্নান প্রভৃতি শেষ ক'রে নিয়মিত ব্যায়ামের ব্যবস্থা প্রত্যেকেই করে। তারই এক ব্যায়াম হ'লো শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম—যার অপর নাম প্রাণায়াম। প্রাণ যাতে সংযত হয় তাই প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামের ফলে ধ্যেয় বস্তু আকৃষ্ট হয়। ধ্যেয় বা ধ্যানের প্রধান সম্পদ 'ব্যান'—অর্থাৎ প্রাণ ও অপান—শ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণই হল প্রাণায়াম।

তারপর চিন্তা করতে হবে গত দিনে বা রাত্রে কি অন্যায় বা কি পাপ করেছি—যদি করে থাকি, আর যেন তা না করি। এই চিন্তা করতে করতে মানুষ শুচি হয়—এর নাম আচমন। "যদ্রাত্রা পাপমকারষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিৎ দুরিতং ময়ি"। প্রতিদিনের এই আত্মপাপ ক্ষালনার্থে যে আচমন—এ কি কম প্রায়শ্চিত্ত! অন্তরের পাপকে শ্বাস দ্বারা টেনে এনে বাইরে নিক্ষেপ করবে। অন্তরকেও ধুয়ে দেবে—বিশ্বের পবিত্র জলে স্নান, পবিত্র মূর্ত্তির স্মরণ, পাপ-ক্ষালন ও পরমশক্তির জ্ঞান বা ধারণায়। এই হচ্ছে সন্ধ্যা বা আহ্নিক। যা রোজ বা অহ্নে করবার প্রয়োজন তাই আমাদের আহ্নিক। তার পরেই কর্ত্তব্য হচ্ছে দেবতা

আদি পুরুষদের স্মরণ। প্রথমেই সূর্য্যকে করবে প্রণাম—তাঁকে তোমার কর্ম-পথের সম্মুখে বসাবে। তারপর বিভিন্ন দেবতা—তোমার গুরু ও প্রাচীন আর্য্যকুলকে করবে স্মরণ—তারপর পিতৃকুলের তর্পণ, গায়ত্রীর আবাহন, ধ্যান এবং জপ। ধ্যানের পর সেই পরমা শক্তিকে করবে চিন্তা—তাঁর নাম, তাঁর অতুলনীয় কার্য্য, তাঁর অপরিমিত শক্তির কথা স্মরণ করবে। অনুভব করবে তুমি তাঁর কৃপা পেয়েছো—তোমার তাই রক্ষাকবচ। সেই হ'লো তোমার "আত্মরক্ষা"। এই তো হ'ল সন্ধ্যা বা আহ্নিক। তারপর বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে দিনের কাজ সুরু করবে। কিন্তু এই কাজের মধ্যেও তোমার সেই চিন্তা যেন থাকে—"যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" অর্থাৎ তুমি করাও—আমি করি।

এমনি করে আত্ম-পাপের স্বীকৃতিতে অন্তরেন্দ্রিয় সজাগ হবে—লজ্জিত হবে বহিরেন্দ্রিয়। এমনি করেই মন সংযত হবে। এই নিয়ত স্বীকৃতির ফলেই তুমি নবজীবন লাভ করবে। এই নবজীবনই তো দ্বিজত্ব। এর ফলে তোমার অহমিকা যাবে দূর হয়ে, পাপ যাবে সরে। এই স্মরণ, মনন বা সাধন—আমাদের প্রতি কার্য্যে—কি বিবাহে, কি রতি-রঙ্গে, কি সন্তান-সৃজনে বা তার পালনে। সকল কাজের মধ্যেই নিয়ম ও সংযম, সাধনা ও আরাধনাকে মেনেছেন তাঁরা। একে সংস্কার বলো ক্ষতি নেই। কারণ এই সংস্কারকেই আর্য্যসন্তানগণ জাতির গৌরব ব'লে স্বীকার করে নিয়েছেন।

দশবিধ সংস্কার

গর্ভাধান—অপূর্ব্ব এই দশবিধ সংস্কারের প্রারম্ভটি। আর্য্য জাতির দশবিধ সংস্কারের প্রথমটি তার জন্ম নিয়ে নয়—আরম্ভ তার বীজাণু সৃষ্টি নিয়ে। পরমাণুর যে শক্তি অনুরূপ বীজকোষে তাকে নিয়ে এল—প্রথম সংস্কাররূপে আর্য্যসন্তান তাকেই মেনে নিলেন—পুরুষ ও শক্তির মিলিত সম্পদ বলে। এ মিলনকে বেদোক্ত বিধি দিয়ে শুচি না করলে কি হয়?

তাই স্বামী-স্ত্রীর সহবাসকালেও আমরা দেখতে পাই সংস্কারের ধারা। বেদ-মন্ত্রকে স্মরণ করার বিধি, সংযত নিয়মের পালন। কারণ তাঁরা জানতেন সৃষ্টি হ'লো পবিত্র ধর্ম্মেরই অঙ্গ।

আজ পাশ্চাত্ত্য যৌনবিজ্ঞান কত না গবেষণা করে যা বলেছেন, অতি প্রাচীনকালে আর্য্য-ধর্ম্ম-শাস্ত্রও সে কথা বিস্তৃতভাবে বলে গেছে—রজোদর্শনের দিন থেকে ১৬ দিনের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিন ত্যাগ করে, কোন প্রশস্ত দিনে—শুভলগ্নে অথচ তা রজোদর্শনের পর যুগ্ম দিন হওয়া চাই—এমনই পবিত্র ক্ষণে সুসজ্জিতা বধূকে মঙ্গল-ঘটের কাছে বসিয়ে—স্বামী দেবসমীপে পুত্রোৎপত্তি কামনায় সঙ্কল্প করবে।

এ শুধু প্রথম বারেরই কর্তব্য কাজ নয়, পুত্র কামনায় স্ত্রী-সহবাস প্রতিবারই হবে শুভদিনে, শুভ আচারে ও পবিত্র চিত্তে—দেব-স্মরণে। শুভদিন নির্ব্বাচনের বাধায় আসবে অসংযত কামনাকে আত্মবশে আনার শক্তি! গর্ভধারণের এই বিধি।

কি সুন্দর ব্যবস্থা! অনাগত মানুষ আসবে দম্পতির মিলনে—স্বামী-স্ত্রী সহবাসে আসবে সেই সন্তান—যে বংশবৃদ্ধি করবে। সৃষ্টির সেই অপূর্ব কার্য্যটিকে পবিত্র ক'রে তুলবে দম্পতি নির্দিষ্ট বেদ-মন্ত্রে

"প্রজাপতি-ঋষিরনুষ্টুপছন্দঃ সিনীবালি সরস্বত্যশ্বিনো দেবতা গর্ভাধানে বিনিয়োগঃ—ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালী গর্ভং ধেহি সরস্বতি
গর্ভান্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ।"

এই মন্ত্রে স্বামী করবে স্ত্রীর গর্ভাধান। তারপর স্ত্রীকে বলবেন—

"জীববৎসা ভব ত্বং হি সুপুত্রোৎপত্তিহেতবে
তস্মাত্ত্বং সর্ব্বকল্যাণি অবিঘ্নগর্ভধারিণী।
ওঁ দীর্ঘায়ুষং বংশধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে ..."
"সুব্রতে তুমি দাও-গো জন্ম দীর্ঘায়ু সেই বংশধরে।"

এইভাবে হবে সৃষ্টিলীলার অপরূপ সূত্রপাত। সন্তানের জন্মই

যখন হলো না, তখন থেকেই মাকে হ'লো ভগবানের আশীর্বাদ জানান—ধর্মজ্ঞান ছাড়া হিন্দুর যেন কিছুই করতে নেই।

পুংসবন—তারপর হয় পুংসবন অর্থাৎ—গর্ভস্থ সন্তান যাতে পুরুষ হয় তারই কামনা। পৃথিবীর আদি থেকেই নারী অপেক্ষা পুরুষের এ আদর কেন? অথচ নারী না হ'লে মা হয় না, বোন হয় না—হয় না সৃষ্টির জন্য স্ত্রী। তবু এ ভেদ হয়ে আসছে কেন? তবে শাস্ত্রে বলে নারীর মাধ্যমেই মায়া বা কামনার সঞ্চার হয়—মানুষ হয় ধর্মচ্যুত, হয়ত এই আশঙ্কায় এ নীতি। তাই মন্ত্রোচ্চারণ করে বলা হয় —গর্ভের শিশু যেন পুরুষ হয়।

হয়তো অনেকে হাসবে—ইচ্ছানুসারে স্ত্রী বা পুরুষ-সন্তান সৃজনের কথায়। কিন্তু আজ পাশ্চাত্ত্য যৌন-বিজ্ঞান সেই কথাই ব'লেছে,—সেই কথাই মেনে নিয়েছে—যে কথা বা বিধি ২৫০০ বছর আগে মহর্ষি যাস্ক তার নিরুক্তে বলে গেছেন—

"শ্লেষ্মা রেতসঃ সম্ভবতি, শ্লেষ্মণো রসো রসাচ্ছোণিতং শোণিতান্মাসং মাংসান্মেদো, মেদসঃ স্নাবা, স্নাব্নোঽস্থীন্যস্থিভ্যো মজ্জা, মজ্জাতো রেতস্তদিদং যোনৌ রতঃ সিক্তিং পুরুষঃ সম্ভবতি, শুক্রাতিরেকে পুমান্ ভবতঃ, শোণিতাতিরেকে স্ত্রী ভবতি, দ্বাভ্যাং সমাভ্যাং নপুংসকো ভবতি, শুক্রেণ ভিন্নেন যমো ভবতি।" ভ্রূণ-উৎপত্তির এই নিয়ম।

কি করে যে ধীরে ধীরে এক এক মাসে এক এক অঙ্গ হয়, তাও যাস্ক বলে গেলেন—

"এক রাত্রোষিতং কললং ভবতিঃ, পঞ্চরাত্রাৎ বুদ্বুদাঃ, সপ্তরাত্রাৎ পেশী, দ্বিসপ্তরাত্রাদর্বুদঃ, পঞ্চবিংশতি রাত্রঃ ঘনো ভবতি, মাসমাত্রাৎ কঠিনো ভবতি, দ্বিমাসাভ্যন্তরে শিরঃ সম্পদ্যতে, মাসত্রয়েণ গ্রীবাব্যা-দেশো, মাসচতুষ্কেণ ত্বগ্ব্যাদেশঃ, পঞ্চমে মাসি নখরোমব্যাদেশঃ ষষ্ঠে মুখনাসিকাক্ষিশ্রোত্রং চ সম্ভবতি সপ্তমে চলনসমর্থো ভবত্যষ্টমে বুদ্ধ্যাধ্যবস্যতি, নবমে সর্বাঙ্গ সম্পুর্ণো ভবতি দশমে প্রজায়তে জাতশ্চ বায়ুনা স্পৃষ্টো ন স্মরতি জন্মমরণে।

অতএব গর্ভের তিন মাসে যখন জীব সঞ্চার হয়, তখন ঋষিরা পবিত্র বৈদিক মন্ত্রে সন্তান হবার আনন্দে প্রসূতিকে উৎফুল্লা করতেই মাঙ্গল্যের অনুষ্ঠান—এই পুংসবন করতে বলে গেছেন। আর তখন সকলে পুত্রের কামনা করেই বলবেন—

ওঁ পুমান্ অগ্নিঃ পুমান্ ইন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ।
পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব তৎ পুমাননুজায়তাম্।

পুত্র কামনায় বলেছেন—ওঁ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপছন্দো মিত্র বরুণাশ্ব্যগ্নিবায়বো দেবতাঃ পুংসবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুমাংসৌ মিত্রা-বরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনাবুভৌ। পুমানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে।

সীমন্তোন্নয়ন—তার পরেই হয় সীমন্তোন্নয়ন। নানাভাবে প্রসূতিকে নিরাপদ করতে খুসী করতে এইসব ব্যবস্থা। যেমন দেশে আজও সাধ দেয়। পায়স বা চরু রেঁধে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে এই সীমান্তোন্নয়ন শেষ করা হয়।

"ওঁ প্রজাপতি ঋষি স্ত্রী দেবতা স্থালীপাকাবেক্ষণে বিনিয়োগঃ।
ওঁ প্রজাং পশূন্ সৌভাগ্যং মহ্যং দীর্ঘায়ুষ্টং পত্যুঃ"—প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্র পড়ে ব্রাহ্মণীরা সেদিন—নতুন হবে যে মা—তাকে চরু খাইয়ে বলবে—"বীরসূস্ত্বং ভব জীবসূস্ত্বং ভব জীবপত্নী ত্বং ভব।"

এই বলে চরু বা সাধ খাওয়ান হয় বটে, কিন্তু আসলে সীমন্তো-ন্নয়ন মানে প্রসূতির কেশপাশে সজারুর কাঁটা আর কুশের চিরুণী দিয়ে সীমন্ত রচনা করতে হবে, এক বৃন্তের দুটি যজ্ঞ ডুমুর-মালায় গেঁথে দিতে হবে ভাবী মায়ের গলায়—অবশ্য সবই বেদোক্ত মন্ত্রে।

তবে এই তিনটি সংস্কার আজকাল আর বড় বেশী হয় না। আজকাল সুরু হয় ছেলে জন্মাবার পর থেকেই উৎসবের পালা।

জাতকর্ম—এত সাধনায় কশ্যপের বংশের ধারা ধরে যারা এল মাটিতে, তারা গৃহস্থরূপে নূতন বংশ সৃষ্টি করলো। নতুন ছেলে হ'ল মার। আঁতুড় ঘরে মার গর্ভ থেকে মাটির উপর যেমনই নেমে এল শিশু, অমনি সুরু হ'ল তার জাতকর্ম।

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরেই ধাত্রী বলবে—জাতক হয়েছে। পিতা বলবেন—"নাভি কৃন্তনেন স্তন প্রতিধানেন চ"—নাড়ি কেটে স্তন দান কর। সে কাজ শেষ হলে হর্ষচিত্তে ছেলের মুখ দেখে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করবেন—"প্রজাপতি ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা কুমারস্য সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সদসম্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্। সনিং মেধামযাসিষং স্বাহা।"

মন্ত্র পড়ে তার মুখে দেবে সোনার কাঠি করে ঘৃত আর মধু।

নিষ্ক্রমণ—এর পরের উৎসব নিষ্ক্রমণ। ছেলে বের হবে আঁতুড় ঘর থেকে। মা কোলে করে নতুন অতিথিকে নিয়ে ঘরে আসবে—সে যে কি আনন্দ, তা সে প্রাচীন যুগের ঋষিরাও বুঝতেন। তাই বিধি করে তাকে পবিত্র ও সুন্দর করেছেন।

মা এসে বাপের কোলে তুলে দেবে তার সন্তান, পিতা বৈদিক মন্ত্রে সন্তানের করবেন আবাহন, করবেন—তার জন্য দেবতাদের কাছে বৈদিক মন্ত্রে নানা প্রার্থনা। বলবেন "...স্বস্তি সম্বাধেষ্বভয়ং নো অস্তু।" "মঙ্গল হোক তোমার—ভয় নেই"। পিতার অভয়-বাক্য ও মঙ্গল-কামনা হ'লো সন্তানের নিষ্ক্রমণে প্রথম সহায়।

চন্দ্র নিয়েই আমাদের জন্মপত্রিকা, রাশি, লগ্ন—তাই জাতকের শ্রেষ্ঠ আরাধ্য চন্দ্র। পিতা পুত্রকে সেই চন্দ্র দেখিয়ে তার জন্মতিথি ও রাশিকে প্রণাম করাবেন। বলবেন পিতা বৈদিক মন্ত্র—প্রজাপতি ঋষিরনুষ্টুপছন্দশ্চন্দ্রোদেবতা কুমারস্য চন্দ্র-দর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদদশ্চন্দ্রমসি কৃষ্ণং পৃথিব্যা হৃদয়ং শ্রিতম্। তদহং বিদ্বাংস্তৎ পশ্যন্মাহং পৌত্রমঘং রুদম্।—দেখাবেন তাকে চন্দ্র। ছেলে এসে উঠবে ঘরে।

নামকরণ—দশ দিনের হয়ে উঠলো ছেলে, এবার শুধু খোকা বললে হবে না, বাপ তার নাম রাখবে। এই নাম রাখাই হ'ল "নামকরণ"। সেদিন বাপ হোম প্রভৃতি করে, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে ছেলের নাম রাখবেন। ছেলে সেই নামটি চিরকাল জীবনে বইবে, সেই নামে পরিচিত হবে—যেমন হয়ে গেছেন—ইন্দ্র, চন্দ্র,

বরুণ। যে কোন নাম রাখলেই হবে না। যে রাশি নিয়ে ছেলে জন্মাল তারই অনুসারে নির্দ্দিষ্ট অক্ষর আদিতে রেখে হবে নাম।

মন্ত্র বলবেন—প্রজাপতি ঋষিরনুষ্টপচ্ছন্দো বৃহস্পতির্দ্দেবতা কুমারস্য নামকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স ত্বাহ্নে পরিদদাত্বহস্ত্বা রাত্র্যৈ পরিদদাতু রাত্রিস্ত্বাহোরাত্রাভ্যাং পরিদদাত্বহোরাত্রৌত্বার্দ্ধমাসেভ্যঃ পরিদত্তামাসাস্ত্বা মাসেভ্যঃ পরিদদতু। মাসাস্ত্বা ঋতুভ্যঃ পরিদদতু, ঋতবস্ত্বা সংবৎসরায় পরিদদতু। সংবৎসরস্ত্বায়ুষে জরায়ৈ পরিদদাতু শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মন্। এ তার মাস-বৎসর-ঋতুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন।

তারপর ছেলের কানে, তার মার কাছে বলবেন ছেলের আজন্মের পরিচিতির সেই নামটি। আজকাল এ সব অন্নপ্রাশনের সঙ্গে হয়।

অন্নপ্রাশন—হবে এবার ছেলের অন্নপ্রাশন—নইলে বিনা মন্ত্রেই যে সে ভাত খাবে। বয়স ঠিক হল ৬ কি ৮ মাস। চাঁদ দেখে মাসের হবে হিসেব। সে এক আনন্দ উৎসব! নতুন পোষাক পড়িয়ে মা নেবে ছেলেকে কোলে—নান্দীমুখ হবে পিতৃপুরুষকে স্মরণ করে। পূজা, হোম শেষ করবেন পিতা। বৈদিক মন্ত্রই হবে পাঠ—প্রজাপতি ঋষির্বৃহতিছন্দোঽন্নপতির্দ্দেবতা অন্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ ওঁ অন্নপতেঽন্নস্য নো ধেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ। প্র প্রদাতারং তারিষ ঊর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপদে। চতুষ্পদে স্বাহা। তারপর সবাই মিলে আনন্দ করে ছেলের মুখে তুলে দেবে 'ভাত'—দেবে চরু আর মিষ্টান্ন। কি চমৎকার! আহুতি হবে "ক্ষুৎপিপাসা" দেবতার উদ্দেশ্যে।

চূড়াকরণ—এই যে বার বার সংস্কার করে বালককে আর্য্য বলে মেনে নেওয়া হচ্ছে—এ সবই কিন্তু ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে। কিন্তু এখনও অঙ্গে তার কোন চিহ্ন ওঠেনি। প্রথম তা উঠবে ছেলের এক বৎসর বয়সে, অথবা তৃতীয় বা বেজোড় বয়সে। একটি অঙ্গে একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক দেওয়া হবে গেঁথে। দেহ ভেদ করে চিহ্ন দিয়ে বোঝান হবে—এ "সংস্কৃত",—এ অঙ্গুরীয়ক বা মাকড়ী তার প্রতীক। মন্ত্র তার হচ্ছে "প্রজাপতিঋষি রুষ্ণিক্ ছন্দো জমদগ্নিকশ্যপাগস্ত্যাদয়ো দেবতা-

শ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষম্। কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্, অগস্তস্য ত্র্যায়ুষম্, যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষম্, তত্তে অস্তু ত্র্যায়ুষম্।" মাথার চুল পরিষ্কার করিয়ে তবে হবে পুত্রের কর্ণভেদ। এ কর্ণাঙ্গুরী মঙ্গলের সূচনা করবে। আর প্রতীক হবে আর্য্য-বংশের। এতদূর পর্য্যন্ত গেল শিশু-জীবনের সংস্কার—অতিপ্রধান না হলেও উৎসবময়। কিন্তু এর পর যে সংস্কার—তাই সত্যকার ব্রাহ্মণ বা দ্বিজের প্রধানতম সংস্কার।

উপনয়ন—বৈদিক অনুষ্ঠানের পূর্ণ-স্মারক-উৎসব। এই উপনয়নে হিন্দু ভারতে অগ্নিসাক্ষ্যে শিশু সেদিন ব্রাহ্মণ হবে। স্বীকার করে নেবে—তার প্রতীক ঐ উপবীত, ঐ ব্রহ্মচর্য্য, ঐ সাধনা, ঐ কর্ত্তব্য। বৈদিক মন্ত্রেই তাকে তার গুরু বা আচার্য্য দীক্ষিত করবেন—

"প্রজাপতি ঋষির্গায়ত্রিচ্ছন্দো বিশ্বেদেব-দেবতা উপনয়নে যজ্ঞো-পবীতপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতে-নোপনেহ্যামি। ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্রং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।"

এইসঙ্গে কি অন্নপ্রাশনে, কি চূড়াকরণে, কি উপনয়নে পিতা বা আচার্য্য আর্য্য-বংশের প্রধান কাজ যজ্ঞের আয়োজন করবেন। যজ্ঞের সে অগ্নির নাম হবে শুচি, সত্য, বা সমুদ্ভব। কি চমৎকার! শুচি ও সত্য হয়ে যজ্ঞের অগ্নি তবে হলেন সমুদ্ভব। তারপর চলবে নানা অনুষ্ঠান নানা উপদেশ। তখন আচার্য্য তাকে ত্রি-দণ্ডী উপবীত ধারণ করিয়ে ব্রহ্মচর্য্য-সাধনে গুরুগৃহে পাঠিয়ে দেবেন।

এ ত্রি-দণ্ডী উপবীতকে স্মারক, প্রতীক বা পরিচিতি-জ্ঞাপক একটি বিশেষ দ্রব্য মনে করাই তর্কেচ্ছু লোকের পক্ষে সহজ। আমাদের প্রতিটি জনের উৎপত্তি বিশেষ একটি সম্প্রদায় বা গোত্রে। সেই অতি প্রাচীন কালে সেই গোত্রের সংগঠনকারী যিনি, সেই কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য বা ভরদ্বাজের প্রদর্শিত মতের প্রচারক ঋষিত্রয় বা প্রবর অর্থাৎ বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্রয়ের স্মরণে এ ত্রিদণ্ডী। বাৎস্য গোত্রে

আবার প্রবর পাঁচটী। কার্পাসের তুলার তিনটি করে স্থতো নিয়ে পাকিয়ে একটি স্থতো হবে, তারই হবে আবার ত্রিদণ্ডী বা গ্রন্থী। তার নাম হয়েছে তাই দেশ-বিশেষে—ন-গুণ। "ত্রি" আমাদের প্রতি কাজে, অ, উ, ম,—সত্ত্ব, রজ, তম,—সবই তিন। আবার দেহে আছে নবরস, নবগুণ। নবগ্রহেরও প্রকোপ সেই দেহে।

আচার ভেদে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদাধ্যয়ন-কালাবধি, মৃগচর্ম্ম, মুঞ্জ-মেখলা ও এই ত্রিদণ্ডী—বা নগুণের উপবীত ধারণ করার বিধি। গুরুগৃহে থেকে সংসারাশ্রমে ফিরে এলে পরিধেয় গৈরিক বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম চর্ম ও মুঞ্জ-মেখলা হবে পরিত্যক্ত— থাকবে চিরদিন 'দ্বিজ'-অঙ্গে ঐ কার্পাস-উপবীত। তিনি হলেন উপবীতি।

এই হ'ল সাধারণ বর্ত্তমান আচার—কিন্তু মুঞ্জ বা শণ, মৃগচর্ম্ম বা মেষলোম আর কার্পাস এ তিনটি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ ভেদে ব্যবহার্য্য ; তবে সাধারণতঃ উপনয়নে তিনটিই দেওয়া হয়—এবং দুটি পরে ত্যক্ত হয়।

কার্পাসমুপবীতং স্যাৎ বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ
শণ সূত্রময়ং রাজ্ঞ বৈশ্যস্যাবিক সৌত্রিকম্।

বেদ ভেদে উপবীতের মাপ পৃথক—হয়তো তাও এক বিশিষ্ট চিহ্ন।

শিখা দেখলে বুঝবে হিন্দু, কার্পাস-সূত্র বা উপবীত দেখলে বুঝবে ব্রাহ্মণ, মুঞ্জ-উপবীতে ক্ষত্রিয়, পশু-লোম উপবীতে বৈশ্য—উপবীত-হীন হলেই বুঝবে সে শূদ্র। শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনতার পরিচয় নয়, জাতি ও বর্ণের প্রতীক মাত্র। তার উপর তার দৈর্ঘ্যের পরিমাপ দেখলেই বুঝতে পারবে সে কোন্ বেদের মতবাদী। উপবীত হবে ত্রিদণ্ডী— তবে অনেকে চার দণ্ডীও ধারণ করেন। প্রকৃত পক্ষে প্রয়োজন পিতৃ-কার্য্যে একদণ্ডী, দৈবকার্যে একদণ্ডী অন্য দুইটি বস্ত্র ও উত্তরীয় অভাবে। সভ্যজগতে নগ্নতার প্রশ্ন নেই, তাই বস্ত্রের অভাবে ব্যবহৃত দণ্ডী বৃথা। উত্তরীয় অভাবে তাই ত্রিদণ্ডী প্রশস্ত।

এই উপবীত ধারণ ক'রে, দ্বিজ রূপে চিহ্নিত হলে— সে গুরু-গৃহে গিয়ে হবে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম গ্রহণের অধিকারী।

অনেকে বলবেন কি হবে ঐ আশ্রমে ঢুকে—কেউ বলবেন যদি তাতে হয়ও কোন লাভ—তবে তা শুধু ব্রাহ্মণের ছেলেরাই বা পাবে কেন? এই কি হবের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন উপনিষদ—অসার বন্ধন থেকে মুক্তির আস্বাদ পেয়ে যাঁরা হলেন স্থির, ধীর, শান্ত তাঁরাই পেলেন সর্ব্বব্যাপী ক্ষমতার অধিকার।

তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধারা যুক্তাত্মানং সর্ব্বমেবাবিশন্তি"

"ধীর ব্যক্তিরা সর্ব্ব ব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্ব্বত্রই প্রবেশ করেন"

এই—সর্ব্বত্র প্রবেশ করার ক্ষমতাই শেষ ক্ষমতা।

এ সংসারে যত ধন, যত ঐশ্বর্য্য, যত সুখ, যত আত্মীয় স্বজনই থাক কিন্তু শেষ কি? মৃত্যুর অতীত পরমপদার্থকে পাবার জন্য, সব-কিছু ছেড়ে মৈত্রেয়ী তো সেই অমৃত পাবার লোভেই স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেছিলেন—যেনহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম—যা নিয়ে আমি অ-মৃত না হব তা নিয়ে আমি কি করবো? পরিণাম কি? মৃত্যুতেই তো সব ছাই। অ-মৃত্যুর যে অমৃত তা কোথায়? যাজ্ঞবল্ক্য তখন তাকে যে পথে প্রবেশ করতে বল্লেন—সেই পথে প্রবেশ করাই ক্ষমতার চরম আর পরম ক্ষমতা। এই চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে ইহসংসারের ভোগ বিলাসের মধ্যে, সাধারণ মনুষ্য জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায় না তাঁকে যেতে হবে দূরে, একান্তে—ভোগ লালসার সীমা ছাড়িয়ে সত্যকার শক্তির পথে। তাকে হতে হবে ঋষি—তপস্বী—সাধক—আর তার আগে তাকে হতে হবে পরম 'ব্রহ্ম'কে জানবার অধিকারী—'ব্রাহ্মণ'। যেদিন ব্রাহ্মণ হবার মন্ত্র সে পাবে—সে দিন হবে তার নূতন জন্ম—দ্বিতীয় জন্ম। সে হবে 'দ্বিজ'। ব্রহ্মকে জানবার পথে যে সব বিধি নিয়ম সংযম অভ্যাস করে সাধনার পথকে সুগম করা

হয়—তাই সংস্কার মন্ত্রে, তন্ত্রে কর্ম্মে অনুষ্ঠানে তাকে সেই পরম-ধন-প্রাপ্তির পথে তৈরী করে নেওয়া হয়। সে তখন হয় ব্রাহ্মণ। নইলে পেট থেকেই ব্রাহ্মণ জন্মায় না—ব্রাহ্মণ হতে হয়। তবে "বর্ণ" ধরে বিভাগ মেনে ব্রাহ্মণ-সন্তান নিয়মের চাকায় সাধন-পথের তথ্য-গুলো জেনে নিতে পারে সহজে, বংশ পরম্পরার শিক্ষা-কৌশলে তাই তারা বিনা বাধায় সংস্কৃত হয়—দ্বিজ হয়—ব্রাহ্মণ হয়। নইলে ক্ষমতা থাকলে ব্রাহ্মণ হতে পারে সবাই। হতে পারেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ-কর্ত্তা—হতে পারেন জবালীপুত্র সত্যকাম মহাযোগী, হতে পারেন বিশ্বামিত্র—ব্রহ্মর্ষি

তবু সংস্কার প্রয়োজন—পথ সুগম করার অভ্যাস দরকার—তাই বর্ণ-বিভাগে শক্তি ভেদে অধিকার নির্ব্বাচনের সাধারণ নিয়ম হবেই। অসাধারণ যাঁরা তাঁরা সে বেড়া ডিঙিয়ে কাম্য যে পরম-লক্ষ্য তাতে পৌঁছবেনই। সাধারণের জন্য নিয়ম সংস্কারের-বিধি নিষেধ।

গুরুগৃহে সুরু হলো তার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। সেইদিন থেকে সে গায়ত্রীর আরাধনা করবে, সুরু করবে সাবিত্রী হোম, গায়ত্রী জপ, ধ্যান ও ধারণা। সেদিন যে তার নূতন জন্ম—দ্বিতীয় জন্ম! নূতন পথে অজ্ঞেয় পরমের সে সন্ধান করতে চলেছে। সেইদিন থেকে সে হলো দ্বিজ। শাস্ত্র তাই বলে গেছেন—"জন্মনা জায়তে বিপ্রঃ সংস্কারৈ দ্বিজ উচ্যতে।"

আজ অনেকের ধারণা উপনয়ন বা দ্বিজত্ব বুঝি শুধু পুরুষের পক্ষেই বিধেয়। তা নয়—তখন বহু নারী চিরদিন ব্রহ্মচারিণী থাকতেন। দীর্ঘদিন ব্রহ্মচর্য্য সাধন ক'রে অনেকে ব্রহ্মবাদিনী হতেন —যেমন বৃহস্পতির ভগিনী।

সেযুগে ব্রাহ্মণ-কন্যারা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যেতেন। প্রথম ব্রহ্মচারিণী বা ব্রহ্মবাদিণী, অপরটি সদ্যোবধূ। তবে উভয়পক্ষেরই উপনয়নের বিধি ছিল। ঋষি হারীত এ বিধি দিয়ে গেছেন। শাস্ত্রে নারীর বেদাধ্যয়নের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

"পুরাকল্পেষু নারীণাং মৌঞ্জি বন্ধন মিষ্যতে
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রী বাচনং তথা।"

এই বেদাধ্যয়ন, সাবিত্রী বাচন, সন্ধ্যোপাসনা,—ব্রহ্মকে জানবার সাধনার সুরু এই উপনয়নে। তার জন্যে আচার্য্যের সে কি আয়োজন। আচার্য্য বৈদিক মন্ত্র সহ তাঁর প্রিয় শিষ্যকে—নবজাত সেই মানবকে প্রশ্ন করবেন—তুমি কে? ব্রহ্মচারী হতে পারবে? তুমি কি সত্যকে অনুসরণ করবে? শিষ্য অগ্নি সমক্ষে উত্তরে তার সম্মতি জানাবেন। তখন আনন্দে আচার্য্য শিষ্যের সর্বাঙ্গ স্পর্শ ক'রে বিভিন্ন পুষ্টিকামনায়, সংযম আশায় বৈদিক মন্ত্র পাঠ করবেন। তারপর ঐ মুক্ত মেখলা ও ত্রিদণ্ডী যজ্ঞোপবীত দেবেন এক এক করে তার গলায়—বলবেন—"প্রজাপতি ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দো বিশ্বে দেবা দেবতা উপনয়নে যজ্ঞোপবীত ধারণে বিনিয়োগঃ।...

শিষ্যকে শুনিয়ে দেবেন কি গুণ ঐ যজ্ঞোপবীতে।

"ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্রং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥

তারপর আচার্য্য দেবেন তাকে গায়ত্রী-মন্ত্র, পড়াবেন সাবিত্রী। সে মন্ত্র বা দীক্ষাদানের আগে নানা মন্ত্রে তাকে শুদ্ধ করে নেবেন।

মেখলাদি পরিয়ে তাকে ব্রহ্মচারীর নির্দ্দিষ্টরূপে সজ্জিত করে শিষ্যের সব ভার গ্রহণ করে বলবেন—

"ওঁ মম ব্রতেতে হৃদয়ং দধামি, মমচিত্তমনুচিত্তন্তে অস্তু।"

জীবনের তপস্যা বা যোগ সাধনার পথের 'বর্ণপরিচয়'টুকু সুরু হ'ল এখন থেকে দৈনন্দিন—পরমপুরুষ ও পরমা-প্রকৃতি গায়ত্রীর রূপ-চিন্তায়, মন্ত্রোচ্চারণে ও ব্রত সাধনায়।

গায়ত্রী—রূপে এবং পরিচয়ে আমরা দেখি গায়ত্রীকে তিন রকমে। গায়ত্রীকে প্রভাতে আমরা যে রূপে চিন্তা করি সে রূপটি রজো-গুণাত্মিকা শক্তি বা কুমারীসদৃশা প্রকৃতি। শক্তির এই রূপই তো প্রকৃতির সৃষ্টির কথা মনে জাগায়। নিখিল ভুবনের মহাশক্তি

আদ্যাশক্তি ব্রহ্মার অঙ্গ থেকে নির্গত। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম শক্তি এই গায়ত্রী। তাঁর প্রথম রূপ সৃষ্টির আদিরূপ। তারপরই দ্বিপ্রহরে পালনকর্ত্রীর রূপ, বৈষ্ণবী রূপ তাঁর। তিনি তখন যুবতি-রূপা, কিন্তু সত্ত্বগুণাশ্রিতা শক্তি স্ত্রী-দেবতা। তারপর সন্ধ্যায় চিন্তা করি তাঁর পরা-প্রকৃতির রূপকে। প্রলয়কালীন রৌদ্রা অর্থাৎ সংহার মূর্ত্তি। রৌদ্ররূপা মহাকালীর ভগবতী বেশ।

এইভাবে নিত্য আমরা স্মরণ করি এক মহাশক্তিরই,—কালের আবর্ত্তনে জীবনের উদয়, মধ্যাহ্ন ও অস্ত-পথের কল্পনায় আমরা চলে যাই—সূচনা করি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের।

এখন এ চিন্তায় লাভ? লাভ এই যে ভগবান আছেন একথা যে কোন ভাবে যদি আমরা নিত্য মনে করি, সর্ব্বদা তাকে স্মরণ করি, মনকে সেই চিন্তায় সেই নামে ডুবিয়ে রাখি তবে অসৎ চিন্তা, কদর্য্য কামনা মনে আসবার আর অবসর পায় না। তাই যাতে খারাপ কথা বাইরের ঝড়ো হাওয়ায় মনে না ঢোকে, তাই আর্য্যগণ—চঞ্চল মনকে নিত্য নিয়ত দেব-চিন্তায়, নাম, জপ ও পূজা-অর্চ্চনায় আবদ্ধ রাখেন।

তারপর তা থেকে মন এগিয়ে যেত ব্রহ্মসাধনার দিকে। এই হবে তার বিদ্যারম্ভ, বেদাধ্যয়ন আর ব্রহ্মচর্য্যভাবে গুরুগৃহে সাধনা।

নিত্য স্মরণীয় সে গায়ত্রী মন্ত্র বা তার তত্ত্ব কথা—অতি গুহ্য বস্তু। সে সব গুরুর কাছেই শিক্ষণীয়। ছাপা বইএর পাতায় সে মন্ত্রের অর্থ বোঝান যায় না—কারণ, বই পড়ে বুদ্ধি হয়, বোধ হয় না। বিজ্ঞান বোঝা যায় কিন্তু জ্ঞান অন্য জিনিস। তবু গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থটুকু সাধারণ ভাবেও কী অপূর্ব্ব! গায়ত্রী মন্ত্র হচ্ছে—

"ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥

সাধারণ অর্থ এই যে—

"সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কর্ত্তা চরাচর বিশ্বের প্রসবিতা স্বর্গ, মর্ত্ত ও

আকাশব্যাপী দীপ্তিমান সূর্য্যের সেই তেজ আমরা চিন্তা করি, যে তেজ আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষে নিয়োগ করিতে-ছেন।" সহজ কথা—বিশ্বের সর্বশক্তির আধার ঐ সূর্য্য তেজ—বর্ত্তমান বিজ্ঞানও তাই বলে, তাকেই স্মরণ করা আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। তবে তার সঙ্গে প্রতিদিনের কর্ত্তব্য হচ্ছে দেহ মনকে শুচি করা—কর্ত্তব্য হচ্ছে পূর্ব্ব পুরুষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তৃপ্তি দেওয়া, কর্ত্তব্য হচ্ছে আদি পুরুষ ঐ দেবকুলকে প্রশস্তি জানান।

দৈনন্দিন শয্যাত্যাগ, শৌচ স্নানাদির মতন—সন্ধ্যাপ্রকরণও এক দৈনন্দিন অনুষ্ঠান।

এ অনুষ্ঠানেরও বহু বিধিনিষেধ আছে, আছে নানা প্রক্রিয়া। কিন্তু সাধারণতঃ এতে করতে হয়—মার্জ্জন, ঋষ্যাদিস্মরণ, প্রাণায়াম, আচমন, পুনর্ম্মার্জ্জন, অঘমর্ষণ, সূর্য্যোপস্থান, গুরুপরম্পরা স্মরণ। পিত্রাদির তর্পণ, গায়ত্রীর আবাহন, গায়ত্রীর ধ্যান, সাবিত্রী-জপ, বিসর্জ্জন, আত্মরক্ষা, স্তুতি, জলাঞ্জলি, সূর্য্যার্ঘ দান, দেব-প্রণাম ও বেদ পাঠ—মোট এইতো সন্ধ্যা-বিধি। এ তো আমাদের সকলকে চির-কাল করতে হয়। পরম নাস্তিকও শয্যাত্যাগের পর শৌচ করে, স্নান করে, বাপঠাকুর্দ্দার কথা মনে হয়ই, কার্য্য সিদ্ধির জন্য ঠাকুরকে ডাকে —স্বার্থে আর বিপদে নানা দেবতাকে স্মরণ করে। করে না কি?

কিন্তু গানের রেওয়াজের মতন—এটা নিত্যকার নিয়ম বলে ধরে দিয়েছেন শাস্ত্রকার—এইটুকুই না দোষ? ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলেছেন—"রোজ স্মরণ কর তাঁকে যাঁর শক্তিতে সব, রোজ তর্পণ কর তোমার পিতৃলোককে, মনে কর তোমার বাপঠাকুর্দ্দাকে—তারপর মনটাকে স্থির করে ভাব—সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত এক পরম শক্তির জন্য তুমি, তোমার আনন্দ, সুখ, স্বাস্থ্য, আহার—তোমার এই সুন্দর ভুবন।" এই হল ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বা সন্ধ্যা-প্রকরণ।

সমাবর্তন—গুরুগৃহের কাজ শেষ ক'রে এবার সংসারী মানুষ সংসারে ফিরে আসবে নিজের ঘরে—তাই এই আশা ও আনন্দ।

এই সমাবর্ত্তনও আমাদের একটি উৎসবময় সংস্কার। আজ আমাদের ঘরে গুরুগৃহে যাওয়া উঠে গেছে তাই উপনয়নের সঙ্গে সঙ্গেই সমাবর্ত্তনটুকুও শেষ হয়। কোন কোন স্থলে মা এসে গুরুগৃহে যাওয়ার পথই আগলে ধরে। সংস্কারকে সংহার করেছি আমরা মায়ার মোহ দিয়ে। নইলে ব্রহ্মচারী স্নান-প্লাবন করবে অর্থাৎ প্রিয় বচন, প্রণিপাত ও আচার্য্য পদে নানা উপহার প্রণামী দিয়ে অনুমতি নেবে গৃহে ফেরবার।

এই সময় ফেলে দেবে সেই মেখলা, কৃষ্ণাজিন ও দণ্ড, নিজে সাজবে নানা ভাবে—সবই মন্ত্র পড়ে। তারপর নিন্দা, খ্যাতি, বিদ্যা, অবিদ্যা, জ্ঞান, অজ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুরই জন্য গুরুকে কৃতজ্ঞতা জানাবে। হোম করে—বিদায় নিয়ে চলে আসবে সংসারের পথে দীর্ঘ দিন পরে।

বিবাহ—এরই পর গার্হস্থ্যাশ্রমের দায়িত্বপূর্ণ সংস্কার বিবাহ। সংসারে এবার সে অন্য গোত্র থেকে নিয়ে আসবে কন্যা—অগ্নি সাক্ষী রেখে তাকে গ্রহণ করবে—জীবন মরণের সঙ্গী সে, দায়ী হবে সে তার ভরণ-পোষণের। সেই কন্যার গর্ভে হবে আগত বংশধর। সেই বংশধরই দেবে পিণ্ড—পুন্নাম নরক থেকে ত্রাণ করতে—বিবাহের এই উদ্দেশ্য। প্রকৃত পক্ষে নিজের বংশধারাকে অব্যাহত রাখাই, নিজের পিতৃ-পিতামহের স্মৃতিকে জাগ্রত রাখাই বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য। এই সংস্কারে পাত্র বৈদিক মন্ত্র পাঠ ক'রে কন্যা গ্রহণ করবেন, প্রশ্ন করবেন কে এই কন্যা—কেন এই কন্যা গ্রহণ? বলবেন—"ওঁ ক ইদং কস্মা অদা কামঃ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ গ্রহিতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্লামি প্রতিকামৈতত্ত্বে।

পতির এই কামনাময় প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ পাচ্ছে নিম্নোক্ত মন্ত্রের মধ্য দিয়ে—

"প্রজাপতি ঋষি ত্রিষ্টুপছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যা পরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়মপ যীক্ষামষষ্টম্। কন্যা উত ত্বয়া বয়ংধারা উদন্যা ইবাতি গাহেমহি দ্বিষঃ।" অর্থাৎ—

এ কল্যাণী কার ? কেবা দিল বালা কারে ?
কামদেব দিল কাম কাম অধিকারে
কামদাতা দিল কন্যা কাম গ্রহীতারে
সে কামনা লীন হলো কামনা সাগরে
হে কন্যে কামের বশে কামের সহায়ে
গ্রহণ করিনু রহ কামময় হয়ে।

তারপর পবিত্র বৈদিক মন্ত্র পাঠ ক'রে তিনি করবেন কন্যার পাণি-গ্রহণ।

বৈদিক মন্ত্র পড়ে সে কন্যা গ্রহণ করবে বটে, কিন্তু সমবেত দর্শকগণের সামনে কন্যাকুল ও পিতৃকুলের পরিচয় একাধিকবার ঘোষিত করে হবে সে মিলনের আয়োজন কারণ বংশ-ধারার মান রাখতে তারা কখনও ভুল করে না!

তারপর—বরকে অতিথি-দেবতা রূপে পাদ্য, অর্ঘ্যে স্বাগত জানিয়ে—বস্ত্রাদিতে ভূষিত করে জানু ধরে কন্যাকে তুলে দেবে পিতা পাত্রের হাতে। স্বয়ম্বরার রীতিকে উল্লঙ্ঘন করে বরকে বরণ করবে কন্যা-সম্প্রদাতা। তারপর কন্যা দেবে বরমাল্য তাঁর কণ্ঠে।

এই সময়ই মুখচন্দ্রিকা দর্শন। কী মধুর আয়োজন।। লজ্জিতা শঙ্কিতা কন্যার মুখে আবরণ, অঙ্গে আভরণ মনে প্রিয়দরশনের কামনা, পাত্রেরও অন্তর আকুল নবাগতা জীবন-সঙ্গিনীর মুখ-চন্দ্রিকা-দর্শনে। গুণ্ঠন হবে মুক্ত শুভ-লগ্নে চারি চক্ষুর হবে মিলন ।

তারপর দানান্তে—দক্ষিণা। সে যুগে গো-দানই ছিল শ্রেষ্ঠ। তাই জামাতাকে দেবার জন্য হ'ত গো-ধনের আয়োজন। পাত্র গো-ধন সাধারণের সম্পদ জেনে গো-ধনকে করে দিতেন মুক্ত সাধারণের জন্য। জীবনের প্রথম মিলন দিনে সাধারণের নিকট তার এ আগ্রহের দান। গো-দেবতাদের আহ্বান করা হত—সেই আহ্বান আজ নাপিতের মুখে "গৌর্গৌঃ।

তারপর কুশণ্ডিকা—আর্য্যগণের প্রতি কার্য্যের প্রধান দেবতা, প্রধান সাক্ষ্য আগুন। যজ্ঞে তাই তাদের প্রতি কার্য্যের আহুতি। আগুন জ্বালিয়ে অগ্নি ও দেবতাদের সাক্ষ্য করে নেবে স্ত্রীকে।

কী অপূর্ব্ব তার আয়োজন—আগুনটির নাম দেওয়া হবে "যোজক" যোজনার কাযেই যে তিনি জাগ্রত হবেন। তারপর স্নাতা কন্যাকে বর কাপড় পরাবেন—"আধোবস্ত্র পরিধাপনে বিনিয়োগঃ"—

"উত্তরীয় বস্ত্র পরিধাপনে বিনিয়োগঃ"—

প্রথম লজ্জা—একটু মন্দীভূতা ; প্রয়োজন তার প্রথম আলাপ—তাই শ্রেষ্ঠ কামনা উচ্চারিত হ'ল—

"শতঞ্চ জীব শরদঃ স্নুবর্চ্চা বসূনিচার্য্যে বিভূজাসি জীবন্।

এইখানে দেখা যায়—হয়তো স্বয়ম্বর প্রথার জন্যই হোক বা অন্য কারণেই হোক—কন্যাকে নিয়ে পতি শকটে পতিগৃহে চলে যেতেন। পথে তিনদিন পর্য্যন্ত লবণ-ক্ষার-বর্জ্জিত অন্ন খেতেন, সর্ব্বদা একত্রে থাকলেও ভূমিশয্যায় থাকতেন। সুখ-শয্যার কল্পনাও ছিল না।

তিনদিন মধ্যে গৃহে পৌঁছুলে কন্যা-সম্প্রদাতা এসে জামাতাকে অর্ঘাদির দ্বারা পূজা করতেন

ক্রমে সমাজে পূর্ব্বেই বিবাহ স্থির হতে থাকে। তাই জামাতার আহ্বান হয়—এলে স্বাগত জানিয়ে অর্ঘ্যাদির দ্বারা পূজা করে কন্যা সম্প্রদান হয়। বেদাদি মন্ত্রের অর্থ নিয়ে বহু বাদবিসম্বাদ—তা সে বিচারের উপযুক্ত ক্ষেত্রে আলোচনীয়। তাই আমরা শুধু মোটামুটি ভাবেই সব আলোচনা করবো। নিয়ম আজ নাই হোক—সেই পিতৃলোক থেকে লোকান্তর অর্থাৎ পতিলোক গমনের ভাব জাগিয়ে তুলতেই আজও হয় "কট-যাত্রা"—কট-পাদ-প্রবর্ত্তন। আজ শিলের উপর হেঁটেই তা দেখান হয়। মন্ত্র বলা হয়—"...ওঁ প্রাস্মাঃ পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গম্যাঃ।"

তারপর বধূকে সঙ্গে নিয়ে করবেন মহাব্যাহৃতি হোম। এক এক দেবতার কাছে এক এক প্রার্থনা। সে প্রার্থনা পিতৃলোক-বিয়োগ-

বিধুরা রোরুদ্যমানা কন্যার শান্তি কামনায়—সে প্রার্থনা সন্তানবতী ভাবিমাতার দেহপুষ্টি প্রার্থনায়।

লজ্জা আরো দূরে গেছে—দু'জনে দু'জনকে পেয়েছে—আরও নিকটতর ভাবে তাই একেবারে যুক্ত হয়ে, এক অপরের বক্ষলগ্ন অঞ্জলি বদ্ধ হয়ে—"লাজ হোম" দান। ফুল পোড়াতে—স্বভাব-সন্তানের বড় মায়া, তাতে আবার মিলন-পর্ব্বে। ফুলের মালার বন্ধনেই তো বন্ধনের সূত্রপাত। তাই ফুলের মতন খৈ দিয়ে লাজ-হোম। খৈর অপর নাম লাজ। লজ্জাও তার ঘুচলো।

তারপর সপ্তপদী ; সাতটি শপথ বাক্যে স্বামী স্ত্রীকে বুঝিয়ে দেবেন—দম্পতির কর্ত্তব্য ও আকাঙ্ক্ষার কথা। "প্রজাপতিঋষিঃ একপাদ বিরাট ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা"—স্মরণ করে এবং প্রতিপদে বিভিন্ন দেব স্মরণ করে বিভিন্ন ছন্দে বিভিন্ন মন্ত্রে বলবে—

একপদ অতিক্রম—জন্মলাভ তরে
দ্বিপদে রাখিও—শক্তি কামনা অন্তরে
তৃতীয় চরণ—নিত্য ব্রতের কারণ
চতুর্থ চরণে—সৌম্যপ্রার্থী অনুক্ষণ
পঞ্চমেতে—গৃহপশু রক্ষার কামনা
ষষ্ঠ পদে—চিত্তরক্ষা চিত্তের বাসনা
ঋত্বিক লাভের আশা সপ্তম চরণে
সপ্তপদি দম্পতিরে বাঁধিল বন্ধনে।

শেষ হল তখন পর্ব্ব—পাদ্যঅর্ঘ্যে পূজা করে যার হাতে কন্যা দেওয়া হল সে শুধু পতি দেবতাই রইল না, হল সখা"—"ওঁ সখা সপ্তপদী ভব সখ্যন্তে গমেয়ং, সখ্যন্তে মা যোষাঃ সখ্যন্তে মা যোষ্ট্যাঃ"—

শুধু কি বর ও কন্যা নিজেদের কথাই ভাববেন—ভাববেন তারা আগত দর্শকদের কথা—তাদেরই শুনিয়ে বলবেন—আশাস্যমানা দেবতাকে স্মরণ করে—"...বিবাহ প্রেক্ষকজনা মন্ত্রণে বিনিয়োগঃ' — বলবেন—"ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ংবধূরিমাং সমেতে পশ্যত।"

এত কাণ্ডের পর হয় পাণি-গ্রহণ। লজ্জার আড়ষ্টতা গেছে—সৌখ্য ভাব এসেছে, শপথ হয়েছে তখন—হবে অধিকার পাণিগ্রহণের এ কার্য্যে স্মরণ করা হ'ল "ভগাদয়ো দেবতা"কে। বর বলবে—

"ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।"

বলবে—"ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব। ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।"

শুধু কি এই। কন্যা গ্রহণের পর বিচার—এর অঙ্গ, চিত্ত দূষিত হয় নি তো—অশুচি নয় তো? গোপন সে কথা—তাই যদি হয়েও থাকে তবে প্রয়োজন তার শোধন। কারণ অশুচি দেহ কেন ভোগ করবে ঐ দেব-সম স্বামী।

উত্তর-বিবাহে—তাই হল অঙ্গ শোধন। "কেশেষু যচ্চ পাপকং" "শীলেষু যচ্চ পাপকং" ভাষিতে হসিতে চ যৎ দন্তে, হস্তে, পাদে,—এমন কি "উর্ব্বোরুপস্থে জঙ্ঘয়োঃ সন্ধানেষু চ যানিতে তানিতে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি সময়াম্যহং স্বাহা"—মন্ত্রোচ্চারণে সব হল শুচি ও শুদ্ধ।

তারপর বর বধূ যুক্ত হয়ে মুক্ত কণ্ঠে প্রার্থনা জানাল সাক্ষ্য রূপে অরুন্ধতী নক্ষত্রকে। বাস্তবের সাক্ষী প্রকৃতির নক্ষত্র। জানাল কামনা ঐ ধ্রুব নক্ষত্রকে, যা শাশ্বত—যা ধ্রুব। বল্‌ল—"ওঁ ধ্রুবা দ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগত। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতি কুলে ইয়ম্।" তারপর স্ত্রী স্বামীকে দেবজ্ঞানে প্রণাম করলো—পতি করলেন আশীর্ব্বাদ। এরপর ভোজন আলাপন এমন কি নগর ভ্রমণ।

হিন্দুর বিবাহে কোন কিছু বাদ পড়ে নি। এ শুধু মন্ত্র নয় এ শুধু যজ্ঞ নয়—প্রতিটি পথে সুন্দর অপূর্ব্ব এক কাজের ধারা।

নগর ভ্রমণে নববধূ—পথপার্শ্বে এক শিশুকে নেবে বুকে। প্রিয়ার পাশে পুরুষ, বুকে শিশু—মনে জাগবে তবে না মাতৃত্ব। আর সেই ভাবের জাগরণেই শিহরণ, পুলক-রভস-মিলনে আকাঙ্ক্ষা।

তাই পুষ্পশয্যা, তাই বাসর-শয়ান। তারপর আবার সেই প্রথম সংস্কার সুরু।

এই দশবিধ সংস্কারের মূলে রয়েছে 'যজ্ঞ'। তাই এগুলো পাই আমরা শ্রৌত-সূত্রের মধ্যে। আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রের নানা সংস্কারের মধ্যে বিবাহানুষ্ঠানই শেষ। তারপরই মানুষ প্রবেশ করলো গৃহস্থ আশ্রমে।

তাই তখন তার জন্যে প্রযুক্ত হলো আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র। সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট হ'লো অন্যান্য কর্ত্তব্য-বিধি এবং নিয়মাদি।

এই সংস্কারগুলি মুখ্যতঃ দশবিধ হ'লেও কেউ কেউ আবার চতুর্দ্দশ কিংবা পঞ্চদশ বা ষোড়শ সংস্কারও বলেছেন। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের বেদাধ্যয়ন কালের মহানাম্নীব্রত, মহাব্রত, উপনিষদব্রত ও গোদানব্রতগুলোকে ধরে চতুর্দ্দশ সংস্কার বলা হয়েছে। আবার অন্ত্যেষ্টি বা দাহ-সংস্কারকে ধরে হয়েছে পঞ্চদশ এবং নিষ্ক্রমণ বা সমাবর্ত্তনকে ধরে ষোড়শ সংস্কার।

তাছাড়াও স্ত্রী-সংস্কার বা শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থাও একরূপ সংস্কার। সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রাদ্ধ বা পিতৃপুরুষকে শ্রদ্ধা জানাবার বিধি দিয়ে প্রতি সংস্কারকে মহিমতর করা হয়েছে। আর্য্য সন্তান জাতকর্ম্ম, উপনয়ন, বিবাহ যাই করুক দেবতার সঙ্গে সঙ্গে পিতৃকুলকে ও মাতৃকুলকে স্মরণ করতে ভোলেনি। তবে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার মধ্যে একটা বিয়োগ ও বিচ্ছেদের সুর, একটা শোকের গ্লানি আছে বলেই বিবাহাদি আনন্দ-উৎসবে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধটিকে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বা নান্দীমুখ বলা হয়েছে।

বংশবৃদ্ধির জন্যে ঐ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন তাই নাম **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ** আর আনন্দ-উৎসবের নান্দীগানে সে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন—তাই নাম **নান্দীমুখ**।

আবার এই বৈদিক সংস্কারের আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের পাশে ঠাঁই জুড়ে রয়েছে ষোড়শ মাতৃকার পূজা, গণেশাদির পূজা এবং নানা আড়ম্বর।

অদ্বৈতবাদের পাশে দ্বৈতবাদের এ সংমিশ্রণই যেন ভাবী-প্রতিমাদি পূজার ইঙ্গিত এনে দিয়েছে। আবার হয়তো সেগুলো পরবর্ত্তী কালেই প্রক্ষিপ্তভাবে সংযুক্ত হয়েছে।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে বিবাহের পরবর্ত্তী সংসারাশ্রমের প্রধান কর্ত্তব্য বলেছেন পঞ্চযজ্ঞ। এমনকি শ্রৌতসূত্রের বৈদিক যজ্ঞ থেকেও শাস্ত্র এই পঞ্চযজ্ঞকে শ্রেষ্ঠতর বলে গেছেন।

পঞ্চযজ্ঞ—এই পঞ্চযজ্ঞ হচ্ছে—দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ। দেবতার জন্যে যে যজ্ঞ বা স্মরণবিধি তা দেবযজ্ঞ, তারপরই হলো সর্ব্বভূতের জন্যে যে বলি বা উৎসর্গ অর্থাৎ ছোটবড় প্রাণীর জন্যে যে সেবা, দান, আহার্য্য বিতরণ তা ভূতযজ্ঞ, এবং পিতৃকুলের উদ্দেশ্যে যে পিণ্ডদান তাই হলো পিতৃযজ্ঞ, আর ব্রহ্মযজ্ঞ মানে হ'লো বেদ-অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং মনুষ্যযজ্ঞ মানে অতিথি-সেবা। এই পাঁচটি কর্ত্তব্য হচ্ছে সংসার-আশ্রমে প্রতি গৃহস্থের নিত্য কর্ত্তব্য এবং সকল যজ্ঞ থেকে শ্রেষ্ঠ।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া—জীবিত কালে জীবনকে যারা নানা সংস্কারে ভাগ ক'রে নিলেন তাঁরা কিন্তু জীবন-অবসানে অর্থাৎ মরণের পরেও সে সংস্কার বা নিয়ম-শৃংখলাকে ভুলতে পারলেন না—ভাবতে পারলেন না যে দেহটা মায়া। তাঁরা প্রিয়জনের দেহ বলেই তাতে ঘৃতাদি মাখিয়ে, নানা তীর্থ-জলকে স্মরণ ক'রে পরিচ্ছন্ন জলে স্নান করিয়ে নেন। তারপর দেহের সাতটি অঙ্গে সোনা দিয়ে চিতাশয্যায় শুইয়ে দেন। সেও এক উৎসব। এই অনুষ্ঠানেও তাঁরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ কোরে আবাহন, শ্রদ্ধায় অন্নদান তর্পণাদি করেন তারপর অগ্নিকে দেবতাজ্ঞানে হাতে নিয়ে সেই প্রিয়জনের মুখে দেন। মায়া-মোহের চরম লাঞ্ছনা। এ ক্রিয়াও নিষ্পন্ন হয় মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে—

"ওঁ কৃত্বাতু দুষ্কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা
মৃত্যু-কালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম্।

ধর্ম্মাধর্ম্ম সমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম্
দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ সগচ্ছতু।"

দিব্যলোকে আত্মার সদ্‌গতির জন্যে এ কামনা আর শ্মশানে পাপস্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে ভোগের উপর বৈরাগ্যের প্রতিষ্ঠা!

এই আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থাও শাস্ত্রকার তিন রকম নির্দ্দেশ দিয়েছেন।—আহ্বনীয় অগ্নি, গার্হপত্য অগ্নি এবং দক্ষিণাগ্নি। অগ্নিস্পৃষ্ট দেহের দাহ দেখে আত্মীয় বলবেন—

"প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্বৈভিঃ"

"যে পথে গিয়াছে পূর্ব্বপুরুষ
সেই পথে যাও তুমি—"

ধারণা ক'রে নিলেন—ঐ দেহ-প্রজ্বলিত অগ্নি-ধূম যে-পথ ধরে যাচ্ছে, আত্মার গতিও বুঝি সেই পথে।

দেহ পুড়ে ছাই হবে—তারপর অস্থি ও মাংসপিণ্ড দেবেন নদী জলে। নদী জলেই চিতাশয্যা ধুইয়ে পরিচ্ছন্ন ক'রে শববাহী সহচর-গণকে নিয়ে তাঁরা ফিরে আসবেন। এই আসবার পথে তাঁরা ফিরেও তাকাবে না আর মায়ার শেষ যা চিতায় হয়ে গেলো নিশ্চিহ্ন সেই দিকে। বলবে—"ইমে জীবা মিমৃতৈরাববৃত্রন"—"জীবিতগণ মৃতের নিকট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে।"

ফিরে এলো গৃহী শ্মশান থেকে শ্মশানের বৈরাগ্য নিয়ে। অপরূপ গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ এই সংস্কার।

এর বেশবাস ও ভূষাও বৈরাগ্য-দীপ্ত। আর্য্যসন্তান মৃত্যুকে ভাবে মুক্তি। মরণকে বরণ করাই তার কাম্য—তাই বেশে তার উজ্জ্বল বর্ণ—শুভ্র বাস, শুভ্র সজ্জা।

তারপর দশদিন ধরে চলে মৃতের আত্মাকে তৃপ্তি দিতে—তর্পণ। বেদোক্ত চারটি মন্ত্রে—শান্তিজলে সব শোক প্রশমন করার বিধি আছে।

ব্রাহ্মণরা প্রিয়জনের মৃত্যুর পর দশদিন অশৌচ পালন করেন। কিন্তু এই অশৌচ পালন কেন? কঠোর সংযম ও কৃচ্ছ সাধনের

দ্বারা আমরা প্রিয়জনের স্মৃতিকে বহন করি। এই সময় আমরা হবিষ্যান্ন, এক বস্ত্র এবং উত্তরীয় বন্ধন—বিবিধ আচার বিচারে ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা মৃত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক'রে থাকি। এই সংযম অনুষ্ঠানাদির মধ্যে নিজেদের অসুবিধা তৈরী করে প্রতি অসুবিধায় প্রিয়জনকে স্মরণ করার মধ্যেও যেন এক মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

শ্রাদ্ধ—এও এক সংস্কার। মৃত্যুর পর প্রথম শ্রাদ্ধের নাম আদ্যশ্রাদ্ধ। এই আদ্যশ্রাদ্ধের পর প্রতি মাসে মাসিক শ্রাদ্ধ করতে হয় এবং বৎসরান্তে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করার বিধি। এই বাৎসরিক শ্রাদ্ধকে সপিণ্ডকরণ বলা হয়। অর্থাৎ এই শ্রাদ্ধ পিতৃকুল ও মাতৃ-কুলের মৃত আত্মার ঊর্দ্ধগতি কামনা করা হয় এবং সকলের পিণ্ডকে মিলিত করা হয়—এই মিলনের উদ্দেশ্যই হ'লো তাঁরা আর পৃথক রইলেন না—সকলে মিলে একসঙ্গে ভোজন করলেন। এ ছাড়াও প্রতি আনন্দ-উৎসবে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের বিধান আছে, প্রতি পর্বে পার্বণ শ্রাদ্ধ, প্রতি তীর্থ-যাত্রায় তীর্থ-শ্রাদ্ধ—সব ব্যবস্থাই হয়েছে জীবনের যে কোন কাজে পিতামাতার মৃত আত্মাকে স্মরণ উদ্দেশ্য নিয়ে।

শ্রাদ্ধে বৈদিক মন্ত্রেরই প্রাধান্য দেখতে পাই। ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ, তাঁদের আহ্বান, আদর-আপ্যায়ন এবং ভোজন দান ও সেবা, হ'লো শ্রাদ্ধের আর একটি অঙ্গ। এর কারণই হ'লো তাঁদের তৃপ্তিতেই পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিসাধন। মৃত-আত্মাকে পিণ্ডদানকালে মৃত-আত্মা সশরীরে এসে উপস্থিত হ'ন না তাই তাঁর প্রতীক হিসেবে ব্রাহ্মণকে বসাতে হয় পিতৃজ্ঞানে শ্রাদ্ধের স্থলে। এক একজন পিতৃ-পুরুষকে স্মরণ ক'রে এক একজন ব্রাহ্মণকে বসাবার কথা শাস্ত্রকার বলেছেন। এই পিতৃ মাতৃকুল উভয় কুলকে স্মরণ ক'রে ছয়জন ব্রাহ্মণকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করাই বিধেয়।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে সপ্তম কণ্ডিকায় একথা বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। আজ অনেক কিছুই লোপ পেয়েছে—পরিবর্তে এসেছে কুশাদির ব্রাহ্মণ গড়িয়ে পিণ্ডদান।

এই ব্রাহ্মণকে সম্মুখে বসিয়ে—"আপঃ প্রদায়"বলে দেবে ব্রাহ্মণ হস্তে জল এবং অর্ঘ্য স্বধা ব'লে অর্ঘ্য। "যা দিব্যাআপঃ পয়সা সম্বভূবুর্য্যা অন্তরীক্ষ্যা উত পার্থিবীর্য্যঃ।

হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ সংশ্যোনাঃ স্হংবা ভবন্তি।"

"যে জল দ্যুলোকে জন্মিয়া (সূর্য্য কিরণ সহায়ে) পৃথিবীতে আসিয়া থাকে, যে জল অন্তরীক্ষে মেঘোদরে বিদ্যমান থাকে এবং যে জল সমুদ্রাদিরূপে পৃথিবীতেও আছে তাদৃশ ত্রিলোকব্যাপী হিত রমণীয় বর্ণ যজ্ঞীয় জল আমাদিগের মঙ্গলকারী ও হিতকারী হউক।"

প্রকৃতির দ্বারা মানুষের অহরহ যে সেবা তারই স্বীকৃতি এই মন্ত্রে। তারপর ব্রাহ্মণকে গন্ধমাল্য ধূপ দীপাদি প্রদান ক'রে পিণ্ড হাতে নিয়ে ব্রাহ্মণের অনুমতি নেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ অনুমতি দিলে পিণ্ড অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে অগ্নি মধ্যে দেবগণের আহুতির ব্যবস্থা থাকলেও, পিতৃলোকের আহুতি দিতে হয় হাতে।

এরপর সেই অপূর্ব বেদমন্ত্র—মধুমতি ঋকগুলি পড়া হয়।

"ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ ওঁ মধু নক্তমুতোয সো। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ওঁ মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমান অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু মধু মধু।

মধু বহে ঐ বায়ুর প্রবাহে
মধুক্ষরে নদী ধারে
ওষধি সকল হোক সদা মধুময়।
রজনী ও ঊষা মধু ভরপূর
বসুধার ধূলি হউক মধুর
দেব পিতৃলোক যেন মধুসম হয়।
মধুর পাদপ হোক মধুবন
মধুতে পূর্ণ হোক সে তপন
দিশি দিশি মধু—মধুর সকল দিক
মধু-মধু- মধু-এ ভুবন, সবে মধুতে ভরিয়া নিক॥

পিতৃকুল স্মরণে এই যে নিখিলের মধুরতার কল্পনা—কি অপূর্ব্ব, কি অতুলনীয় বিশ্ববোধ।

শুধু কি এই। পিতামাতা বা আত্মীয়ের মৃত-আত্মাকে শ্রদ্ধা জানাবার আগে তাঁরা শ্রদ্ধা জানান সত্য ত্রেতা দ্বাপরের পূর্ব্ব-পুরুষদের। তাঁরা স্মরণ করেন মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহাজনদের—স্মরণ করেন দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি যুধিষ্ঠির, অর্জুন, ভীমসেন প্রভৃতিকে। শুধু রাজন্যবর্গকে নিয়েই নয়—তাঁরা স্মরণ করেন কুরুক্ষেত্র তপোবনের বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদের—তারপর তর্পণ করেন তাঁরা একে একে সকলের। যার কেউ নেই, যে দীন হীন—যে সকলের অবজ্ঞেয় তাকেও তর্পণ করা হয়।

অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম
ভূমৌ-দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্
ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা নবন্ধুর্নৈবান্ন সিদ্ধি···

এই যে সকলের জন্য তর্পণ, সকলের জন্যে শ্রদ্ধা, এ কি কম কথা? সাম্যবাদের এত বড় আদর্শ আর কি কোথায়ও আছে? সকলের কল্যাণ, সকলের তৃপ্তি—সকলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, ভুবনের প্রতিটি দ্রব্যকে মধুময় কল্পনা করে—বিগত আত্মীয়ের তৃপ্তি কামনায়, ব্রাহ্মণ অতিথির সেবা, নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের মাল্যদান, অর্ঘ্যপাদ্যাদি সমর্পণ এসব কিছুর মধ্যেই যে আছে বিশ্ব-প্রেম!

এ শ্রদ্ধা কোন স্বার্থের জন্য নয়, কোন প্রত্যাশায় নয়, কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যও নয়—তাঁরা শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আপামর জনসাধারণের উদ্দেশ্যেই। তাদের স্মরণ ক'রেই আনন্দ, সেই তৃপ্তি আর শ্রদ্ধা জানানই শ্রাদ্ধ।

এমনি আরও অনেক অনুষ্ঠান বা সংস্কার বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে—যেমন জন্মতিথি, বিদ্যারম্ভ, ঋতু-সংস্কার প্রভৃতি।

জন্মের পর মানুষ প্রতিবর্ষে জন্মতিথির পূজা করে। অন্নপ্রাশনের পর নামকরণ, বিবাহে কুশণ্ডিকা, গর্ভাধানের প্রথমবারে প্রথম ঋতু-

দর্শনে ঋতু-সংস্কার—এমনি সব ছোট ছোট অনুষ্ঠানবিধি আমাদের মধ্যে আজও প্রচলিত আছে।

আচমন, অধিবাস, স্বস্তিবাচন, আসনশুদ্ধি, ঘটস্থাপন, প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, যজ্ঞ, হোম, শান্তি, উদীচ্যকর্ম, কুশণ্ডিকা, পঞ্চগব্য-শোধন, পঞ্চামৃত-শোধন, বেদী-শোধন, তর্পণ, স্বস্ত্যয়ন, বাস্তুযাগ প্রভৃতি ছিল প্রথমে প্রায়ই বৈদিক অনুষ্ঠান, তারপর ক্রমে এল দেব-দেবীর কল্পনা—এল ঘট, পট, বরণডালা নিয়ে তাঁদের পূজা। সুন্দর ভাবে যজ্ঞের মণ্ডলগুলি থেকেই আলপনা এল গৃহাঙ্গনার হাতে— এল প্রকৃতির দেওয়া দান—শস্যাদি দিয়ে কল্যাণ কামনার নানা অনুষ্ঠান।

প্রথম যে গ্রহ-নক্ষত্র বা সূর্য্য চন্দ্রকে দেবজ্ঞানে বেদ্ স্তব করল—তাঁরাই এল দেবমূর্ত্তি ধরে, আরও নানা জনকে পূজাঙ্গনে সঙ্গে নিয়ে—এলেন তখন শক্তি, লক্ষ্মী, সরস্বতী—আরও পরে এলেন ষষ্ঠী—শীতলা, সত্যনারায়ণ।

তবে কখনও প্রকৃতির কথা—তার দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা ভুলিনি আমরা। তাই দেবীমূর্ত্তির পাশে এল নব-পত্রিকা, ঘটে এল পঞ্চপল্লব, দোরে এল কলাগাছ, উঠোনে বসালাম তুলসী, স্বর্গ-কামনায় বট-অশ্বত্থের প্রতিষ্ঠা করা হল—পুকুর প্রতিষ্ঠা, নবান্ন, পোষ-পার্ব্বণ দেখা দিল।

বেদের ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, ক্ষিতি, সূর্য্য, প্রভৃতির স্তবের সুর ধরে দেবতার আসনে তেত্রিশ কোটি দেবতা এসে জড় হলেন।

অদ্বৈতবাদের মন্ত্রে দ্বৈতবাদের সাড়া জাগল।

বৈদিক মন্ত্রের শুষ্কতার মধ্যে পৌরাণিক আখ্যানের সরসতা জেগে উঠলো। নীরস দুর্ব্বোধ্য উপনিষদের পাশে—বেদের ঐশী শক্তিকে মানুষ নিজের মনের মতন করে সাজাল। ভুলও কি তাতে তেমন আছে কিছু ? ঐশী শক্তির প্রভাব তো সর্ব্বভূতে—সর্ব্বত্র—সর্ব্বস্থানে বা সর্ব্ব দ্রব্যে। তবে ঘট, পটকে যদি ঠাকুর ভাবি, হনু-মানকে যদি পূজা করি, তুলসীতলায় যদি জল ঢালি—ক্ষতি কি ?

বরং তাতে মহান ভারতের অতি জটিল বিচার তত্ত্ব, দর্শন ও উপনিষদের পাশে অপরূপ হয়ে দাঁড়াল উৎসব আনন্দের কলরোল, এল শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণবের পূজা, তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বা ভক্তের প্রেমোন্মাদনা। সাধারণ মানুষ উৎসবের আড়ম্বরে যদি সত্য বা শাশ্বতকে ভুলে যায়—যদি পরমসত্য যে ঐশী শক্তি তাকে ভুলতে বসে, তাই ভারতের প্রকৃতকর্ম্ম—হোম, যাগ, যজ্ঞ জুড়ে দিলেন তাঁরা প্রতি উৎসবে, প্রতি সংস্কারে,—গায়ত্রী বা সন্ধ্যাবন্দনার বিধি দিয়ে বেঁধে ফেল্লেন দৈনন্দীন জীবন ধারা।

প্রাতে শয্যা-ত্যাগ থেকে সুরু করে শয্যা-গ্রহণ পর্য্যন্ত প্রতি পদক্ষেপে তাঁরা ধর্ম্মকে করলেন চলার সাথী।

শয্যা ত্যাগে তাঁরা করলেন ভগবৎ স্মরণ, শৌচে আনলেন বিধি—স্নানে আনলেন নিয়ম, এমনকি তৈল-মর্দ্দনে—দৈনন্দিন প্রতিটি কাজে নানা উপদেশে, জীবনের নানা বিধিকথা রচনা করে ফেল্লেন।

তবে তার প্রতিটি বিবরণে ছিল স্বাস্থ্য ও নৈতিক জীবন গঠনের প্রয়াস। স্নানের পর ফুলটি তুলবে কি মন্ত্রে, কিভাবে—আসন করবে কেমন করে সবটারই বিধি হল স্থির। পঞ্চগব্য, নবপল্লব, সপ্ত-মৃত্তিকা এসবই নানা উদ্দেশ্যে এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রকৃতিকে তুষ্ট করতে সংগৃহীত হ'লো। দেবতার সঙ্গে লতাবৃক্ষের—লতাবৃক্ষের সঙ্গে গ্রহ নক্ষত্রের, আবার গ্রহনক্ষত্রের সঙ্গে জীবের সংযোগ করে প্রতিটির জন্য প্রতিটির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে আর্য্যসন্তান—জীবনকে সুসংস্কৃত করলেন, পদে পদে বাধা দিয়ে নয়—বিধি দিয়ে।

আজ সে সব বাধা বলে আধুনিক ছেলেরা হেসে উড়িয়ে দিতে চায়—অথচ পারে না তা ভাঙ্গতে রক্তধারার ডাকে। বিপদে ঐ যে মানৎ, পথে মন্দির সম্মুখে ঐ যে প্রণাম, বিবাহে ঐ যে অগ্নি শীলাকে সাক্ষ্য করে কন্যা গ্রহণ, ঐ যে কুশণ্ডিকা, সপ্তপদী—এসব না মেনে আজও যেন পারে না। পারে কি ঐ নারী তার এয়োতির চিহ্ন এক ফোঁটা সিঁদুর মুছে ফেলতে? হাতের শাঁখা ভেঙ্গে ফেলতে,

বাপ মায়ের ছবির উপর থুথু ফেলতে বা দেবদেবীর পটের উপর লাথি মারতে তারা পারে না। সেখানে হিন্দুসন্তান সংস্কারের দাস।

যুগ যুগের দশবিধ সংস্কার, বাপ পিতামহের ধর্ম্ম-স্বীকৃতিই তাদের অন্তরে আর্য্যধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করায়। কিন্তু কালপ্রবাহে আজ সে সবই মন্ত্রসার আড়ম্বর মাত্র হয়ে পড়েছে বলেই অনেকে যেন একটু বিচলিত। তবে তাদের এই জিনিসগুলোকে হয় বিচার ক'রে গ্রহণ করতে হবে, নইলে ঋষিবাক্যই শাশ্বত ধর্ম্ম ব'লে মানতে হবে।

সেই সব ঋষি-বাক্যই ক্রমে ধর্ম্মশাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার মধ্যে মনুসংহিতা, বিষ্ণু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, দক্ষ, ব্যাস প্রধান। সংহিতা নামে তারা প্রখ্যাত। মোট কুড়িটি সংহিতার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়। ধর্ম্মসূত্রের পর এই সব সংহিতা।

ধর্ম্মসূত্র

প্রাচীন সেই আর্য্যভারতে ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল ধর্ম্মসূত্র। তার মধ্যে আবার গৌতমীয় ধর্ম্মসূত্রই হ'লো প্রধান। বেদের পর বেদাঙ্গ এই গৌতমীয় ধর্ম্মসূত্র। এ সূত্র অপূর্ব্বভাবে রচিত। ভাব নয়, উচ্ছ্বাস নয়, বর্ণনা নয়—বিধি। বীজগণিতের সূত্র বা বিজ্ঞানের যুক্তির মতো সংক্ষিপ্ত আড়ম্বরহীন আপ্তবাক্য। আর তা জীবনের বা সংসারের প্রধান প্রধান কর্ম্ম-কেন্দ্রকে ধরেই রচিত। আর প্রতি কর্ম্মের নামই সেখানে ধর্ম্ম। অতি সংক্ষেপে লিখিত ব্যাকরণের সূত্রের মতো এও এক একটি সূত্র। দু'চারটি উদাহরণ দেখলেই বোঝা যাবে।

আশ্রমধর্ম্ম—"তস্যাশ্রম বিকল্পমেকে ব্রুবতে।" ॥৩—১॥

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্র এটি।

অর্থ—কোন কোন আচার্য্য বলেন, বেদপাঠ শেষ হ'লেই চিরদিনের জন্য যে কোন এক আশ্রম অবলম্বন করা যায়।

"ব্রহ্মচারী গৃহস্থো ভিক্ষুর্বৈখানসঃ।" ॥৩—১॥

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, ভিক্ষু ও বৈখানস এই চার আশ্রম।

এই ভাবেই সূত্র ধরে বলা হয়েছে সব কথা। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ব্রত বলতে এই কথাই বলেছেন—গুরুগৃহে বাস, বেদাধ্যয়ন, অগ্নি-রক্ষা, গুরুসেবা প্রভৃতি। তা ছাড়া জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, ভিক্ষাবলম্বী তো তাকে হতেই হবে এবং সে গুরুর জন্য ও তাঁরই আদেশে।

ভিক্ষু আশ্রম—ভিক্ষু সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁরা সর্বদা সম্পত্তিশূন্য, স্ত্রী-সঙ্গ বর্জ্জিত, উর্দ্ধরেতা, বর্ষায় একস্থানবাসী হবেন এবং তাঁদের ভিক্ষাবৃত্তি হলেও গৃহস্থের আহারের আগেই ভিক্ষা-যাচ্ঞা, করবেন। বিলাস-বাসনা ত্যাগ করবেন তাঁরা। বাক্য, চক্ষু ও কর্ণ সুসংযত করবেন, লজ্জাস্থানে কৌপীন আচ্ছাদন করবেন অথবা সামান্য গৈরিক বসন পরিধান করবেন। বর্ষা ছাড়া অন্য ঋতুতে কোথাও দুই রাত্রির বেশী থাকবেন না—তাঁরা মস্তক মুণ্ডন ক'রে শিখা রাখবেন। আবার বলেছেন—

"বর্জয়েদ্বীজ বধম্॥ সমভূতেষু হিংসানুগ্রহয়োঃ॥ অনারম্ভী॥"

অর্থ—পদক্ষেপ বা অন্যভাবে কোন বীজ বধ অর্থাৎ শস্যবীজকে নষ্ট করবে না। অন্যে তার উপর হিংসাই করুক বা অনুগ্রহই করুক ভিক্ষু হবে সর্ব্বভূতে সমদর্শী। নিজের ভালর জন্যে কোন কাজ সে আরম্ভ করবে না।

ধর্ম্মসূত্রে এমনি এক একটি পৃথক পৃথক বিভাগ রচনা ক'রে গেছেন গৌতম ঋষি।

গৌতম নামটির বুঝি বড়ই সমাদর ছিল তখন। তাছাড়া গৌতম বুদ্ধের প্রদর্শিত ধর্ম্মাবলম্বী বহু ভিক্ষুকে এই সব মত ও পথ অনুসরণ করতে দেখে গেছেন সে যুগে গ্রীক অভিযাত্রীর দল।

সত্যই ধর্ম্মসূত্রে লিখিত এই রীতি-নীতি—এমন কি ভিক্ষু শব্দটি পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণ গ্রহণ করেছেন। শুধু বৌদ্ধগণই বা কেন পাশ্চাত্য দেশেও এই ভিক্ষু নিয়ম তাঁদের বিহারে অনুসৃত হয়েছে। ভারতের প্রাচীন ভিক্ষুধর্ম্ম, বৌদ্ধ ভিক্ষুর মারফৎ পাশ্চাত্যে ছড়িয়েছে—সিরিয়া, গ্রীস বা মিশর পার হয়ে।

বৈখানস—"বৈখানসো বনে মূলফলাশী তপঃশীলঃ ॥৩—২৬॥
"শ্রামণকেনাগ্নিমাধায়" ॥৩—২৭॥
"অগ্রাম্য ভোজী" ॥৩—২৮॥

অর্থাৎ —বৈখানসের পক্ষে নিয়ম হ'লো, বনে ফল মূল আহার করে তপস্যা করবেন। শ্রামণকদিগের পালনীয় নিয়মে অগ্নিতে সকাল সন্ধ্যায় আহুতি দেবেন। গ্রাম-অন্ন গ্রহণ করবেন না।

এই গ্রাম-অন্ন হলো সাতটি— তিল, মাষ, ধান, যব, প্রিয়ঙ্গু, অণু ও গম। এই সব দ্রব্য নাগরীক ও গৃহস্থেরা খায় তাই ও গুলো খাবে না। খাবে আরণ্য-অন্ন। এই আরণ্য-অন্নও সাতটি— বেণু, শ্যামাক, নীবার, জর্ত্তিল, গবেধুকা, মর্কটকা ও গার্মুত। ভুট্টা বা জোয়ার, জনারীর মতো বুনো শস্য হবে সব।

তাঁরা নিষিদ্ধ সঙ্গ ছেড়ে অতিথির সেবা করবেন। নিজেরা কোন পশু বধ করবেন না, অন্যের আক্রমণে নিহত পশু-মাংসে জীবন ধারণ করবেন। লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা জমির ওপর ঘর তুলবেন না। চীর ও পশুচর্ম্ম পরিধান করবেন এবং জটা ধারণ করবেন।

এ প্রথা আজও ভিক্ষুদের মধ্যে দেখা যায়। সব আশ্রমের কথা বলে শেষ পর্য্যন্ত ঋষিরা বিধি দিলেন—গৃহস্থ আশ্রমই উৎপত্তিস্থল। তাই বেদাধ্যয়নের পর সমাবর্ত্তন করে গৃহস্থ আশ্রমে থাকাই শ্রেষ্ঠ।

রাজধর্ম—তারপর শুধু ধর্ম্মের কথা বলেই ঋষি গৌতম নীরব হন নি। রাজা কেমন হবেন তাই বলতে গিয়ে বলেছেন—

"সাধুকারী স্যাৎ সাধুবাদী
সম-প্রজাসু স্যাৎ
হিতং চাসাং কুর্ব্বীত ॥" প্রভৃতি।—১১অঃ॥

সাধুকারী ও সাধুবাদী হবেন রাজা, প্রজাদের প্রতি হবেন তিনি সমদর্শী এবং প্রজাদের তিনি হিতসাধন করবেন। ত্রয়ী বেদে ও আন্বীক্ষিকীতে শিক্ষিত হবেন তিনি—শুচি, জিতেন্দ্রিয় গুণবান সভাসদ থাকবে তাঁর এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া সকলের আসনের উচ্চে তিনি বসবেন।

তিনি বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম রক্ষা করবেন এবং ধর্ম্ম-স্খলিত লোককে স্বধর্ম্মে স্থাপিত করবেন।

রাজা বিদ্যা, সদ্বংশ, বাকপটুতা, রূপ, যথোচিত বয়স এবং শীল-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে করবেন পুরোহিত। এবং তাঁরই উপদেশে ধর্ম্মকার্য্য পালন করবেন, জ্যোতির্ব্বিদদের কথাও গ্রহণ করবেন। গৃহে স্থাপিত গৃহ্যাগ্নিতে শত্রু দমনোপযোগী যজ্ঞ এবং শান্তি, পুণ্যাহ, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পাদন করবেন।

রাজার বিচার-বিধি হবে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, অঙ্গ অর্থাৎ সাময়িক আচার সব কিছুই পুরাণসম্মত হবে। দেশ-ধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম অনুযায়ী বিচার হবে। তবে কৃষক, বণিক, পশুপালক, কুসীদ ও শিল্পজীবিরা পঞ্চায়েত মাধ্যমে নিজেদের বিচার নিষ্পন্ন করতে পারবেন। বিচার-ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গতভাবে তর্ক করা চলবে, তবে প্রমাণ পরস্পর-বিরোধী হলে বৃদ্ধদের পরামর্শ গ্রহণ করা হবে। হয়তো এ যুগের জুরীর মতন ছিলেন তাঁরা। রাজা দুর্দ্দান্তদের নিশ্চয়ই দমন করবেন।

এমনি ক'রে সর্ব্ববিষয়ে গৌতম ধর্ম্মশাস্ত্রে নানা বিধি রচনা করে গেছেন। সংসারে জীবনের পথে প্রয়োজনীয় সেই বিধিগুলি—যুগ পরিবর্ত্তন হলেও প্রায় একই নিয়মে চলছে। বিচার, শাসন ও সমাজপদ্ধতি আজ নবযুগের ভাবে ও ভাষায় যা হোক, সকল বিধিই সে যুগে বর্ণিত হয়েছে। বরং অধিকতর সংযত, সুসজ্জিত ও সুপরিষ্কৃতভাবে তাঁরা বলে গিয়েছেন।

এই ধর্ম্মসূত্রেরই বিশদ আলোচনা করলেন মনু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিরা পরবর্ত্তী যুগের আর্য্যসন্তানের জন্য। সেই ধর্ম্মশাস্ত্র-গুলিই সংহিতা বা স্মৃতিশাস্ত্র। এবারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

বশিষ্ঠ, গৌতম, আপস্তম্ব, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, অত্রি, হারীত, উশনা, অঙ্গিরা, যম, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ণ, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, সাঙ্খ্য, দক্ষ, শতাতপ প্রভৃতি ঋষিরাই সে সব ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করেছেন। যাকে আমরা আজ স্মৃতির বিধান বলে মানি।

শাস্ত্র ও সংহিতা

ধর্মসূত্র ও ধর্মসংহিতা ঃ

সেই সে প্রাচীন যুগে বৈদিক ভারতে বেদই ছিল আর্য্যগণের একমাত্র সম্পদ ও সম্বল। বেদ ও উপনিষদ তাই তাদের চলার পথে একমাত্র পাথেয় ছিল। এই বেদ কারও রচিত নয়—সংগৃহীত সংহিতা তা, লোকমুখে প্রচারিত। আর তারই নানা অংশ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ রূপে বিভক্ত। এসব আলোচনা আমরা প্রথম খণ্ডে করেছি।

ধর্ম্মসূত্র হ'লো বেদ থেকে রচিত। যজ্ঞের জন্যে শ্রৌতসূত্র, গৃহীর জন্যে গৃহ্যসূত্র আর পারিবারিক ও সামাজিক ধর্ম্মের জন্যে কর্ম্মকাণ্ডের বিশদ নিয়মাবলী যাতে নিবদ্ধ তাই ধর্ম্মসূত্র।

এই নিয়ে কেটে গেল যুগের পর যুগ। ধর্ম্মসূত্রের মধ্যে সমাজ, শাসন, রাজনীতি, স্ত্রীধর্ম্ম, সংসারধর্ম্ম, শিক্ষা, দীক্ষা সবই আছে এবং তা বৈদিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বেদকেই মুখ্য ক'রে গাঁথা হলো। কঠোর সংযমে এই বেদোক্ত বিধিকে তারা অনুসরণ ক'রে চললো। যুগধর্ম্মে তারও পরিবর্ত্তন হ'লো—গৃহ্যসূত্রে তার আভাস পাওয়া গেল।

বেদে ছিল শুধু আগুন আর আহুতির কথা। শ্রৌতসূত্র তাকে। নানাভাবে সাজাল যজ্ঞ প্রভৃতির আয়োজন ক'রে। গৃহ্যসূত্রে এলো দেবতার পাশে পিতৃলোক, ইন্দ্র চন্দ্রের পাশে গ্রহ নক্ষত্র—এলো যজ্ঞের কাজে হোতা, এলো ব্রাহ্মণ, মণ্ডল, চিতি পত্রিকা আর শস্য।

ধর্ম্মসূত্রকে গাঁথা হ'লো মানুষের রীতি ও নীতি নিয়ে। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের পুরোণো কাঠাম গেলো ভেঙ্গে। এলো হিন্দুর মধ্যে নানা শাখা—বৌদ্ধ, জৈন—এলো বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব। বদলে গেলো

উপকরণ আর উপচার, বদলে গেলো নিয়ম সাধন। এমনি ক'রে এক একদল এক এক যুগে ধর্ম্মশাস্ত্র বা ধর্ম্মসংহিতা রচনা ক'রে গিয়েছেন। ধর্ম্ম সূত্র ছিল গদ্যে সূত্রের মতন সংক্ষিপ্ত কথা। ধর্ম্মসংহিতা তাকেই সাজাল পদ্যে—রঙে রসে রূপে নব নব পরিকল্পনা নিয়ে। এরই ফলে এলো প্রতিমা ,এলো দেব-দেবীর পূজা উৎসব।

ধর্ম্মসূত্রের যুগে এক একখানি বেদের পৃথক পৃথক ধর্ম্মসূত্র ছিল। কারণ বেদই প্রধান, তাই তিনটি বেদের তিনটি শাখা ধ'রে তিনটি ধর্ম্মসূত্র গ্রথিত হয়েছিল। সামবেদীর জন্য গৌতমীয় ধর্ম্মসূত্র, ঋগ্বেদীয়ের জন্য বাশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র এবং যজুর্ব্বেদীয়ের জন্য আপস্তম্ব ধর্ম্ম-সূত্রের প্রবর্ত্তন। এ নিয়ে, অনেক কথা আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলেছি।

কিন্তু তারপর যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বেদ-বিভাগের নীতি যেন সঙ্কুচিত হ'লো। রীতি ও নীতিকে তাঁরা পৃথক ক'রে রাখতে চাইলেন না। সব রীতি নীতিকে এক ক'রে নূতন সংহিতা রচিত হ'লো।

এই সংহিতাগুলির মধ্যে আমরা কুড়িখানির পরিচয় পাই। বেশ বোঝা যায়, যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আচার-বিচার, রীতি-নীতিকেই অনুসরণ ক'রে এগুলি রচিত হয়েছে। পরবর্ত্তী যুগে রচিত হ'লেও, রচয়িতা হিসেবে তাঁরা নিজের নাম কোথাও উল্লেখ করেন নি, বরং প্রাচীন ঋষিদের নাম এই গ্রন্থগুলিতে সংযুক্ত ক'রে তাঁদেরই গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। এতে ক্ষতি কিছুই হয় নি বরং পরবর্ত্তী যুগকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এই লেখার মধ্যে।

এমনি ক'রে যে কুড়িখানা সংহিতা রচিত হ'লো তার মধ্যে প্রথম তিনখানি প্রথম যুগের গ্রন্থ—গৌতম, বাশিষ্ঠ ও আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র। চতুর্থ সংহিতাই হ'লো পরবর্ত্তী যুগের প্রধান ও প্রথম সংহিতা—মনুসংহিতা। বেদের বাঁধা-ধরা পথ ছেড়ে, ধর্ম্মসূত্রের নির্দ্দিষ্ট মত ত্যাগ ক'রে এই প্রথম পা বাড়াল নতুন পথে—তাই মনুসংহিতা হলো অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংহিতা।

মনুসংহিতা—মনু আমাদের বংশের আদি পুরুষ—এই ধারণা করেই আমরা আমাদের মানব ব'লে পরিচয় দিই। শতপথ ব্রাহ্মণেও তার উল্লেখ আছে।

মনু যদি স্বয়ং এই সংহিতাকার হন তবে গৌতম, বশিষ্ঠ, আপস্তম্ব প্রভৃতির ধর্ম্মসূত্র আসে কি ক'রে? তাছাড়া মনুসংহিতার মধ্যে যবন, শক, কম্বোজ, চীন—এসব নামই বা এলো কেন, আর কি কারণেই বা বৌদ্ধদের কথা এতে উল্লেখ আছে?

শুনতে তেমন ভাল না লাগলেও, একথা স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের আদি পুরুষ মনুর লেখা এ সংহিতা নয়। তবে অনেক মনুই তো আছেন—হয়তো পরবর্ত্তীকালে কোন মনু নামধারী ব্যক্তিই এই সংহিতাখানির সংকলন করেছেন। মনুসংহিতা'হলো প্রাচীন—এমন কি পরবর্ত্তীযুগের যেসব সংহিতা, তার আদি সংহিতাও বটে। কারণ ধর্ম্মসূত্র যেমন বেদকে অনুসরণ ক'রে কোন মূর্ত্তির উল্লেখ করে নি, প্রথম যে ধর্ম্মসংহিতা তাতেও ত্রিমূর্ত্তির কোন উল্লেখ নেই। প্রতিমা পূজার কোন বিধিও তেমন কিছু দেখা যায় না এ মনুসংহিতায়।

তাই অনেকে মনে করেন, গৌতম, বাশিষ্ঠ বা আপস্তম্বের ধর্ম্ম-সূত্রের মতো মনু রচিত মানব-ধর্ম্মসূত্র নামে কোন ধর্ম্মসূত্র নিশ্চয়ই ছিল। কারণ গৌতম বাশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রাদিতেও মানব-ধর্ম্মসূত্রের উল্লেখ আছে। হয়তো সেই মানব-ধর্ম্মসূত্র আজ অপ্রাপ্য হলেও সে যুগে একেবারে দুষ্প্রাপ্য ছিল না।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা—এ সংহিতাটি প্রাচীন হলেও যাজ্ঞবল্ক্য নামটি কিন্তু অতি প্রাচীন। নাম দেখে মনে হয়, জনক রাজার পুরোহিত শুক্ল যজুর্ব্বেদের সংকলনকর্ত্তাই যেন যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার রচয়িতা। কিন্তু এ সংহিতাতেও বৌদ্ধ-ভিক্ষু ভিক্ষুণীর কথা আছে। সুতরাং মনে হয় এ গ্রন্থও বৌদ্ধযুগের পরে লেখা। গ্রীকদের ভারত প্রবেশের পর যখন রাজা অশোক ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে যত্নশীল—সারা ভারতে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের বন্যা দেখা দিয়েছে তখন

বৈদিক-অনুষ্ঠান-প্রিয়, বেদ বিশ্বাসী প্রতিভাধর ব্যক্তিরাই এই সব সংহিতা রচনা ক'রে থাকবেন।

বিষ্ণু সংহিতা—বিষ্ণু সংহিতায় আছে সতীদাহের কথা, ম্লেচ্ছদের কথা, তীর্থ-মাহাত্ম্যর কথা। যোগ শাস্ত্রের পাশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার। বিষ্ণু তখন অবতার-মূর্ত্তিতে, গ্রন্থে সেই কল্পনাই দেখি।

অন্যান্য সংহিতা—এর পরেই আমরা পাই আরও চোদ্দখানা সংহিতা—অত্রি, হারীত, উশনা, অঙ্গিরা, যম, সম্ব, কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি—পরাশর, ব্যাস ও দক্ষ শাতাতপ—এগুলি আরও পরে রচিত হয়েছে বলে মনে হয়। তবে নামগুলি প্রাচীন। এ যুগেও এমনি কত রচয়িতার নাম দেখা যায় বিভিন্ন পত্রিকায় বা পুস্তিকায়—ভানুসিংহ, পরশুরাম, চার্ব্বাক, যাযাবর, অবধূত প্রভৃতি।

উশনা সংহিতায় সতীদাহ, অঙ্গিরা সংহিতায় নীলচাষ, কাত্যায়ণে গণেশ, গৌরী, পদ্মা, শচী, সাবিত্রী, জয়া-বিজয়া প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজার কথা—এমন কি হারীত সংহিতায় বিষ্ণুর নাভি-কমল থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তির কথাও আছে। এতে এই প্রমাণ হয়—তাঁরা বেদের মূল কথা এবং নীতি থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। এই সব সংহিতাগুলি পড়লে বেশ বোঝা যায় কোন্ যুগে কোন্ দলের বা মতের প্রাধান্য। যুগধর্ম্মী সমাজ, তার পারিপার্শ্বিক আচার অনুষ্ঠানের কথাও আমরা জানতে পারি এই সংহিতাগুলির মাধ্যমে। দু'একটি সংহিতার কথা অনুবাদ করলেই আমরা সেকথা বুঝতে পারব।

মনুসংহিতা

প্রথমেই ধরা যাক মনুসংহিতা—বারটি অধ্যায়ে এই সংহিতা বিভক্ত। সৃষ্টি, সংস্কার, বিবাহ, গৃহস্থের নিয়ম, অশৌচ, বানপ্রস্থ, রাজধর্ম্ম, ব্যবহার দর্শন (বিচারালয়ের কাজ) দাম্পত্য ধর্ম্ম, দায়ভাগ, সঙ্করজাতির বিবরণ, প্রায়শ্চিত্ত এবং জন্মান্তর প্রাপ্তি। প্রায় সামাজিক সবকিছুই এতে সুন্দর ভাবে গুছিয়ে রাখা হয়েছে।

সৃষ্টি—প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশের প্রথম শ্লোকে মনুসংহিতার প্রশ্ন হল মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক ভগবান মনুর নিকট এই চাতুর্বর্ণ, জীব ও সৃষ্টির বিষয়। ভগবান মনু উত্তর দিলেন—

যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে।

যিনি সব সৃষ্টবস্তুর কারণ স্বরূপ, যিনি নিরাকার, নিত্য সৎ ও অসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য, সেই পরম ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট পুরুষ জগতে ব্রহ্মা বলেই প্রসিদ্ধ। (ব্রহ্মা এখানে সৃষ্টিকর্ত্তা নন—ব্রহ্ম ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা)।

তারপরই আছে—ব্রহ্মশক্তি-সম্পন্ন ব্রহ্ম পরমাত্মা থেকে সদসৎ-স্বরূপ মন সৃষ্টি করলেন। আর মন থেকেই সৃষ্ট হল অসীমশক্তি-সম্পন্ন অভিমানজনক 'অহঙ্কার।'

অহং ইত্যাকার জ্ঞান এলো মন থেকে—এখানে মনকে Perception Consciousness বলা যেতে পারে। তারপর তিনি মহৎ আত্মা সত্ত্ব রজ তম তিনটি গুণময় শব্দকে বোঝাবার জন্যে পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি করলেন। এইভাবে অবয়ব, পঞ্চভূত, জীব সৃষ্টির কথা আছে সৃষ্টি-অধ্যায়ে।

বর্ণভেদ—তারপর দেখি দেশ-বিভাগের কথা ও বর্ণভেদের কথা। প্রথমে আর্য্যদের জন্য স্থান নির্দ্দেশ হলো—সরস্বতী দৃষদ্বতির মধ্যস্থল-ভূমি। নাম হলো ব্রহ্মাবর্ত্ত। ক্রমে লোক বাড়লো—সীমানা বাড়লো, তখন নাম হলো ব্রহ্মর্ষিদেশ। যখন আরও লোক বাড়লো তখন স্থানের প্রয়োজন হলো—গড়ে উঠলো মধ্যদেশ। এমনি করে যখন বহুলোকে পূর্ণ হয়ে উঠলো দেশ তখন মনু সীমানা দিলেন ছড়িয়ে, বললেন—

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ।

তিনি আরও সীমানা বাড়ালেন—

কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞীয়ো দেশো ম্লেচ্ছ-দেশস্ততঃপরঃ।

পূর্ব্বে সমুদ্র, পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য এই আর্য্যাবর্ত্ত। তারপর কৃষ্ণসার মৃগ যেখানে বিচরণ করে সেই ভূমি যজ্ঞীয় ভূমি—অন্য দেশ ম্লেচ্ছ দেশ।

এমনি ক'রে তাঁরা করলেন ম্লেচ্ছ বিচার। আর বর্ণ-বিভাগে আছে দ্বিজদের কর্ত্তব্য, সংস্কার, বিচার নিয়মাদির কথা।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম—তারপর দেখি ব্রহ্মচর্য্য ও ইন্দ্রিয় সংযমের নিয়ম। জ্ঞানলাভ ও গুরুভক্তি—

ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ।

চুল পাকলেই বুড়ো হয় না। যুবা বয়সে জ্ঞানী হলেই দেবতারা তাকে বৃদ্ধ বলেন। তেমনি নামে ব্রাহ্মণ হলেই ব্রাহ্মণ হয় না, সেকথা বলে গেলেন মনু ব্রাহ্মণদের স্বার্থবুদ্ধি ভাঙতে—

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি।

এই ভাবেই শাসনকার্য্য, করস্থাপন, যুদ্ধেরনিয়ম, বিচার, সাক্ষ্য, ঋণ, গোচারণ, কৃষিবিধি প্রভৃতির বিষয় নিয়ে মনুসংহিতা সবিস্তারে এমন সব কথা বলে গেলো, যা আজকের রাজ-বিধানের নানা সংস্কার ও বিধি-ব্যবস্থা দেখে স্বতঃই মনে জাগে।

এ ছাড়া কন্যাদান, বিবাহ, পুত্রোৎপত্তি, দ্বাদশ প্রকারের পুত্র এবং পুত্রগণের মধ্যে পৈত্রিক ধনবিভাগ, স্ত্রীধন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মনুসংহিতা আলোচনা করে গেছে। আর করেছে জাতিতত্ত্ব নিয়ে নানা আলোচনা—হিন্দু ও ম্লেচ্ছজাতি শুধু নয়, ভিন্ন দেশবাসী জাতির কথাও মনুসংহিতায় আছে।

যত বিধি আর বিধান, আচার ও সংস্কার তা যদি কেউ না করে বা যা করতে না পারে, তবে—তার জন্যে অনুতপ্ত হয়ে যে ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করে নিজ অক্ষমতা বা অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারে, তারও ব্যবস্থা দিয়েছে মনুসংহিতা। আর শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বশেষ অধ্যায়ে

তিনি প্রতি জীবের চরম লক্ষ্য সেই পরব্রহ্মের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, সর্ব্বজীবে পরমাত্মাকে আত্মাদ্বারা দর্শন করাই ব্রহ্মদর্শন।

এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা
স সর্ব্ব সমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্।

এই ভাবে প্রতি সংহিতার এক আধটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত উদাহরণ নিয়ে আমাদের বিরাট সংহিতা পর্ব্বের একটা ধারণা করতে হবে।

বিষ্ণু সংহিতা

মনুসংহিতার পরবর্ত্তীকালে বিষ্ণুসংহিতা রচিত হয়। বিষ্ণু এ সংহিতা লেখেননি—হয়তো যাঁর লেখা তাঁর নামও বিষ্ণু ঋষি নয়। মনে হয় বিষ্ণু বিষয়ক কথার প্রাধান্য দিয়ে বা গ্রন্থকে নামগৌরবে গরীয়ান করতেই এর নামকরণ হয়েছে বিষ্ণুসংহিতা।

মনুসংহিতার পর যে সব সংহিতা লেখা হয়েছে তাতে প্রায় সব একই বিষয়ের আলোচনা আছে, তবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে।

লেখ্যপত্র—বিচার বা ঋণ বিভাগে মনু যা বলেছেন, বিষ্ণুসংহিতা তারই সবিস্তার বর্ণনা করেছে। লেখ্যপত্র বা দলিল লেখা তারই এক অংশ। সে সংহিতায় দলিল তিন রকমের কথা বলা হয়েছে। রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক, অসাক্ষিক।

রাজার বিচারালয়ে যে দলিল স্বাক্ষরিত হয় তাকে বলা হয় রাজসাক্ষিক, পাঁচজনের সামনে যে দলিল লেখা হয় সে হলো সসাক্ষিক আর নিজে নিজে যে দলিল লেখা হয় তাই অসাক্ষিক।

"অথ লেখ্যং ত্রিবিধম্—রাজসাক্ষিকং, সসাক্ষিকং, অসাক্ষিকঞ্চ।"

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা

এ সংহিতাতেও প্রায় এই সব কথাই আছে, অধিকন্তু তাতে যৌথ ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

পরাশর সংহিতা

পরাশর সংহিতার বৈশিষ্ট্য হলো—এতে পরিষদের কথা অর্থাৎ বর্ত্তমান এসেম্ব্লির বিষয় বলা হয়েছে।

অনাহিতাগ্নয়ো যেঽন্যে বেদ বেদাঙ্গ পারগাঃ।
পঞ্চ ত্রয়ো বা ধর্ম্মজ্ঞাঃ পরিষৎ সা প্রকীর্ত্তিতা।

বেদ-বেদাঙ্গ পারগ অথচ আহিতাগ্নি নন অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যা হোম-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন না, সেই রকম ধর্ম্মজ্ঞ পাঁচ বা তিন জনকে নিয়ে হয় পরিষদ্। এখানে বেদবেদাঙ্গ জানা মানে পুরুত বা পণ্ডিত-মশাই নন—বেদ আর বেদাঙ্গর ধারা ধরেই তো শ্রুতি স্মৃতি—সেই স্মৃতি বা সংহিতার মধ্যেই তো সব বিচারের আইন। মনু-সংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতি সব শাস্ত্রেই তো বেদজ্ঞের অধিকার। এই বেদজ্ঞদেরই কথা বলেছেন সংহিতা। তিনবেলা সন্ধ্যা, যজ্ঞ নিয়ে কাটালে চলবে না—বিচার বা শাসন-ব্যবস্থার জন্যে তাঁদের অবসর থাকা চাই। সেই প্রতিষ্ঠান থেকেই পরিষদের সৃষ্টি।

সংহিতাকার বলে গেলেন,

চত্বারো বা ত্রয়ো বাপি যদ্‌ব্রূয়ুর্ব্বেদ পারগাঃ
স ধর্ম্ম ইতি বিজ্ঞেয়ো নেতরৈস্তু সহস্রশঃ।

অর্থ—চারজন কি তিনজন বেদজ্ঞ যা বলবেন তাই ধর্ম্ম সম্মত, অন্য হাজার লোকের কথা ধর্ম্ম-সম্মত নয়।

দক্ষ ও ব্যাস সংহিতা

দক্ষ সংহিতায় অন্যান্য বিষয়েরমধ্যে নিত্যকর্ত্তব্য ও পুরুষের ধর্ম্মাদি বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আর ব্যাস সংহিতায় নারীর নিত্য কর্ম্ম প্রভৃতির আলোচনা আছে।

এক সংহিতায় সব কথা সবিস্তারে বলা সম্ভব নয়, তাই সব সংহিতা মিলে বিভিন্ন আলোচনা করা হয়েছে। এক কথায় এদের বলা হয় স্মৃতিশাস্ত্র। এরই বিধান নিয়ে আজও আমাদের সমাজ চলে আসছে। তবে সে যুগে সমাজের যে বিধান ছিল, যুগের পরি-বর্ত্তনে তা বদ্‌লে গেছে। এ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন যুগের নিয়মগুলি সব দিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ। কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক সকল বিধানই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের এই

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে তার বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়, তবে যে গুলির কথা বললে চলে—যেমন সামাজিক আচার-বিচার, আইন-কানুন, শিল্প, কৃষ্টি প্রভৃতির কথা আমরা পরবর্ত্তী সামাজিক প্রসঙ্গে বলবো।

তবে তার আগে যুগের হাওয়া ধরে সেই সব নিয়ম-কানুন বা চিন্তাধারায় এল যেসব তর্ক-বিতর্ক এবং বিচার-বিশ্লেষণ আমরা তারই কথা আগে বলে নেবো। মানুষের মনের গতি কোনপথ ধরে এগিয়ে চল্‌লো, আর কি চিন্তায় তারা হ'লো প্রভাবান্বিত তাই দেখবো।

এতো আজকের কথা নয়—হাজার হাজার বছর আগে, যখন আজকের সুসভ্যজাতি, ঐ পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীরা গায়ে উল্কি এঁকে কাঁচা মাংস খেতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং তাদের চলার পথকে কি ক'রে সুসংস্কৃত করা যায় তার চেষ্টা করছিলেন, তার অনেক আগে ভারতের মাটিতে দেবভাষার মাধ্যমে বেদ-উপনিষদের সূত্র ধরে এই দর্শনের প্রশ্ন উঠেছিল। সমস্ত জগত যখন অশিক্ষিত ও বর্ব্বরতার যুগ কাটিয়ে উঠতে পারেননি তখনই এদেশে সেই বিরাট প্রশ্ন উঠলো—যে প্রশ্নের মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো প্রাচীনতম যুগের মনীষা ও তার বুদ্ধি-দীপ্ত গৌরবের কথা। যেদিন সেমিটিক পণ্ডিতরা ক্যানাডিয়া ফিনিসিয়া, ব্যাবিলন ও পারস্যবাসীদের নিকট গিয়ে জগত-সৃষ্টির বিস্ময়কর উপকথা সব শুনে স্তম্ভিত হলো, সেদিন তো তারা জানেনি কোন্ সুদূরে সাগরপারে নৈমিষারণ্যের নিভৃত অঞ্চলে বা মিথিলার রাজসভায় উপকথা নয়, ব্রহ্ম-কথা নিয়ে গড়ে উঠেছিল উপনিষদ ও বেদান্ত-দর্শন।

আর তা' শুধু অরণ্যবাসীদের জন্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—এরই সাহায্যে গড়ে উঠেছে সমাজ, নগর ও গ্রাম। যদিও বিভিন্ন সমাজের লোক বিভিন্ন মত ও পথ ধরে চলেছিল, কিন্তু আদর্শ ছিলো 'ঐ দর্শন'।

মানুষের কল্যাণে সেদিন মুনি-ঋষিরা যা দর্শন করেছিলেন আমরা সেই দর্শন বা বেদান্তসারের পরিচয়ই দেবো আগে।

দর্শন ও দ্রষ্টা

দর্শন কি ?

এক কথায় কি এর উত্তর দেওয়া যায় ? এর উত্তর দিতে গিয়ে কত না ব্রহ্মর্ষি আর মহর্ষি, কত না প্রতিভাধর ব্রহ্মজ্ঞ, উপনিষদ্ ও বেদের সূত্র ধরে বিচার করেছেন দিনের পর দিন—কত না গ্রন্থের পর গ্রন্থ, দর্শনের পর দর্শন, বেদান্ত আর ন্যায় মীমাংসা দেখা দিয়েছে এই আর্য্যভারতে।

চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে উঠলো মত ও পথের কথা। প্রশ্ন উঠলো তাঁদের মনে—কি ক'রে জগত সৃষ্টি হ'লো এবং কোন্ সেই পথ ? এই জানার প্রশ্ন থেকেই উঠলো মনে—কি ক'রে সেই অজ্ঞেয় শক্তিকে জানা যায় ?

বিদেহরাজ জনকের রাজসভায় ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও অন্যান্য বহু মুনি-ঋষিরা এসে প্রশ্ন করলেন যাজ্ঞবল্ক্যকে—

"যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্ব্বং মৃত্যোরন্নং কা স্বিৎ সা দেবতা যস্যা মৃত্যুরন্নমিতি—"

"যখন মরণ সবই গ্রাস করে তখন মরণকে কে করে গ্রাস ?"

অন্য প্রশ্ন হ'লো "মানুষের মাঝে কি সে এমন নিত্য জিনিস যা দেহের সব অংশ শেষ হলেও শেষ হয় না।"

প্রশ্ন করলেন—"দেহ ত্যাগের পর প্রাণশক্তির কি পরিণাম ?"

"আত্মার স্বরূপ কি ?"

"জীবের স্বরূপ কি ?"

"সব বস্তুই যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আবার যা সব বস্তু থেকেই নির্লিপ্ত তা কি ?"

প্রশ্ন করলেন—"দেহত্যাগের পর প্রাণশক্তির কি পরিণাম ?"

"আত্মার স্বরূপ কি ?"

"জীবের স্বরূপ কি ?"

"সব বস্তুই যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আবার যা সব বস্তু থেকেই নির্লিপ্ত তা কি ?"

এমনি কত প্রশ্নই না করলেন মুনি-ঋষিরা।

পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—বলতে পার, অনেকে যে বলেন শূন্য থেকে এই জগতের উৎপত্তি তা কি সত্য ? অবস্তু থেকে বস্তুর উৎপত্তি কি সম্ভব ?

কি উদ্দেশ্যে এ প্রশ্ন পিতা সেদিন করেছিলেন জানি না, কিন্তু ইহুদিরা এ বিশ্বাস পোষণ করতো যে শূন্য থেকে হঠাৎ একদিন এই জগতটা ছিট্‌কে লাফিয়ে উঠেছিলো।

ইহুদিরা একথা সেদিন প্রচার করলেও, আজকে সভ্য পাশ্চাত্ত্য জাতিরা জেনেছে সেকথা ভুল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও তারা জেনেছে—এ ভুল বহু আগে আর্য্যভারত প্রচার করেছে। এমন কি প্লেটো, বার্কলে, হিউম, হেকেল, হার্ব্বার্ট স্পেনসার স্পাইনোজা প্রভৃতি দার্শনিকগণের জন্মের বহু আগে—প্রায় ৫০০০ বছর আগে আর্য্যভারত উত্তর দিয়ে গিয়েছেন, কি ক'রে বিশ্বের উৎপত্তি, কি তার কারণ, জীবাত্মার উদ্ভব, জন্ম-মৃত্যু সমস্যা প্রভৃতির। ভারতে এই আলোচনা যখন পূর্ণোদ্যমে চলেছে তখন পৃথিবীর অন্য সব দেশ অসভ্য ছিল।

আজকাল অনেকেই ভারতীয় দর্শনকে উপেক্ষা ক'রে পাশ্চাত্ত্য দর্শনকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন কিন্তু ওদের দেশের বড় বড় পণ্ডিতরাই বলেছেন—ভারতীয় দর্শনের কাছে পাশ্চাত্ত্য দর্শন ঋণী। ফরাসী দার্শনিক ভিক্তর কুঁজা বলেছেন—"ভারতবর্ষের কাব্য ও দর্শন সম্বন্ধীয় যে সমস্ত গৌরবময় অমর রচনাবলী বর্ত্তমানে ইউরোপে ক্রমশঃই প্রচারিত হইতেছে সে সকল পাঠ করিলে আমরা তাহাদের মধ্যে

এমন গভীর ও মহান সত্যসকল দেখিতে পাই যে ইউরোপীয় প্রতিভা-প্রসূত রচনা সমূহও তাহাদের তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং তুলনা করিয়া দেখা যায়, এইসব লেখা ভারতীয় মনীষিদের রচনা পদ্ধতির সহিত অগ্রসর হইতে পারে নাই।"

তিনি আরও বলেছেন—"সর্ব্ববিধ দর্শন শাস্ত্রের ও ইতিহাসের সারমর্ম্ম ভারতেই বর্ত্তমান।"

স্যার মনিয়ার উইলিয়ামও লিখে গেছেন—"স্পাইনোজার জন্মগ্রহণের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ও ডারুইনের বহু শতাব্দী আগে ইঁহাদের মতবাদ হিন্দুদের পরিচিত ছিল। যে কোন দেশের যে কোন ভাষায় জগতের ক্রমিক অভিব্যক্তি বা evolution শব্দটি উদ্ভাবিত হইবার বহু পূর্ব্বে এবং আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা স্বীকৃত ও সমর্থিত হইবার অনেক আগেই হিন্দু মনীবিগণ অভিব্যক্তি-বাদের দার্শনিক-তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন।"

জন ডেভিসও বলেছেন—"কপিলের সাংখ্যই জগতের প্রথম দর্শনশাস্ত্র।"

এসব কথা জেনেও যাঁরা ভারতের দর্শনকে উপেক্ষা করেন, তাঁরা মোহবশেই করেন—সুতরাং তাঁদের কথা আলোচনা না করাই ভাল।

অধ্যাপক হপ্‌কিন্সও বলেছেন—"ভারতের সাংখ্যদর্শন যেমন আত্মা ও জ্যোতিকে এক স্বীকার করিয়াছেন, গ্রীক দার্শনিকগণও তেমনি আত্মা ও জ্যোতির একত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এ ধারণা গ্রীকেরা ভারতবর্ষ হইতেই পাইয়াছিলেন। সাংখ্য-দর্শনের সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণই পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানযোগিদের Three classes রূপে ভাষান্তরিত।"

বলেছেন—"প্লেটো ও তাঁহার শিষ্যগণ কথিত দার্শনিক মতসকল কিংবা খৃষ্টান জ্ঞানযোগ প্রকৃতপক্ষে ভারতেরই উদ্ভাবিত বস্তু।"

সত্যকে এমনি করেই তাঁরা স্বীকার করেছেন চিরকাল। তাই তাঁরা অকপটে বলতে পেরেছেন—"মানব সভ্যতার এবং উচ্চশ্রেণীর

দর্শনশাস্ত্রের জন্মভূমি বলিয়া প্রাচ্যদেশের নিকট শ্রদ্ধার সহিত মাথা নত করি।”

জানবার আকাঙ্ক্ষায় ভারত সেই প্রাচীন যুগ থেকেই তপস্যা ক'রে আসছে। যার ফলে এত বড় দর্শনশাস্ত্র গ'ড়ে উঠেছে। এই চাওয়াই হ'লো দর্শনের মূল কথা।

সাধারণভাবে আমরা জানি দর্শন মানে দেখা। দেখে মানুষ চোখে—বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে কিন্তু দৃষ্টির অতীত যা তা দেখতে পারে চক্ষুর অতীত যে মন বা প্রজ্ঞা তাই দিয়ে। চোখের দৃষ্টির ভুল হয় কিন্তু প্রজ্ঞা দ্বারা যা দেখা যায় তার ভুল নেই। যেমন একটি সাপকে আমরা চোখ দিয়ে দেখি, আবার একটি দড়িও দেখি চোখ দিয়ে। কিন্তু অন্ধকারে দেখা জিনিস—দড়িটাকে দেখেও ভুল ভাবতে পারি—ভাবতে পারি ওটা সাপ। অতএব চোখের দেখাই যে সত্য, তা নাও হতে পারে।

আবার হয়তো দেখলাম দূরে ধোঁয়া উঠছে। এই ধূম দেখে অনুমান করতে পারি আগুন আছে। সেখানে দেখছি কিন্তু আমরা মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, প্রজ্ঞা দিয়ে। কিন্তু এ অনুমান হয়তো ঠিক নাও হতে পারে। আসলে ওটা ধোঁয়া নয় গ্যাস। এ গ্যাস রাসায়নিক সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। তখন আমাদের বুঝতে হবে, ধোঁয়া কেমন, তার রং কেমন, কেমন তার গতি। এই যে বোঝা বা দর্শন—প্রজ্ঞা বা মন দ্বারা সম্পন্ন হয়।

এমনি করেই তাঁরা একদিন দেখেছিলেন বিশ্বকে। কি ভাবে এর সৃষ্টি, এর কারণ তত্ত্ব এবং কি এর পরিণাম। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যমান এই জগতের স্তর ভেদ ক'রে ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষি সেদিন যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাই দর্শন। এই দর্শনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যমান জগতের কথাও যেমন আছে, তেমনি আছে অতীন্দ্রিয় পারমার্থিক সত্তা নিয়ে আলোচনা। তাঁরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন তাই যুক্তির দ্বারা তর্কের দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাই দর্শনের

অপর নাম তর্কশাস্ত্র। বেদ ও উপনিষদের পর এই তর্ক-শাস্ত্র যখন আপন তর্ক-জালে পথ হারিয়ে ফেলছিলো তখনই এলো বেদান্ত-দর্শন প্রজ্ঞার আলোক-বর্ত্তিকা হাতে নিয়ে। জগত সেই আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকও যখন পরিদৃশ্যমান জগতের স্বরূপসত্তা (thing-in-itself of the objective Reality) ও অতীন্দ্রিয় পারমার্থিক সত্তা (thing-in-itself of the subjective যে স্বরূপতঃ এক তা প্রমাণ করতে পারলেন না—পাশ্চাত্ত্য কোন দর্শন যখন বাক্য ও মনের অতীত কোন বস্তুর নির্দ্দেশ দিতে পারলেন না তখন দেখি এই বেদান্ত-দর্শনই পরিদৃশ্যমান স্বরূপ-সত্তা ও পারমার্থিক সত্তা যে স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন তা প্রমাণ ক'রে দিলেন; প্রমাণ করেছেন পরমাত্মাকে—'অবাঙ্মনস গোচরম্' রূপে।

এই জন্যই মোক্ষমুলার বলেছিলেন, "পৃথিবীর যাবতীয় দর্শনের তুলনায় বেদান্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে বেদান্তের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় নাই এমন কোন দর্শন নাই।"

বেদান্ত যে অদ্বৈতশক্তিকে দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীত জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়র সম্বন্ধ রহিত এক সচ্চিদানন্দের অক্ষয় উৎসরূপ, এক অনাদি অনন্ত সত্তা বলে গেছেন সেই অচিন্ত্য ও অবিকারী চিৎ-সত্তাকেই প্লেটো বললেন, পরমমঙ্গল (good), শোপেনহায়ার বললেন, অসীমশক্তি, স্পাইনেজো বললেন, জগতের মূলসত্তা (substantial)।

এমনি দেখি, কাণ্টের স্বরূপসত্তা, (thing-in-itself) এমার্সনের পরমাত্মা, হার্ব্বার্ট স্পেনসারের অজ্ঞেয়তত্ত্ব—সবই ঐ অবাঙ্মনস গোচরের পরম শক্তির অজ্ঞেয়রূপ। খৃষ্টানের 'স্বর্গের পিতা' তিনি, মুসলমানের 'আল্লা' তিনি। এই ব্রহ্মসত্তা বিশ্বচরাচরে সর্ব্বত্র ওত-প্রোতভাবে জড়িত। এ মীমাংসারই সমাধান করেছে বেদান্ত।

বেদ ও উপনিষদের পরও বেদান্ত-দর্শনের প্রয়োজন হলো এই কারণে। তাই প্রয়োজন বেদান্ত-দর্শনের আগে ষড় দর্শনের কথা।

এই ষড়্দর্শনের পর আরও দুটি দর্শন ভারতে দেখা দিয়েছে— একটি হলো জৈন দর্শন, অপরটি বৌদ্ধ দর্শন। আর্য্যরা ষড়্দর্শনকে বলেছেন আস্তিক দর্শন, আর জৈন দর্শনকে নাস্তিক দর্শন বলেছেন। এমন কি চার্ব্বাক দর্শনকেও তাঁরা নাস্তিক দর্শন

ষড়্দর্শন

ন্যায়দর্শন

দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে কপিলের সাংখ্যদর্শনকেই সকলে প্রাচীনতম বললেও, 'দর্শন' বা দেখা অর্থাৎ বোঝার জন্য যে বিচার, যে তর্ক, যে যুক্তি তার প্রাবল্য দেখা যায় ন্যায়দর্শনে। সম্ভবতঃ তাই ন্যায়দর্শন লোক-সমাজে বেশী আদৃত ও পরিচিত হয়ে পড়ে। বিচার এবং তর্কের আধিক্য থাকায় ন্যায়শাস্ত্রকে অনেকেই তর্কশাস্ত্র বলে থাকেন। এই তর্কশাস্ত্র বঙ্গদেশে ও মিথিলায় বিশেষরূপে আধিপত্য করেছে।

ন্যায়দর্শনের রচয়িতা গৌতম। ইনি কে এবং কবেকার এ নিয়ে অনেক তর্ক আছে। তার ওপর স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা গৌতম-গোত্র প্রমুখ গৌতম ও দর্শনকার গৌতম কি একই ব্যক্তি?

অনেকেই মনে করেন ইনি একই লোক। কারণ গৌতম প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে ন্যায়, যুক্তি বা বাঁধুনি এত প্রবল যে স্বতঃই মনে করিয়ে দেয়—ন্যায়শাস্ত্রকার এবং স্মৃতিশাস্ত্রকার একই ব্যক্তি। তারপর গোত্র-প্রমুখ যে তিনি তার প্রমাণও পাই আমরা সুপ্রাচীন 'অমরকোষ' এবং অতি প্রাচীন 'পাণিনি' ব্যাকরণে 'গৌতম' ও 'ন্যায়' শব্দটির উল্লেখ দেখে। মহাভারতেও গৌতম ও আন্বিক্ষিকী পদ দুটি আছে এক ব্রাহ্মণ ও শৃগালের গল্পে। যে বাৎস্যায়ন গৌতম ন্যায়ের ভাষ্য করেছেন তিনিই যে চাণক্য এ প্রমাণিত হয়েছে। বাৎস্যায়ন, কৌটিল্য, চাণক্য, পক্ষিলস্বামী, বিষ্ণুগুপ্ত সকলেই এক ব্যক্তি। এই বাৎস্যায়ন নন্দবংশের সময়কার লোক—অর্থাৎ গৌতম-

কৃত ন্যায়ের ভাষ্য করেছেন তিনি নিশ্চয়ই আরও আগে। যাই হোক গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র অতি প্রাচীন গ্রন্থ। অনেকে বলেন, এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে লেখা।

গৌতমের ন্যায়শাস্ত্রের মূলে ৫২১টি সূত্র আছে। সূত্র কথাটি আমরা বেদেও পেয়েছি। সূত্র কি ?

"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ সর্ব্বতোমুখং
অস্তোভমবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।"

স্বল্প কথায় সন্দেহহীন সার কথায় সর্ব্বতোমুখী তর্ককে শান্ত করে, একটিও বৃথা অক্ষরহীন এবং কোন দোষশূন্য যে বাক্য তাই সূত্র। এমনই ৫২১টি সূত্রে ন্যায়শাস্ত্র গঠিত। "প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ"—প্রমাণ দ্বারা পদার্থ পরীক্ষা করার নামই ন্যায়। শুধু তর্ক নয়, প্রমাণ চাই।

এই ন্যায়শাস্ত্র ৫ অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায় পঞ্চকে ১০টি আহ্নিক বা বিরাম এবং ১০টি আহ্নিকে আছে ৮০টি প্রকরণ বা ভাগ। এই ৮০ ভাগেই ৫২১টি সূত্র।

ন্যায়শাস্ত্রে গৌতম আগে পদার্থ বা বস্তুর উদ্দেশ্য উল্লেখ করে তার লক্ষণ এবং লক্ষণগুলি সঙ্গত কিনা, প্রমাণ দ্বারা তার পরীক্ষা করেছেন।

গৌতমের মতে আসল জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থ হচ্ছে বারটি। আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়, বুদ্ধি, মন, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি বা দোষ, প্রত্যাবস্থা, প্রতিক্রিয়া, দুঃখ এবং অপবর্গ বা মুক্তি।

এই কয়টিতে পেতে হলে চাই জ্ঞান। সে জ্ঞানের উপায় তিনি বলেছেন চারটি।

(১) প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দিয়ে যা বোঝা যায়
(২) অনুমান—সমুচিত কারণে যা অনুমান করা যায়
(৩) উপমান বা সাদৃশ্য দিয়ে যা বোঝা যায়

(৪) শব্দ বা আপ্ত বাক্য অর্থাৎ ঋষিদের বাচনিক প্রমাণ

এই উপায় নির্দ্ধারণ করবার জন্যে তিনি প্রতিটি কথাকে ষোল ভাগে বিচার করতে বলেছেন। এই ষোল ভাগটি হলো—(১) প্রমাণ (২) প্রমেয় (৩) সংশয় (৪) প্রয়োজন (৫) দৃষ্টান্ত (৬) সিদ্ধান্ত (৭) অবয়ব অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নির্গমন (৮) তর্ক (৯) নির্ণয় (১০) বাদ (১১) জল্প বা কুতর্ক (১২) বিতণ্ডা (আপত্তি) (১৩) হেত্বাভাস অর্থাৎ আভাসে হেতুর ধারণা মানে ভ্রান্ত যুক্তি (১৪) ছল (১৫) জাতি অর্থাৎ যে সাদৃশ্য ভুল করায় (১৬) নিগ্রহ অর্থাৎ তর্কে অসামর্থ্য প্রতিষ্ঠা করা।

জ্ঞানের উদ্দেশ্যে তিনি যা বলেছেন তাকে এই ১৬ রকম চুলচেরা বিচারে সিদ্ধ করেছেন। তাতে তিনি কুতর্ক করতেও বলেছেন এবং বলেছেন বিতণ্ডা বা আপত্তি করতে, খণ্ডন ক'রে আবার প্রতিষ্ঠা করবার কথাও বলেছেন। বলেছেন, নিজের সত্য নির্ণয়ে পরের মিথ্যার নিগ্রহ করতে। অথচ এসবই তিনি করেছেন কণাদের পরমাণুবাদকে ভিত্তি করে।

ন্যায়শাস্ত্র বিরাট যতখানি, দুর্বোধ্য তার চেয়েও বেশী। তাই সে গ্রন্থ গুরুর কাছেই পড়তে হয় বা শিক্ষা করতে হয়। কিন্তু অদ্ভুত এই ন্যায়শাস্ত্রের বিচার প্রণালী। পাশ্চাত্য 'লজিক' তা দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছে।

প্রমাণ—প্রথমে বক্তব্যের প্রমাণ দেখাতে গিয়ে গৌতম বললেন, প্রমা মানে জ্ঞান তা পাওয়া যায় যাতে তাই প্রমাণ। সেই জ্ঞান পাওয়া যায় ইন্দ্রিয় দিয়ে, ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ বস্তুর জ্ঞান দিয়ে, উপমা বা তুলনা দিয়ে আর বাক্য বা শব্দ দিয়ে। এই চার রকম ভাবে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা হচ্ছে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দ।

প্রমেয়—যা যা দিয়ে প্রমাণ করা হয় তাকেই বলা হয় প্রমেয়। শরীর ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, ধর্ম প্রভৃতি ১২টি জ্ঞান-জ্ঞাপক জিনিসই হলো প্রমেয়ের ১২ ভাগ। উক্ত ষোল রকমের বিচার প্রণালী হচ্ছে—

সংশয়—সেই প্রমাণে যদি কোন সন্দেহ থাকে তাই সংশয়। এই সংশয়কে দূর করতে হবে।

প্রয়োজন—মানুষের প্রকৃত কাম্য কি। কি সে চায়? সুখ? এই সুখ হলো মানুষের মুখ্য প্রয়োজন আর তার উপায় হচ্ছে গৌণ প্রয়োজন। আর যা চোখে দেখা যায় তা লৌকিক প্রয়োজন, এবং যা চোখে দেখা যায় না তা পারলৌকিক। এই প্রয়োজন নিয়েই জীবের উদ্যম, কর্ম এবং উন্নতি। এই প্রতিষ্ঠা করাই মানুষের ধর্ম।

দৃষ্টান্ত—যা দেখে মানুষ দৃঢ়ভাবে একটি নিঃসন্দেহে উপনীত হয়, সেই প্রমাণিত প্রত্যক্ষই হ'লো দৃষ্টান্ত।

সিদ্ধান্ত—বিচারের দ্বারা যা নিরূপিত হয় তাই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত চার রকমের। সর্ব্বতন্ত্র, প্রতিতন্ত্র, অধিকরণ, অভ্যুপগম। যা সর্ব্বশাস্ত্র ঘেঁটে তর্কবাদী প্রতিবাদী স্বীকার ক'রে নেয় তাই সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত। যে সিদ্ধান্ত একপক্ষ মানে অপর পক্ষ মানে না তা প্রতিতন্ত্র। সে সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হলে অন্য প্রমাণও সিদ্ধ হয় অথবা যে সিদ্ধান্তে শাস্ত্রের কথা অন্যথা হয়ে যায় তাই অধিকরণ সিদ্ধান্ত। আবার যে কথা উল্লেখই নেই শাস্ত্রে কিন্তু প্রমাণে সিদ্ধ হয়ে গেল তা অভ্যুপগম সদ্ধান্ত। এক সিদ্ধান্ত নিয়েই কত বিচার কত তর্ক। ঈশ্বর আছে কি নেই এর সিদ্ধান্ত সিদ্ধ না অসিদ্ধ তা নিয়েই তো যত বিচার।

অবয়ব—এই অবয়ব বিচারই বোধ হয় ন্যায়ের এক প্রকাণ্ড কাণ্ড। যে যে বাক্যে সাধনীয় পদার্থকে বোঝা যায় সেই বাক্যই অবয়ব। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নির্গমন এই পাঁচ অবয়বে গৌতম অদ্ভুত বিচার শক্তি দেখিয়েছেন। যেমন—পাহাড়ে দেখা গেল, ধোঁয়া। এই ধোঁয়া দেখেই বোঝা গেল সেখানে আগুন আছে। তিনি বললেন, 'পর্বতো বহ্নিমান।' এই বিচারই হলো প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা হলো পাহাড়ে আগুন আছে। কারণ কি?

'ধূম বত্বাৎ' ধোঁয়া—এইটিই হলো হেতু। তারপর বিচার করতে বসে দৃষ্টান্তস্বরূপ যা বলা হয় তাই উদাহরণ অবয়ব।

ধোঁয়া থাকলেই আগুন থাকে। যেমন যজ্ঞকুণ্ডে আগুন আছে বলেই ধোঁয়া ওঠে। এই হল উদাহরণ। এই আছে—তাই ঐ, এ নেই—তাই ওটা নয়। এমনই যে বিচার আর তার যে বিষয় তাই উপনয়। যো যো ধূমবান স স বহ্নিমান—এই হল উপনয়। পর্বতে ধোঁয়া দেখা গেছে অতএব সেখানে আগুন নিশ্চয়ই আছে। এই শেষ সিদ্ধান্তই হলো নিগমন। এই পর্ব্বত আর ধোঁয়া তাতে যে সিদ্ধান্ত আগুন—এ শুধু একটা উদাহরণ মাত্র। আসলে গৌতম এই ভাবেই সিদ্ধ করেছেন তাঁর বক্তব্য। তাঁর এই মহাবাক্যই ন্যায় ও পদার্থানুমান এই দুই নামে অভিহিত।

ন্যায় অবোধের বোধ জন্মায়, সন্দেহ ভঞ্জন করে, ভ্রান্তের ভ্রান্তি দূর করে। দৃষ্ট ও শ্রুত সব জিনিস এই গ্রন্থ দ্বারা পরীক্ষিত হয়, প্রমাণিত হয় এবং ইহা দ্বারাই বিচার্য্য বিষয়ে প্রমা বা জ্ঞান হয়।

তর্ক—এই সব নিয়ে যে বিচার তাকেই বলা হয় তর্ক। এই তর্ক দুই প্রকার। বিষয়-সংশোধক বা ব্যাপ্তিগ্রাহক। তর্ক দ্বারা বিচার্য্য কথাগুলো যখন সংশোধিত হয়ে যায়, বাদী ও প্রতিবাদীর সে তর্ককে তখন বলা হয় বিষয়-সংশোধক।

বিষয় স্থির হ'লো জন্ম কিংমূলক—নিত্য বা অনিত্য, নশ্বর বা অবিনশ্বর, উচ্ছেদ্য বা অবিচ্ছেদ্য। দুই দল—বাদী ও প্রতিবাদী পরস্পরকে দেবে বাধা বা ব্যাঘাত, নিজের যুক্তিকেই করবে আশ্রয়—সেটাই হল আত্মাশ্রয়; অন্যের কথার দৃষ্টান্ত আনবে তারপর চলবে চক্রান্ত—যার নাম 'চক্রক' তারপর তার প্রমাণের অসারত্ব দেখিয়ে আনবে অনাস্থা, যুক্তিদ্বারা বাধা দেবে—দশকথা না ব'লে এক কথায় বুঝিয়ে দেবে; কোথায় কোন্ ভ্রান্তি কোন্টা সত্য স্থির হবে 'বৈজাত্য' তর্কের পর। তর্কের রীতিই হলো এই। তর্ক প্রমাণ নয়, কিন্তু প্রমাণের সহায় নির্ণয়। তর্কের দ্বারা নির্ণয় হয় সত্য ও মিথ্যা,

নিত্য ও অনিত্য। এক পক্ষ করবে প্রমাণ ও বিন্যাস, অন্যে করবে খণ্ডন—এই বাকযুদ্ধই জল্পবাদ। জয়ের জন্য তর্কই হ'ল জল্প।

বিতণ্ডা—যেখানে তর্কে কেউ নিজের প্রমাণ দিতে পারে না, শুধু খণ্ডই করে তাই বিতণ্ডা।

হেত্বাভাস—প্রমাণ নিত্য সত্য নয়—অথচ প্রমাণ ব'লে ভুলকেই আঁকড়ে ধরে তাই হেত্বাভাস।

ছল—প্রতিবাদী কি বলছে তার সৎ অর্থ না ক'রে অন্য অর্থ বা কদর্থ করে, 'উল্টো বুঝলি রামের' মতো মনোমত অর্থ ক'রে নিল, তাকেই বলা হয় ছল। যেমন নববস্ত্র। নব-র অর্থ নূতন না ক'রে ন'খানা কাপড় ধরার নামই ছল।

জারি—অসদুত্তর বা প্রত্যুত্তরে যদি দোষ থাকে বা নিজের কথা বেসামাল হয়ে যায় তাকে বলা হয় জারি।

নিগ্রহ—পরাজয় হয় যে কথা বা তর্কের পথে তাই হলো নিগ্রহ এবং এই পরাজয় হলেই তর্ক শেষ।

অনেকে বলেন 'ন্যায় দর্শন' শুধু ফাঁকির ঝগড়া—আর্য্যদের আসল কাম্য যা, তার ইঙ্গিত কই তাতে! কিন্তু একথা ভুল। গৌতমের ন্যায়সূত্র বলে—"দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ"

অর্থাৎ আত্মা বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান, আত্মা বিষয়ক মিথ্যা জ্ঞান নষ্ট করে। মিথ্যা জ্ঞান নষ্ট হলে দোষ বিনষ্ট হয়। দোষের অভাবে প্রবৃত্তির অভাব এবং প্রবৃত্তির অভাবে জন্মের অবরোধ। জন্মের অবরোধ হলেই অপবর্গ বা মোক্ষ।

এই মিথ্যা জ্ঞান বলতে তিনি বলেছেন, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এই তিনটির কোনটাই আত্মা নয়—আত্মা এ তিন ছাড়া অন্য জিনিস। এ তিনটির কোনটিকে আত্মা ভাবাই মিথ্যা জ্ঞান।

অতএব মিথ্যা জ্ঞান নষ্ট হলেই হয় আত্মার জ্ঞান। আত্ম জ্ঞানেই হয় মোক্ষলাভ। তবে গৌতমের গ্রন্থে ঈশ্বর প্রতিপাদক

কোন সূত্র নেই। এমন কি ঈশ্বর কি, উপাস্য কি—সে সম্বন্ধেও কোন উল্লেখ নেই।

তবে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরের উল্লেখ না থাকায় আধুনিক নৈয়ায়িকগণ বলেন, 'ন্যায়' ঈশ্বর-অনুমানের শাস্ত্র। নব্য নৈয়ায়িকগণ প্রসঙ্গতঃ এই কথাই বলেছেন যে—

'জীবাত্মা শরীরী, ঈশ্বর অশরীরী তাই তিনি ইন্দ্রিয়াদির মতো অনিত্য নন।' তাঁরা বলেন—ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে বলেই এই মহাবাক্য সব আছে—"ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা—কার্য্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ।" অর্থাৎ ঘট—যখন একটি বস্তু তখন তার নির্ম্মাণ কর্ত্তা নিশ্চয়ই আছে, তেমনি ক্ষিতি একটি বস্তু তারও নির্ম্মাণ কর্ত্তা আছে।

এইভাবে গৌতম এক পরম শক্তিকে বিশ্বাস করেছেন। তাঁর এই বিশ্বাস, অবিশ্বাস, যুক্তি-তর্ক সবকে ভিত্তি করেই ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম ভাষ্য লেখেন বাৎস্যায়ন ৪০০ খৃষ্টাব্দে। তারপর ৭০০ খৃঃ উদ্যোতকর ন্যায়ের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের যুক্তি খণ্ডন ক'রে এক 'বার্ত্তিক' লেখেন। ৯০০ খৃষ্টাব্দে বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকা লেখেন। ১৩০০ খৃষ্টাব্দে লেখা হয় বর্দ্ধমান কর্ত্তৃক ন্যায় নিবন্ধ প্রকাশ। তারপর এই ধারা ক্রমে প্রবাহিত হয় বঙ্গ-মিথিলায়। মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায় লেখেন ১৩০০ খৃষ্টাব্দে তত্ত্বচিন্তামণি। আর তাকেই অবলম্বন ক'রে বাঙ্গলার নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ, গদাধর, জগদীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নব্য ন্যায়ের নূতনতম সৃষ্টিতে বাংলাকে ন্যায়-জগতে গৌরবের আসনে বসিয়ে গেলেন।

পাতঞ্জল দর্শন

পতঞ্জলি মুনি রচিত সাংখ্য-প্রবচন নামক গ্রন্থই আজ পাতঞ্জল দর্শন নামে খ্যাত। সাংখ্যদর্শনে আছে ২৫টি তত্ত্ব আর পাতঞ্জলে ২৬টি। এই যে একটি তত্ত্ব—এটি 'ঈশ্বর।' সাংখ্যদর্শন 'ঈশ্বর'

ব'লে কোন পৃথক তত্ত্ব স্বীকার করেনি, কিন্তু পতঞ্জলি মুনি তাঁর দর্শন-গ্রন্থে কপিলের সব কথা মেনে নিয়েও ঈশ্বরকে স্বীকার করেছেন। বলেছেন—"ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" (অবিদ্যাদি) ক্লেশ, (শুভাশুভ) কর্ম্ম, সকলের ফলভোগ অর্থাৎ জন্মমরণাদিও কর্ম্মজনিত। এর অর্থ হ'লো—পুণ্যপাপাদি কর্ম্মজন্য সংস্কার থেকে অস্পৃষ্ট অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন যে এক বিশেষ পুরুষ—তিনিই ঈশ্বর।

কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনের যাবতীয় কথা—ক্রমবিকাশ তত্ত্বাদি সবকিছু মেনে নিয়েও পতঞ্জলি স্বীকার করেছেন এক বিশ্বজনীন পরমপুরুষের অস্তিত্ব। আর তাকে জানবার ধারণা করবার, তার সঙ্গে যোগ-সাধন করার যে সাধনা এবং নিয়মাদি পাতঞ্জল তাকে বলেছেন যোগশাস্ত্র। এই যোগ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—'যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধ।' চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করাই যোগ। এই চিত্তবৃত্তি বা মন নিয়ে যে শাস্ত্র তা দর্শন বা জ্ঞান থেকে একটু পৃথক বলেই দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা একে মনোবিজ্ঞান বললে বোধ হয় বেশী স্পষ্ট করা হয়। তাই হয়তো Philosophy থেকে পৃথক করা হয়েছে Psycology-কে। কিন্তু মজার কথা এই যে Psyche মানে আত্মা, অথচ পাশ্চাত্ত্য দেশ Psycology-তে Psyche বা আত্মাকে স্বীকার করেনি। Psyche বিহীন Psycology নিয়েই তারা উন্মত্ত। অথচ তাদের এই শাস্ত্র আবিষ্কারের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে পতঞ্জলি তাঁর মতকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গিয়েছেন। তিনি যোগের কথা বলতে গিয়ে বললেন, চিত্তকে সংযত করে, বহির্ভূত জিনিস থেকে যদি তাকে নিরোধ করা যায় তবে যে-কোন শক্তি অর্জন করা যায়—এমন কি, সেই অজ্ঞেয় পুরুষকে জানাও তার কঠিন নয়। সেইসব পথ ও মতের ইঙ্গিত পেয়েও তত্ত্বকথার নির্দ্দেশনায় বুঝতে পারি যে—"নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং, নাস্তি যোগসমং বলং।" এই যে যোগ-সাধনার সাধন-কথা এই হ'ল পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্র।

সাংখ্য বলে, পুরুষ ও বুদ্ধি যে এক, এই জ্ঞান হওয়াই মুক্তি। পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্র কিন্তু বললেন, কেবল একটা দার্শনিক জ্ঞান হলেই মুক্তি মেলে না গো! মুক্তির জন্য চাই চিত্তের চঞ্চলতার ধ্বংস অর্থাৎ মনের সবকিছু খেয়াল শেষ করে, নিজের কর্ম্ম, সমাধি, ধ্যান ও ধারণাদি সেই পরম একের সঙ্গে যোগ করে দিতে হবে নিজেকে—আর সেই যোগই হচ্ছে মুক্তির কারণ।

পতঞ্জলি তাঁর যোগশাস্ত্র লিখেছেন কয়েকটি সংক্ষিপ্ত সূত্র-সমষ্টিতে। সর্ব্বসমেত চারটি পাদে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। কী অপূর্ব্ব অধ্যায় ভাগ! সমাধি-সাধনে বিভূতির প্রকাশ ও কৈবল্যপ্রাপ্তি। মোট ১৯৫টি সূত্র। তার প্রথমপাদের ৬টি সূত্রেই গ্রন্থের উদ্দেশ্য বোঝা যায়।

১। অথ যোগানুশাসনম্ (যোগশাস্ত্রের আরম্ভ)

২। যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ (চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ)

৩। তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেবস্থানম্ (সেই সময় অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধকালে দ্রষ্টা অর্থাৎ আত্মাস্বরূপে অবস্থান করে)

৪। বৃত্তিস্বারূপ্যমিতরত্র (অন্য সময় চিত্তবৃত্তির স্থিতিকালে আত্মা চিত্তবৃত্তির সঙ্গে এক হয়ে যায়)

৫। বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টঃ (বৃত্তি পাঁচ রকম—তাহা আবার দুইভাগে বিভক্ত ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। অর্থাৎ অবৈধ যে চিত্তবৃত্তি তাই ক্লিষ্ট আর বৈধ যে চিত্তবৃত্তি তা অক্লিষ্ট।

৬। প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ (প্রমাণ, বিপর্য্যয় অর্থাৎ ভ্রান্তি, বিকল্প নিদ্রা আর স্মৃতি—এই পাঁচরকমের বৃত্তি)

এইরকম সব সূত্র দিয়ে পতঞ্জলি প্রথম পাদে বা অধ্যায়ে যোগের লক্ষণ, তার বিভাগ ও তার উপযোগী বিষয় সকল বলেছেন। তারপর সাধনপাদে বলেছেন—সেই যোগ-সাধনার নানা ক্রিয়ার কথা, তার পরের বিভূতপাদেও সবিস্তারে সেই সাধন, ধ্যান, ধারণা সংযম ও

অনুষ্ঠান প্রণালী ও আনুষঙ্গিক সকলের কথা এবং সর্ব্বশেষপাদে যোগ সাধনার দ্বারা পাঁচ প্রকার সিদ্ধি ও কৈবল্য লাভের কথা।

পতঞ্জলি অন্যান্য দর্শনে লিখিত কতকগুলো নামেরও পরিবর্ত্তন করেছেন। আত্মাকে তিনি বলেছেন দ্রষ্টা, দৃকশক্তি, পুরুষ, চিতিশক্তি ইত্যাদি। মোক্ষ ও নির্ব্বাণ না বলে তিনি বলেছেন কৈবল্য ও স্বরূপে অবস্থান।

অন্যান্য দর্শনে বলেছেন তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয় কিন্তু পতঞ্জলি বলেছেন, জ্ঞানে মোক্ষ লাভ হয় না, হয় কর্ম্মে, হয় যোগ-সাধনায়। সে সাধনার জন্য চাই সংযত চিত্তবৃত্তি ও নানা রকম অনুষ্ঠান। পরবর্ত্তী কয়েকটি মূল সূত্রেই তা বোঝা যায়। মূলতঃ পতঞ্জলির মতে—"পরমেশ্বর এক প্রকার পুরুষ। তিনি মূল পুরুষ—অন্য জীব নামধেয় অসংখ্য পুরুষ থেকে স্বতন্ত্র। তিনি পূর্ণ, অদ্বয়, বিচিত্র শক্তিমান, ক্লেশ কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ে অলিপ্ত। তিনি স্বেচ্ছায় প্রকৃতিকে পরিচালিত করেন অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলা সম্পন্ন করেন এবং তিনিই লৌকিক, বৈদিক দ্বিবিধ ব্যবহারের প্রবর্ত্তক। ইহারই প্রসন্নতায় তাপিত জীব তাপ মুক্ত হয়। তারপর বলেছেন—'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থ ভাবনম্। ততঃ প্রত্যেক্‌চেতনা-ধিগমোপন্তরায়া ভাবশ্চ॥ এমন যে ঈশ্বর তাঁর বাচক শব্দ ওঁ। যোগী অনন্যচিত্ত হয়ে ঐ বাচক শব্দের জপ ও তার অর্থের যে বিষয় সেই মূলের চিন্তা করবেন। আর তা করলে চৈতন্যের উদয় হবে। অর্থাৎ যোগ-বিঘ্নকর অচৈতন্য নষ্ট হবে। "ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাশয়ৈ রপরামৃষ্টঃ পুরুষঃ বিশেষ ঈশ্বরঃ"—এই যদি ঈশ্বরের গুণ, তবে যোগ-সাধকের ঈশ্বরে লয় হবার জন্য এই গুণের অধিকারী হতে হবে। তাই তার যোগ-সাধনার পথ। ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় এই থেকে বিমুক্ত যে সেই ঈশ্বর। কিন্তু কি সেই ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়?

ক্লেশ—পতঞ্জলি বলেছেন, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভি-নিবেশ এই পাঁচটি ক্লেশ। বুদ্ধির যে তামস বৃত্তি অর্থাৎ মোহযুক্ত

বুদ্ধি হ'ল অবিদ্যা, 'অহং' জ্ঞানরূপ অহঙ্কারেই অস্মিতা, রাগ ও দ্বেষ রিপু এবং অভিনিবেশ হ'ল স্বার্থ জন্য যে প্রার্থনা, মৃত্যুভয়াদি রহিত হবার জন্য যে কামনা। এই পাঁচটিই সংসারের ক্লেশ।

কর্ম্ম—কায়িক ও বাচিক ন্যায়-অন্যায় কার্য্যই হলো কর্ম্ম।

বিপাক—কর্ম্মের ফলই হচ্ছে বিপাক।

আশয়—সংস্কারের ফলে মনে যে ইচ্ছার উদ্রেক হয় তাই আশয়।

এই ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশয় সব যে ছাড়তে পারে তার ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হবেই।

এই যোগ কি ? 'যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ'—চিত্ত-বৃত্তিকে নিরোধ করাই যোগ। কিন্তু কি এর পথ ? পতঞ্জলি বলেন—'অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই হবে তা নিরোধ। এইভাবে অভ্যাসের লক্ষণ, বৈরাগ্যের লক্ষণ সমস্তই বিশদ ক'রে বলেছেন পতঞ্জলি। তিনি বলেছেন—অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাধনের জন্য ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করতেই হবে। এই ক্রিয়াযোগে রত হয়ে অল্পে অল্পে ক্লেশ-পঞ্চককে দুর্বল ক'রে বৈরাগ্য ও অভ্যাস সাধন করতে হবে। তারপর নিরোধ নামক সমাধিকে জয় বা আয়ত্ত করতে হবে।

যে ক্রিয়াযোগে প্রথম সাধনার আরম্ভ, তা হচ্ছে তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান। এর দ্বারাই সাধক নির্বীজ-সমাধি নামক মুখ্য-যোগ সার্থক করতে পারে। এই মুখ্যযোগের অঙ্গ আটটি। সেই অষ্টাঙ্গ সাধনা হলো যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

যম—অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, চৌর্য্যবর্জ্জন, ব্রহ্মচর্য্য ও অনিগ্রহ।

নিয়ম—শৌচ (বাহ্যিক) ভাবশুদ্ধি (অন্তঃশুচি) সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরচিন্তা।

আসন—যে ক্রিয়াতে শরীর ও মন সুস্থ হয় তাই আসন।

প্রাণায়াম—শাস্ত্রীয় নিয়মে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছিন্ন করাই প্রাণায়াম।

প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয়াদির ভোগ বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ ক'রে যে বাইরের বস্তু থেকে মনকে চিত্তের দিকে সমাহিত করা তাই প্রত্যাহার।

ধারণা—কোন এক বিষয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করা অর্থাৎ অন্য-দিকে যেতে না দেওয়াই ধারণার ফল।

ধ্যান—ধ্যানের পূর্ণতাই চিন্তনীয় বস্তুতে সে চিত্তকে বিলয় করিয়ে দেয়। ধ্যানে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে সাধকের চিত্ত শুধু ধ্যেয় বস্তুর রূপে প্রবুদ্ধ হয়ে ওঠে।

পতঞ্জলি বলেছেন এই অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যস্ত হলেই যোগী যোগ-সিদ্ধ হয় অর্থাৎ যোগ-প্রক্রিয়ার ফলে কৈবল্য লাভ করে। তারপর তিনি নানারকম সিদ্ধির কথা বলেছেন। যোগ-সিদ্ধ ব্যক্তি এই বিশ্বের যাবতীয় কর্ম্মেরই শক্তি অর্জন করে। যেমন তিনি বলেছেন—'অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ'—হিংসা-ত্যাগ সিদ্ধ হলে হিংস্র পশুও তাকে হিংসা করে না। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভ—ব্রহ্মচর্য্যে বীর্য লাভ হয়। স্বাধ্যায়াদিষ্ট দেবতা সম্প্রয়োগ—মন্ত্র জপাদি সিদ্ধ হলে দেব দর্শন হয়। এইভাবে তিনি আরও বলেছেন—আসন সিদ্ধ হলে শীতগ্রীষ্মাদির প্রকোপে শরীর অসুস্থ হয় না। প্রত্যাহার সিদ্ধ হলে ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়।

'ভুবন জ্ঞানং সূর্য্য-সংযমাৎ—সূর্য্যে সংযম—সমাধি করলে ভুবনকোষ অর্থাৎ ভূগোল খগোল বিষয় জানা যায়। 'চন্দ্রে তারা ব্যূহ জ্ঞানম্'—চন্দ্রে মন সংযত হলে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর কথা জানা যায়, এইরূপ হৃদপদ্মে চিত্ত সংযত হলে জ্ঞানের উদয় হয়—সে জ্ঞান ক্রমে অলৌকিক হয়ে ওঠে।

'বন্ধকারণ শৈথিল্যাৎ প্রচার সম্বেদনাচ্চ চিত্তস্য পর শরীরা বেশঃ।' —সমাধি ভাবনা দ্বারা যোগী সংযম যোগে পরের মৃতদেহে বা জীবন্ত

শরীরে সে ইন্দ্রিয়-চিত্ত সঞ্চারিত কোরে নিজের শরীরের মতন সেই শরীরকে ব্যবহার করতে পারেন। 'উদান জয়াৎ পলপঙ্ককণ্ট-কাদিস্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ।'—প্রাণ, অপাণ, সমান, ব্যান প্রভৃতি বায়ুকে নিরোধ করে এবং উদান বায়ুকে সংযমের দ্বারা জয় ক'রে যোগীরা উর্দ্ধগামী হয়ে জলে, জঙ্গলে, কণ্টকে পরিভ্রমণ করতে পারেন—এমন কি দেহ থেকে নির্গত হয়েও যেতে পারেন। "সমান জয়াৎ প্রজ্বলনম্"—সংযমে সে আগুনের মতো দীপ্ত হয়ে ওঠেন। এমনিভাবেই মানুষ অশ্রুত শব্দ শুনতে পান, তুলোর মতো হাল্কা হয়ে আকাশ-মার্গে উড়ে যাবার শক্তিও অর্জন করেন—এমন কি সারা পৃথিবী তাঁর বশীভূত হয়ে যায়; ইচ্ছামাত্র তিনি সবকিছু করতে পারেন। ভূত-ভবিষ্যৎ জানতে পারেন, অজ্ঞাত বস্তুও জ্ঞাত হতে পারেন, পারেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা জয় করতে, সিদ্ধ-দর্শনের অধিকারী হতে।

এই প্রক্রিয়া দ্বারা মানুষ ইন্দ্রিয় জয়, প্রকৃতি জয় করতে পারে। এই প্রক্রিয়াতেই বিবেকজ্ঞান, আত্মদর্শন, চিত্তস্বরূপ-দর্শন ও কৈবল্য বা মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়। এই যোগ-প্রক্রিয়ার নানা পথ যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন পতঞ্জলি তাঁর দর্শনে।

বৈশেষিক দর্শন

বৈশেষিক দর্শন মানে বিশেষ কথা বলা হয়েছে যে দর্শনে। এই বিশেষ কথাটি হচ্ছে মোক্ষ। এ সম্বন্ধে বিচার, অনুমান সিদ্ধান্ত যে ভাবে করা হয়েছে তাই বৈশেষিক দর্শন। এই দর্শনের রচয়িতা হলেন মহামুনি কণাদ।

আদি-সিদ্ধ কপিল ও আদি-দর্শন সাংখ্য হলেও কণাদকেও বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ও বেদান্ত-দর্শন প্রণয়নের সমসাময়িক বলা যেতে পারে। অনেকে বলেন তা ৩২০০ খৃঃ পূর্ব্বের কথা। বহু লোকের বিশ্বাস গৌতমের ন্যায়-দর্শনের বিপক্ষে এই দর্শন লেখা হয়েছে। কিন্তু

একথা সত্য বলে মনে হয় না। বরং মনে হয় ন্যায়দর্শনের এ পরিশিষ্ট অথবা সমগোত্রীয় দর্শন। আর কালপ্রবাহে হয়তো এই দুই দর্শন মিশে গিয়েছে। তাই তার নাম হয়েছে ন্যায়-বৈশেষিক।

কণাদের বৈশেষিক দর্শনকে আবার ঔলুক্য দর্শনও বলা হয়। কারণ কণাদ ছিলেন উলুকের পুত্র।

যত বিচার আর তত্ত্বানুসন্ধানই করুন, কণাদ গ্রন্থারম্ভে বলেছেন—"অথাতোধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ"। ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার প্রবৃত্তি নিয়েই সেযুগের দর্শন-ন্যায়-স্মৃতি সবকিছু।

এই ধর্ম্মের কথা বলতে তিনি বলেছেন, যা থেকে স্বর্গ ও মোক্ষ-সুসিদ্ধ হয় তাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের দ্বারা মানুষ শুদ্ধ-সত্ত্ব হয়। এই শুদ্ধ-সত্ত্ব হলেই মানুষ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য বিশেষ ও সমবায় পদার্থের স্বধর্ম্ম ও বিধর্ম্ম বুঝতে পারে। বুঝতে পারে ষট তত্ত্বের দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের প্রকৃত রূপ। তখন প্রশ্ন হয়—"কোঽহং"—কে আমি। মন তখন অন্তর্মুখী হয়—মন তখন জানতে চায় পৃথিবীর ও নিজের মধ্যে কি বস্তু আছে। মন তখন আত্ম যাথার্থ্য স্থির করতে প্রবৃত্ত হয়—শাস্ত্রোপদেশে সক্ষম হয়। তখন পূর্ব্বাভ্যস্ত মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কার যায় ভেঙ্গে। চরম আনন্দে সুখ দুঃখের অনুভূতি পর্য্যন্ত থাকে না।

ষটতত্ত্বের বিচার প্রসঙ্গে বললেন, নয়টি দ্রব্যের কথা। আবার দ্রব্য বলতে গিয়ে বললেন, গুণের আধার বা আশ্রয় হচ্ছে দ্রব্য। গুণ কি? দ্রব্যও নয়, কর্ম্মও নয় অথচ যা তার সম্বন্ধে বা আশ্রয়ে থাকে তাই গুণ। গুণ নয়, দ্রব্য নয় অথচ ক্রিয়াশীল গতি বা স্পন্দনের নামই কর্ম্ম। সামান্য মানে জাতি। সামান্য দুই রকম—পর ও অপর। পর সামান্য বা সত্তা দ্রব্যে-গুণে ও কর্ম্ম সমবেত। আর অপর সামান্য হলো দ্রব্যত্ব আদি—গুণে ও কর্ম্মে সমবেত থাকে।

বিশেষ গুণ আছে যাতে তাই বিশেষ—যেমন পরমাণু। চোখে দেখা যায় না অথচ তার গুণও আছে, কর্ম্মও আছে—অনন্ত ও সর্ব্বত্র।

সমবায় হলো—যেমন ফুল একটি দ্রব্য, গন্ধ তার গুণ। এই দুজনের সম্বন্ধে হল সমবায়। অথচ এ সম্বন্ধ হবে নিত্য সম্বন্ধ—অবিভাজ্য। এমনি নয়টি দ্রব্যের মধ্যেই আছে বিশ্বসৃষ্টির মূল। ক্ষিতি (পৃথিবী) অপ (জল) তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, মন এই নয়টিই সৃষ্টির প্রধান দ্রব্য।

সৃষ্টির সকল পদার্থেই আছে চব্বিশ রকমের গুণ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, ব্যাপকত্ব, অপরত্ব, পরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সংস্কার, শব্দ, সংযোগ, পৃথকত্ব, বিভাগ, গুরুত্ব, প্রযত্ন, দ্রব্যত্ব এবং স্নেহ।

এই পদার্থ সকল আবার পঞ্চকর্ম্মের অধীন। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমনশীলতা। পদার্থের কথা বললেন, —গুণে কিংবা কর্ম্মে যা কিছু জ্ঞানের মধ্যে আসে তা সবই পদার্থ।

যাই হোক কণাদ এইভাবে জগতের যাবতীয় পদার্থের বিভাগ ও লক্ষণাদি নির্ণয় করেছেন। আর তা করতে গিয়েই অনেক সূক্ষ্ম কথা তিনি বলেছেন। কণাদই প্রথম বললেন, জগতের মূল কারণ নিত্য। নিত্য মানে—"সদকারণবন্নিত্যম"—যার কারণ নেই সদা বিদ্যমান তাই নিত্য। আরও স্পষ্ট ক'রে বললেন, নানা উপায়ে তা সম্পন্ন হতে পারে ও ফলে বহু অলৌকিক কাজ করাও সম্ভব হয়। যোগে যেমন অলৌকিক শক্তি দেখান যায়—আত্ম-মন সংযোগে হয় সমাধি আর তাতে সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান জন্মে।

মোক্ষ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন গৃহীত পূর্ব্ব-দেহ থেকে আত্মার অপসারণ, আবার অন্য দেহে অবস্থিতি। কণাদের মতে আত্মার মোক্ষ বা মুক্তি একেবারে হয় না। মোক্ষপ্রাপ্ত আত্মা দুঃখাতীত হন কিন্তু জড়ও আকাশের মতন অপ্রত্যক্ষ হ'য়ে টিকে থাকে। বৈষ্ণবেরা তাই বৈশেষিক মোক্ষ চায় না। জ্ঞানকেই তিনি বলেছেন চৈতন্য। তিনি এও বলেছেন আত্মা ও মনের যে সংযোগ মৃত্যুর পরও তা বিচ্ছিন্ন হয় না—মৃত্যুর পর আত্মা জন্ম ও মরণের মধ্যে স্বপ্নের

মতই থাকে। তারপর যখন বিশেষ সাধনায় তাদৃশ আত্মা-মন সংযোগ ধ্বংস হয় তখন আত্মার স্বরূপ প্রাপ্তি হয়—হয় মোক্ষলাভ।

মীমাংসা দর্শন

মীমাংসা মানে আমরা বুঝি বিচার করা। কোন তর্ক, সন্দেহ বা জটিলতা এলে তাকে সহজ ও সরল ক'রে দেয় এই মীমাংসা। মীমাংসা-দর্শনের এই মীমাংসা হচ্ছে বেদের কথা নিয়ে। যে বেদের কথা নিয়ে তার মীমাংসা, সে বেদ ত্রিকাণ্ড—জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড এবং কর্ম্মকাণ্ড। একটি জ্ঞানের কথা আর একটি কর্ম্মের কথা। বেদের জ্ঞানের কথাই হলো তার উপনিষদ অংশ—তারই মীমাংসা করেছেন স্বয়ং বাদরায়ণ বা ব্যাসদেব তাঁর উত্তর মীমাংসায় আর কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা করেছেন মুনি জৈমিনি তাঁর পূর্ব্ব মীমাংসায়। দুটি মীমাংসার প্রথম দুটি সূত্রই একথা বলে দেয়। ব্যাসের উত্তর মীমাংসা বা বেদের অন্তর্ভাগ বা বেদান্তের প্রথমসূত্র হ'ল—"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"—এরপর ব্রহ্ম কাকে বলে, এই নিয়েই চললো ঐ উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তের নানা আলোচনা। ব্রহ্মকে জানতে হলে যে জ্ঞানমার্গে পরমতত্ত্বের আলোচনা করতে হয় তাতেই এই উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত পূর্ণ। তাই তার আর এক নাম **"ব্রহ্মসূত্র"**। আর জৈমিনি-কৃত পূর্ব্ব মীমাংসার প্রথম সূত্রটি হচ্ছে—"অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা"—এরপর ধর্ম্ম কি? এরই আলোচনা এই পূর্ব্ব মীমাংসায়। মীমাংসা করতে গিয়ে যা পূর্ব্বে অর্থাৎ অগ্রেই করা প্রয়োজন তাই পূর্ব্ব-মীমাংসা। এতে আছে বেদোক্ত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের নানা বিচার। এবার এই দুটি মীমাংসার পৃথকভাবে আলোচনা প্রয়োজন।

পূর্ব্ব মীমাংসা

জৈমিনির পূর্ব্ব মীমাংসা অতি প্রাচীন গ্রন্থ, তবে খৃষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতকে শবরস্বামী, কুমারিল ও প্রভাকর নানারকম ভাষ্য

করেছেন এবং স্মৃতি শাস্ত্রকারগণ এই মীমাংসাকেই অবলম্বন করে প্রসিদ্ধ স্মৃতি-শাস্ত্র লিখে গেছেন। তাই স্মৃতি-শাস্ত্রের যে সব কথা মীমাংসাদর্শনে পাওয়া যায় না তা অনেকে মানতে চান না। কারণ নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান ও কার্য্যাদি নিয়েই এই উত্তর মীমাংসার আলোচনা

"অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" বলেই তাকে প্রথমে বলতে হয়েছে ধর্ম্ম কি? উত্তরে বল্লেন যে—বিধিবৎ শ্রেয়স্কর ক্রিয়া-কলাপই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম যে সব অনুষ্ঠানসাপেক্ষ, সেই যাগ, যজ্ঞ, জপাদি কার্য্যই যে ধর্ম্ম কার্য্য, এই নিয়েই তিনি করেছেন বিচার। তিনি বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডকে—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে ভাগ করেছেন।

মন্ত্র, যা গান ক'রে বলা হয় তাই সাম, যা অনুষ্ঠান রূপে করা হয় তাই যজুঃ। অতি আদিমকালে হয়তো ঋষিরা ঋক মন্ত্র নিয়ে বা সামগান গেয়ে বৈদিক স্তোত্র বা মন্ত্রদ্বারা বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির আরাধনা করতেন, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে সেই আরাধনা বিশেষ বিশেষ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প রণত হয়—আর তাই আছে যজুর্ব্বেদে। তার ওপরে তার আরও উপচার আর অভিচার আবির্ভূত হয়—তাই অথর্ব্ব বেদ।

এখন এই যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রাকৃতিক শক্তি ক্রমে দেব দেবীর আসন জুড়ে বসলো বটে কিন্তু বেদ অপৌরুষেয়—ঈশ্বর বা কোন ব্যক্তি বেদ রচনা করেনি, এ বিশ্বাস তাদের রয়েই গেল। কিন্তু মন্ত্র বা শব্দব্রহ্মই যে অর্থের বা সফলতার কারণ এইটাই হয়ে গেল তাদের ধারণা। তাই বেদোক্ত মন্ত্র বা বিধি নিষেধ দ্বারা জগতের উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে সর্ব্ব বিষয়ের বিচার তারা করতে বসলো। এবং স্থির ক'রে নিল যে ঐ শব্দ বা মন্ত্রসহ যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানই প্রকৃত বেদোক্ত ধর্ম্ম।

জৈমিনি সেই বিচার সুশৃঙ্খলভাবে এমন সুবিস্তৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে করলেন যে তা এক অভিনব দর্শনের সম্মান পেলো। স্মৃতি

বা অনুষ্ঠানের বিষয় হয়েও সে হল তত্ত্বজ্ঞানময় দর্শনশাস্ত্র। জৈমিনি এই বিরাট গ্রন্থ বারটি অধ্যায়ে লিখলেন, তাই এর অন্য নাম হ'ল "দ্বাদশ-লক্ষণী।"

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে রইল—ধর্ম্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, ধর্ম্মের লক্ষণ এবং বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র ও স্মৃতি এই চার রকম প্রমাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে—যাগ-যজ্ঞাদি ধর্ম্মের নানাপ্রকার ভেদ—কর্ম্ম-ভেদ, উপোদ্ঘাত, প্রমাণ, অপবাদ আর প্রয়োগভেদ বর্ণিত।

তৃতীয় অধ্যায়—যাগযজ্ঞাদি অঙ্গ নিরূপণে প্রধান ও অপ্রধান অংশ স্থির করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়—যজ্ঞকারীর গুণ, যোগ ও রীতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। প্রধান অপ্রধান প্রযোজকত্ব, জুহুপর্ণতাদি ফল, রাজসূয়গত অক্ষ দ্যূতাদি আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়—যজ্ঞাদি কর্ম্মের ক্রমনির্ণয়ে শ্রুত্যাদি ক্রম, উৎকর্ষ অপকর্ষ, প্রাবল্য ও দৌর্ব্বল্য সব বিবেচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়—আছে আটপদ। ধর্ম্ম, দ্রব প্রতিনিধি কল্পনা. প্রায়শ্চিত্ত, বহ্নিবিচার, সত্রদেয় প্রভৃতি।

সপ্তম অধ্যায়—বচনাতি দেশ, নামলিঙ্গাতিদেশ প্রভৃতি বিচার করে কোন কাজ কোন রকমের মতন করবে তারই নির্দ্দেশ আছে।

অষ্টম অধ্যায়—এই অধ্যায়েও অতিদেশ, অপবাদ, স্পষ্ট, অস্পষ্ট, প্রভৃতির লিঙ্গ নির্দ্দেশ আছে।

নবম অধ্যায়—উহবিচার, সামোহ, মন্ত্রোহ প্রভৃতি জিনিসের বিচার অর্থাৎ কোন বস্তুর অভাবে তার প্রতিনিধি হিসেবে কি ব্যবহার করা যায় তারই বিচার করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়—বাধ, হেতু, দ্বার, লোপবিস্তার সব আলোচিত হয়েছে। বাধ মানে নিবৃত্তি বা পরিত্যাগ। কোন জিনিস ছেড়ে কোন জিনিস বিস্তার করা দরকার তারই বিচার এই অধ্যায়ে করা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়—তন্ত্রতা বিচার ও নানারূপ তন্ত্রের আলোচনা এতে হয়েছে। এক কাজ করলে অন্য কাজ মেটে কিনা—এক স্থানে দুটি যাগ করা চলে কিনা এই নির্ণয়ের নামই তন্ত্রতা।

দ্বাদশ অধ্যায়—এতে আছে প্রসঙ্গ নির্ণয়। মূল যজ্ঞের যে বস্তু সংগ্রহ করা হলো তাতেই যজ্ঞাঙ্গ পূর্ণ হয় কি না এরই আলোচনা।

এইভাবে বারটি অধ্যায়ে গ্রন্থ শেষ হয়েছে। মহামুনি জৈমিনি কেবলমাত্র বেদকে ভিত্তি করেই বেদোক্ত মন্ত্র-বিভাগে লক্ষণ ও উদাহরণ দেখিয়ে বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র ও নাম এই চার মহাবিভাগ করে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজনক যাগ, দান ও হোমাদি কর্ম্মের স্বরূপ অনুষ্ঠান প্রণালী স্থির করেছেন।

দ্বাদশ অধ্যায় পূর্ণ এ গ্রন্থে আটচল্লিশটি পদে প্রায় হাজার সূত্রে ও হাজার রকমের বিচার করেছেন। প্রতিটি বিচার আবার বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ (তর্ক) উত্তর ও নির্ণয়ে মীমাংসিত হয়েছে। এই ভাবে তিনি বিচার করেছেন মন্ত্রশক্তির কথা। প্রমাণ দিতে গিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি ও শব্দ সব কিছুর প্রমাণ দেখিয়ে মীমাংসা করে গেছেন যে যাগযজ্ঞ উচ্চারিত মন্ত্রের শক্তিতে শব্দ ব্রহ্মের কৃপায় কাম্য ফল লাভ হবেই। মন্ত্র বা প্রার্থনায় ফল লাভ হয়। একথায় নব্য বৈজ্ঞানিক হাসবেন বটে কিন্তু যেমনই তাঁরা বলবেন efficacy of prayers আমরা প্রসন্ন মনে তা স্বীকার করবো। যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়ায় যে ফললাভ হয় তার বর্ণনায় আমরা হাসবো বটে, কিন্তু যখনই তাঁরা Law of action and reaction বলে কার্য্য কারণ বোঝাবেন, তখনই আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠবো।

যাগ-যজ্ঞের ক্রিয়া-কর্ম্মের বা শব্দ বা মন্ত্রের কোন ফল হয় কি না হয় তারই সহস্র প্রমাণ দেখিয়ে সহস্র বিচার করে যে গ্রন্থ লিখিত তার বিষয় সহজে সরলে বলা অসম্ভব! তবে মোটমাট এইটুকু জানা দরকার যে মীমাংসা দর্শনই বর্ত্তমান স্মৃতি শাস্ত্রের জনক, আর বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদির আলোচনা থেকেই উদ্ভূত।

সাংখ্য দর্শন

সাংখ্য-দর্শনের রচয়িতা মহর্ষি কপিল। কিন্তু এ কপিল কোন্ কপিল ? এ প্রশ্নের জন্য দায়ী আচার্য্য শঙ্করের এক উক্তি। "অন্যস্য চ কপিলস্য বাসুদেবা পরনাম্নঃ স্মরণাৎ।" অর্থাৎ—পুরাণাদি শাস্ত্রে অন্য এক কপিলের নাম শোনা যায়।

এইভাবে বিচারে চলেছে তিনজন কপিল নিয়ে। অগ্নির অবতার এক কপিল, দ্বিতীয় কপিল ব্রহ্মার মানসপুত্র, তৃতীয় কপিল বিষ্ণুর অবতার ও কর্দ্দম মুনির পুত্র। প্রথম কপিলের কথা আছে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে। দ্বিতীয় কপিলের উল্লেখ পাই মহাভারতে। তৃতীয় কপিলের নাম ভাগবতে উল্লিখিত এবং তিনিই নাকি সাংখ্য বক্তা।

বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ বলেছেন—খৃষ্টজন্মের ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ২৬০০ বছরেরও আগে কপিলের এই রচনা।

সাংখ্য ভাষ্যকারের মধ্যে গৌড়পাদস্বামী বলেছেন, ব্রহ্মার মানস-পুত্র কপিলই সাংখ্য-দর্শনের প্রণেতা। আবার ভাষ্যকার বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেছেন বিষ্ণু অবতার কপিলেরই রচনা এই সাংখ্য-দর্শন।

যাইহোক, প্রাচীন সে সাংখ্য-দর্শন প্রচারিত হয় ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত সাংখ্য-কারিকায়।

কণাদ পরমাণুবাদ মানলেও কপিল পরমাণুবাদ স্বীকার করেননি। তিনি বলেন, জগত সৃষ্টির মূল কারণ পরমাণু নয়—প্রকৃত কারণ পুরুষ ও প্রকৃতি। লাটিনেও বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ মহাশক্তি প্রকৃতিকে বলেছে procreatrix। তবে কপিল পরমাণুকে বলেছেন এই বিশ্বসৃষ্টি মূলশক্তির কেন্দ্র। আধুনিক বিজ্ঞানও বলেছে প্রায় সেই কথা। তাদের হচ্ছে সেই অনু পরমাণু। আর তাদেরই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ attraction & Repulsion হচ্ছে জগৎ উৎপত্তির মূল তত্ত্ব।

আজ ফলাও করে নানা বৈজ্ঞানিক বলেছেন বটে একথা, কিন্তু একথা জগতে প্রথম বলে গেছেন মহর্ষি কপিল। জগতের আদিম

দর্শন শাস্ত্রই হ'লো সাংখ্য-শাস্ত্র। তিনি বললেন—"রাগ বিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ।" আর তাই তো ঐ Ions ও Electrons এর attraction আর Repulsion. বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক বল্লেন অনুর মিলন ও বিচ্ছেদ।

পরমাণুকে মূল কারণ না বলে কপিল বলেছেন, আদিভূত মূল কারণ হচ্ছে এই প্রকৃতি বা এক মহাশক্তি। অনু-পরমাণ্ সেই শক্তির কেন্দ্র মাত্র। "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতের্মহান মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চ-তন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং, তন্মাত্রেভ্যঃ স্থুল-ভূতানি।" এই কপিলের সাংখ্যের মূল কথা। এর অর্থ করলে অনেকটা দাঁড়ায়—সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি —তা অনাদি ও অনন্ত। প্রকৃতি থেকেই ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক নিয়মে মহতের উৎপত্তি ও মহৎ থেকেই অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে পঞ্চতন্মাত্র ও সব ইন্দ্রিয়। আর তা থেকেই এই বিশ্বজগত। ভাবতে গেলে মনে হয় যে এই অনু-পরমাণু এল কোথা থেকে? যা থেকে এল সে তো এক অনাদি, অনন্ত, অজ্ঞাত অপূর্ব্ব শক্তি বটেই। তাকেই বলেন কপিল প্রকৃতি বা মহাশক্তি। তা থেকে ধীরে ধীরে জগতের সৃষ্টি। জগতের সর্ব্বদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ এই ২৭০০ বছর আগেকার কথা মেনে নিয়েছেন তাদের নিজের নিজের মতবাদে। যাঁরা বলেছেন পরমাণু, তাদেরও মানতে হবে ঐ পরমাণুর সৃষ্টিও তো এক মহাশক্তি থেকেই।

কপিল কোন সৃষ্টি-কর্ত্তা বা ঈশ্বর স্বীকার করেননি—এই অপবাদ দিয়ে অনেকেই তাকে নাস্তিক বলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কি সত্যই ঈশ্বর স্বীকার করেননি?

বৈজ্ঞানিক কপিল বললেন, "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"—ঈশ্বর অসিদ্ধ। ঈশ্বরকে তিনি ঝাপসা ঈশ্বর করে না রেখে, অব্যয় পুরুষ বলে পরিচিত করাতে চাইলেন। বল্লেন—"শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্"—তিনি শরীর প্রভৃতি থেকে, প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র, নিত্য ও

অব্যয় এক পুরুষ সাংখ্যশাস্ত্রের গোড়ায় এই কথায় ঈশ্বরতত্ত্বের স্বীকৃতি আছে।

সাংখ্য দর্শনের কথা জানতে হলে প্রথম জানতে হবে নামটির কথা। সংখ্যা থেকে সাংখ্য যদি বলতে হয় তবে সাংখ্য দর্শনের অন্য একটি নামকে মেনে নিতে হয়। সে নামটি হচ্ছে ষষ্টীতন্ত্র। ষাট প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায় যে শাস্ত্রে তাকে বলে সাংখ্য। আবার সংখ্যা মানে সম্যক জ্ঞান। সম্যক জ্ঞান ও তার উপায় আছে যে গ্রন্থে তাই সাংখ্য-দর্শন। এই সম্যক জ্ঞানের প্রথম কথাই সৃষ্টি। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের কথা বলতে গিয়ে, তাদের সৃষ্টি; প্রকৃতি ও তত্ত্বকথা বলতে গিয়ে কপিল সাংখ্যে সমস্ত বিচারের পদার্থকে নানা-ভাগে বিভক্ত করেছেন। বলেছেন—পুরুষ ও প্রকৃতি মূল উৎস হলেও প্রকৃতির বিকৃতি হয় নানা বিভাগে। যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের মূলে—পুরুষ, প্রকৃতি থাকলেও প্রকৃতির মধ্যে আছে তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়, স্থূলভূত শরীর, শরীরস্থ ইন্দ্রিয়, শারীর বায়ু, চৈতন্য, সংকার্যবাদ, উৎপত্তি, বিনাশ, জীব ও ঈশ্বর। তারপর প্রমাণ দিয়ে নিজের বক্তব্য সিদ্ধ করেছেন আর বুঝিয়েছেন—এই যে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি থেকে লয় পর্য্যন্ত সর্ব্ব দ্রব্যে, সর্ব্বত্র—এই বিষয়গুলি ছাড়া অন্য কোন বিভাগ নেই। নিরীশ্বর সাংখ্য এ বিচারের মধ্যে ঈশ্বর নিয়েও বিচার করতে পিছপাও হয়নি। প্রথমেই তিনি বললেন—

পুরুষ—শরীরের নাম পুর—সেই পুরে শায়িত থাকেন যিনি তিনি পুরুষ অর্থাৎ দেহের মধ্যে বিরাজমান যে অজ্ঞান তিনিই পুরুষ। তার কোন সৃষ্টি-কর্ত্তা নেই। তিনি অনাদি। তার কোন দেহ নাই, রূপ নাই তাই নিরবয়ব। তিনি সব তাতেই আছেন—আছেন সকলের মধ্যে, তাই সর্ব্বগত। তিনি সুখ দুঃখ এবং মোহকে উপলব্ধি করেন, তাই চেতন। তিনি সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণের অতীত তাই নির্গুণ। তাকে কেউ তৈরী করল না—আবার শেষও নেই তার, তাই তিনি নিত্য। তিনি সব প্রকৃতিকে ও প্রাকৃতিক

পদার্থকে দেখেন বলেই দ্রষ্টা। অথচ সব দুঃখ সুখই ভোগ করেন, তাই ভোক্তা—কিছুই করেন না তাই অকর্ত্তা। পুরুষে সম্ভব নয় ঐ প্রসবন, তাই তিনি অপ্রসবধর্ম্মী। বিভিন্ন শাস্ত্র এই পুরুষকেই বলেন—আত্মা, জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, ব্রহ্ম, অক্ষর, প্রাণী।

প্রকৃতি—পুরুষের পরই তিনি বলেছেন প্রকৃতির কথা। বলেছেন সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণ যখন সমান থাকে তখনই তো মূল প্রকৃতি স্থির। মূল প্রকৃতি বা মহাশক্তির কোন বিকার না থাকলেও তিনি বলেছেন—সৃষ্টি-পর্ব্বে প্রকৃতির কিছু বিকৃতি হয়। অর্থাৎ ঐ তিনটি গুণের কমবেশী হয়, আর তা থেকেই আসে সৃষ্টি। সৃষ্ট সব পদার্থের বিভাগ করেছেন চার ভাগে। কিন্তু মূল প্রকৃতিই গোড়ার কথা। তারপর প্রকৃতি-বিকৃতি, কেবল বিকৃতি আর অনুভয় রূপ অর্থাৎ পুরুষ। প্রকৃতির ২৫ রকম বিভাগ বা তত্ত্ব আছে কিন্তু যেমন মূল প্রকৃতি তার মধ্যে পড়ে না, তেমনই পুরুষও পড়ে না ঐ বিকৃতি বা তত্ত্বের মধ্যে।

তাহলেই মূল প্রকৃতি ও পুরুষ হল অবিকৃত আর তারপর এক একটি বিকৃতি বা তত্ত্ব সুরু হল নানাপ্রকার সৃষ্ট পদার্থে।

তৃতীয় কারিকার এ কথার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সে সব আলোচনা বড় জটিল ও কঠিন—সাংখ্য-শাস্ত্রের আদ্যোপান্ত আলোচনা না হলে তা বোঝা যাবে না।

মহত্তত্ত্ব—পুরুষ ও প্রকৃতি প্রথমে তিনটি গুণ নিয়ে থাকে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। তিনটির সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি'। 'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি'—এর একটির কম বেশী হলেই হবে বিকার। অথচ বিকার না হলে অন্য পদার্থের উৎপত্তি হবে কি ক'রে? পুরুষ ও প্রকৃতি যে যার সাম্য গুণ নিয়ে বসে থাকলে তো কোন সৃষ্টিই হবে না। এখন প্রথম বিকার এল সঙ্কল্পে। সৃষ্টি করতে হবে—চিন্তা এল মনে। মানুষের বেলাতেও তাই। সঙ্গমে তাই কাম, শিল্পীর মনে তাই অনুপ্রেরণা। মনের কামনার নামই ইচ্ছা। ঠিক পুরুষও

প্রকৃতির লীলা এই যে প্রথম বিকার তাও তার মন নিয়ে—তাই কপিল বললেন, "মহদাখ্যমাদ্য-কার্য্যং তন্মনঃ"—এই মনই হল মহত্তত্ত্ব।

ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র—ধর দুধ হল প্রকৃতি—লেবুর রসের অম্লত্ব হল মহত্তত্ত্ব বা বিকার। দুধে দিলাম লেবুর রস—হল ছানা আর জল। ছানা হল ইন্দ্রিয় আর জল তন্মাত্র।

মহত্তত্ত্ব বা মনের কামনা হল—এল অহংতত্ত্ব। "একাদশ পঞ্চ তন্মাত্রং তৎ কার্য্যম্।" মহত্তত্ত্ব থেকে জাত অহংতত্ত্ব। তারই কাজ হল একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র।

তাহলে আমরা যেমন প্রথম পেলাম পুরুষ ও প্রকৃতি, তেমনি পেলাম অবিকৃত তিনটি গুণ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণের আশ্রয়ের প্রভাব হল মনে—এই মনই হল দশ ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত একাদশ ইন্দ্রিয়। দশটি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় হল রজোগুণের প্রাচুর্য্যের বশীভূত। আর তন্মাত্র মানে কি? মানে হলো তৎ মাত্র অর্থাৎ "কেবল তাহাই।" এই যে অহংতত্ত্ব বা অহঙ্কার—এই যে 'আমি' রূপে সৃষ্টির কামনায় ত্রিগুণের আশ্রয়ে সৃষ্ট পদার্থ—'কেবল তাহাই' হ'লো তন্মাত্র।

পুরুষ ও প্রকৃতি ত্রিগুণের আশ্রয়ে সৃষ্টি করলো ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। এই পঞ্চতন্মাত্র দশ ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারাই সৃষ্টি সুরু।

স্থূলভূত—দর্শনে সহজে এসব কথা বলা হয়নি—বাহিরে স্থূলরূপে যার প্রকাশ, অন্তরে তাই সূক্ষ্ম।

তন্মাত্রের অন্য নাম ভূত সূক্ষ্ম ও অবিশেষ। তা থেকেই সৃষ্টি হয় স্থূলভূত। কপিল পঞ্চ তন্মাত্র বলতে গিয়ে এই কথাই বলেছেন যে ভূতসূক্ষ্মগণ চির সহবাসে পরস্পর অনুবিদ্ধ হয়ে পঞ্চ মহাভূত উৎপাদন করেছেন। শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র ও গন্ধ

তন্মাত্র থেকেই সৃষ্টি হ'লো পঞ্চ মহাভূত বা স্থূলভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। আর তাই তো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উপাদান।

শরীর—কপিলের মতে শরীরও তেমনি দুরকম—স্থূল ও সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম শরীর জন্মেছে আদি সৃষ্টির সময়—কেবলমাত্র মহত্তত্ত্ব থেকে সৃষ্টির আদি অবস্থায় থাকবে প্রলয় পর্য্যন্ত। তাই তো আত্মা। আত্মার সূক্ষ্ম শরীরের বিনাশ নেই। স্থূল শরীর—স্থূলতঃ যা আমরা দেখি, যার শেষ আছে। অতএব এ স্থূল শরীর যখন আগুনে পুড়ে শেষ হয়, সূক্ষ্ম থাকে অবিকৃত। তাই তার নাম লিঙ্গ শরীর

এই দেহের আবার ভেদ আছে—(১) দেব জাতীয় শরীর—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ। এই ভেদ হলো আট রকমে (২) তির্য্যক জাতীয়—পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর। এ ভেদ পাঁচ রকমের।

প্রথম আট রকমের পর দ্বিতীয় পাঁচ রকম উৎপত্তি—তারপর এল মানুষ। মানুষের মধ্যে বর্ণ বিভাগ প্রাকৃতিক নয়—কাল্পনিক গুণকর্ম্ম অনুসারে।

ইন্দ্রিয়—দর্শন বলেছে ইন্দ্রিয় এগারটি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তন্মধ্যে—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক দ্বারা দেখা, শোনা, ঘ্রাণ নেওয়া, স্বাদ নেওয়া আর স্পর্শ করার কাজ হয়।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। এ দ্বারা আমরা কথা বলি, গ্রহণ করি, ভ্রমণ করি, মলাদি ত্যাগ করি আর প্রজনন করি।

এ দশটির অতীত যা তাই মন—একাদশ ইন্দ্রিয়।

শারীর বায়ু—কপিল বলেন, দেহে যে বায়ু আছে তা চালায় তিনটি জিনিস। খাঁচার পাখী যেমন ছট্‌ফট্ করে, দোল খায়—খাঁচা তেমনই দোলে। দেহস্থ ত্রিতয় বা মন, বুদ্ধি অহঙ্কার যেমন দোল খাওয়ায়, দেহ তেমনি দোল খায়। অন্তঃকরণের ত্রিতয়ের দোলে প্রাণে

পাঁচ রকমের দোল আসে বা দেহ পঞ্চবায়ু বেগের অধীন হয়। এই পঞ্চ প্রাণবায়ু হচ্ছে—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। (ব্রাহ্মণরা প্রতিদিন 'অন্ন' দ্বারা বায়ুর সাম্য বজায় রাখতে এই পঞ্চ গ্রাসে পঞ্চ বায়ুর স্মরণ করে)।

চৈতন্য—কপিল বার বার বলেছেন—চৈতন্য শরীরের আগন্তুক গুণ নয়। শরীর তার অভিব্যক্তি স্থান নয়। মানুষের দেহে বা মনে যে গুণের লক্ষণ তা চৈতন্য নয়। উপমা দিয়েছেন—চাল বা গুড়ে মদ-শক্তি আছে, সে শক্তি আগন্তুক গুণ—চৈতন্য নয়। কিন্তু হলুদ আর চূণ মেলালে লাল হয়। এ গুণ দু'টা জিনিসের মধ্যেই ছিল—হলুদে লালত্ব ছিল, চূণ সংযোগে তা ব্যক্ত হলো মাত্র। এই যে লোহিতত্ব এই হলো চৈতন্য—গুণের সংযোগে তা হল ব্যক্ত চৈতন্য উৎপত্তি হয় না—আগন্তুক নয়—দেহে সে আছে অব্যক্ত হয়ে। কার্য্য বা গুণ বিশেষে তা ব্যক্ত হয়।

সৎকার্য্যবাদ—যা অসৎ তা করা যায় না। কার্য্যতঃ তেল করা যায়। কিন্তু তেল করতে হলে নিতে হবে তিল—বায়ু নিলে হবে না। অতএব তেল করতে হলে, তেলের সৎকার্য্যবাদ হবে তিল সংগ্রহ। বায়ু সংগ্রহ করলে হবে অসৎকার্য্যবাদ।

উৎপাদকের গর্ভে অব্যক্ত আকারে যে জিনিস আছে তার বিষয় জ্ঞান সংগ্রহ করলে তবে উৎপাদন উৎপাদিত জিনিস হবে সফল! এইটুকুই সৎকার্য্যবাদ।

উৎপত্তি—অব্যক্ত যা তা ব্যক্ত হওয়াই উৎপত্তি।

বিনাশ—উৎপাদিত জিনিস যখন অবস্থান্তরে লুপ্ত হয়—তাই হল বিনাশ। এই উৎপত্তি আর বিনাশই জন্ম ও মৃত্যু।

জীব—পুরুষ প্রতিচ্ছায়াপন্ন সূক্ষ্ম শরীর সংযুক্ত দেহ ধারীই জীব।

ঈশ্বর—আগেই বলেছি সাংখ্যকার কপিল ঈশ্বর মানেন না—এই কথাই প্রায় সবাই বলেন। সকলে বলেন কপিল নাস্তিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি পরমাত্মা বা পরা শক্তিতে অবিশ্বাসী ন'ন

—তবে তিনি বলেন, সৃষ্টি হলো পুরুষ ও প্রকৃতির কাজ। 'ঈশ্বর' শব্দটি একটি কল্পিত শব্দ।

প্রথম অধ্যায়ে ৯২ সূত্রে কপিল বললেন, "ঈশ্বরাসিদ্ধে"—অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ বা অপ্রমাণিত। ভাষ্যকার বললেন—এটা তর্কের খেই ধরতেই বলা। কিন্তু সম্ভবত তা নয়। আমরা যেমন ব্রহ্মা বিষ্ণুর মতন একজন মুখ চোখওয়ালা ঈশ্বর ভাবি, তিনি তা ভাবেননি। পঞ্চম অধ্যায়ের পর পর কয়েকটি সূত্রে কথাটা আরও পরিষ্কার হয়েছে। তাৎপর্য্য ধরলে বলতে হয়—

১। ঈশ্বরের জন্য কিছু হয় না, হয় কর্ম্মের জন্য।

২। ঈশ্বর যদি নিজের খেয়ালে বা স্বার্থে কিছু করেন তবে তো তিনিও খেয়ালী, স্বার্থপর ও সংসারী।

৩। 'ঈশ্বর' শব্দটি একটি পরিভাষা।

৪। রাগ বা কামনা না থাকলে সৃষ্টি হয় না—ঈশ্বর যদি স্রষ্টা তবে তিনি রাগ বা কামনার অধীন।

৫। প্রমাণ না থাকলে অস্তিত্ব মানা যায় না—তাই ঈশ্বর অসিদ্ধ।

৬। শ্রুতিতেই জগতকে এক প্রাকৃতিক গঠনের ফল বলা হয়েছে।

তবে সম্পূর্ণ সাংখ্য আলোচনায় মনে হয়, কপিল নিত্যেশ্বর নাস্তিক ছিলেন। কপিল যেমন স্বীকার করেছেন যে, এক অজ্ঞেয় পুরুষ আছেন, আছেন এক মহাশক্তি তেমনি স্বীকার করেছেন পূর্ব কল্পের প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত জীবই আবার পরকল্পে ঐশ্বর্য সম্পন্ন হয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র প্রভৃতি নামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

প্রমাণ—এই সব আলোচনায় প্রমাণরূপেই কপিল প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনরকম প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। এই সব প্রমাণের উপর ভিত্তি করেই সম্পূর্ণ সাংখ্যশাস্ত্র রচনা করে তিনি সৃষ্টিতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, সুখ-দুঃখবাদ, পুরুষ ও প্রকৃতির পরিচয়

করিয়েছেন—আর তা করতে গিয়ে তিনি ষাটটি পদার্থের আলোচনা করেছেন। সাংখ্য বা ষষ্ঠীতন্ত্রের সেই ষাটটি পদার্থ হচ্ছে—পুরুষ প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, সত্ত, রজ, তম, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, ভূত এই দশটির কথা; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ নামক ৫টী বিপর্য্যয়; একাদশ ইন্দ্রিয়ের বৈকল্যজনিত আসক্তি, সপ্তদশ বুদ্ধিজনিত আসক্তি এই মোট ২৮টি আসক্তি, আধ্যাত্মিক তুষ্টি ৪ ও বৈষয়িক বাহ্যিক তুষ্টি ৫ এই নয়টি তুষ্টি এবং আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, দুঃখ নিবারণাদি, শব্দ অধ্যয়নাদির বা সুহৃদ্‌প্রাপ্তি বা দানাদির আট রকম সিদ্ধি—মোট এই ষাটটি বিষয় নিয়ে বিচার করে বিশ্বের প্রায় সর্ব্ববিষয় প্রমাণিত মীমাংসা দিয়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের আলোচনা করে মোক্ষ পথের সন্ধান বলেছেন। সাংখ্যের মূল এই যে—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনগুণে জাগতিক বা মানসিক সর্ব্ব-পদার্থের সৃষ্টি; পুরুষ বা চৈতন্যকে এই দিয়ে বেঁধে রাখার যে দড়ি তাই গুণ। সত্ত্ব লঘু কিন্তু দীপ্ত ও প্রীতিমূলক, রজঃ—চঞ্চলস্বভাব ও দুঃখমূলক, তমঃ—গুরু, আবরক ও মূঢ়তা মূলক এই তিনটি গুণ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে অর্থাৎ সমান থাকে তাই হল প্রকৃতি। যখন এই সাম্যাবস্থা ভেঙ্গে সত্ত্বগুণ প্রবল হয় তখনই সৃষ্টি হয় সুরু। সৃষ্টির সেই প্রথম স্তবকেই বলা হয় বুদ্ধি বা মহৎ। তা থেকে সুরু হয় মহত্তত্ত্ব। প্রাকৃতিক গুণে যে সৃষ্টি সুরু হয়, তার মধ্যে এই বুদ্ধি প্রথমে দেখা দেয় বলেই তা হয় কারণ-বুদ্ধি আর ক্রমে সেই বুদ্ধির প্রকাশ হলেই তাকে বলে কার্য্য-বুদ্ধি। সেই কার্য্য বুদ্ধি সত্ত্বগুণে দেখা শোনা কাজ সব সুরু করে। রজঃগুণের আধারে বাক্, পাণি, উপস্থের কাজ সুরু হয়। সত্ত্ব ও রজঃ উভয়গুণের তুল্য বুদ্ধিতেই অভিব্যক্ত হয় মন, তমোগুণের বুদ্ধিতে হয় অহঙ্কার, আর তা থেকে—আদি কারণ পঞ্চ তন্মাত্র আর সেই পঞ্চতন্মাত্র থেকেই সৃষ্ট হয় পঞ্চমহাভূত, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম। এই পঞ্চ-মহাভূতের মধ্যে যে পরমাণু আছে তা বাহ্যত পঞ্চতন্মাত্রে না থাকলেও অলক্ষ্যে থাকেই।

বেদান্ত দর্শন

ষড়-দর্শনের চরম ও পরম শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই বেদান্ত দর্শন। সমগ্র উপনিষদের তাৎপর্য্য নিয়ে ঋষি বাদরায়ণ এই সূত্রগ্রন্থ লিখেছেন। 'ব্রহ্ম' নিয়েই সে সূত্রমগুলি—তাই গ্রন্থের অপর নাম 'ব্রহ্মসূত্র'। ব্যাস লিখিত ব্রহ্মসূত্র বা উত্তর মীমাংসাই বেদান্ত দর্শন বটে তবে এই ব্যাস ও বাদরায়ণ একই ব্যক্তি কিনা কে জানে? তবে 'ব্রহ্মসূত্র' অত্যন্ত কঠিন এবং ছোট ছোট সূত্রে বিরাট মহাবাক্য গ্রথিত করা খুবই জটিল। তাই বহু মনীষী ও ব্রহ্মর্ষি এই ব্রহ্মসূত্রের নানা রূপ ব্যাখ্যা করায় বেদান্ত দর্শন নানাভাবে গড়ে উঠেছে। যার মধ্যে আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যই শ্রেষ্ঠতম বেদান্ত দর্শন বলে খ্যাত।

মূল ব্রহ্মসূত্র ৫৫৭টি সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। তার প্রথম সূত্রই হচ্ছে "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। ব্রহ্ম কি—এই মহা-জিজ্ঞাসার উত্তরেই বাদরায়ণ এই গ্রন্থ গ্রথিত করেন।

মূল-গ্রন্থে চারটি মাত্র অধ্যায়—সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল।

প্রতি অধ্যায়ের চারটি পাদ—মোট ১৬টি পাদে ৫৫৭ সূত্র।

সমস্ত রকম বিরোধ ঝেড়ে ফেলে—শ্রুতি-সমূহের অর্থ ও বক্তব্য নিয়ে ব্রহ্মে তা সমন্বয় করান হয়েছে এর প্রথম অধ্যায়ে—তাই তার নাম সমন্বয় অধ্যায়। এই সমন্বয় অধ্যায়ের প্রথম পাদ নানা গ্রন্থের অস্পষ্ট ব্রহ্মবাক্যের সমন্বয় করে 'ব্রহ্মের' তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করেছে। দ্বিতীয় পাদে উপাস্য ব্রহ্মবাক্যের সমন্বয় হয়েছে। তৃতীয় পাদে হয়েছে ধ্যেয় ব্রহ্মবাক্যে যা কিছু অস্পষ্টতা তার খণ্ডন, আর চতুর্থ পাদে আছে অব্যক্ত বা সন্দেহযুক্ত ব্রহ্মার্থের বিচার ও নির্ণয়।

অবিরোধ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাংখ্যাদি স্মৃতির মতের সহিত আপন বক্তব্য ব্রহ্ম সমন্বয়ের বিরোধের মীমাংসা করা হয়েছে। সেইসব স্মৃতিতে যে সব ভুল অর্থ বা আরোপ আছে তা বোঝান হয়েছে। তৃতীয় পাদে মহাভূত ও জীব বলতে কি বোঝা উচিত ও অন্যান্য স্থানে কি ভাবে ভুল বোঝান হয়েছে তারই

আলোচনা চলছে, আর চতুর্থ পাদে স্মৃতি-শ্রুতির অন্যান্য সব বিরোধ ও আপত্তির খণ্ডন করা হয়েছে। সাধন নামক তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে পাপ-পুণ্যের ফল দেখিয়ে বৈরাগ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে, দ্বিতীয় পাদে শ্রুতি ও স্মৃতিতে "তত্ত্বমসি" বলতে যে ভুল অর্থের আরোপ তার খণ্ডন হয়েছে। তৃতীয় পাদে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের বিচার ও সগুণ ব্রহ্ম-উপাসনার জন্য যে সব গুণ তারই সংকলন ও নির্গুণ উপাসনার অর্থ নির্ণয় করা হয়েছে। চতুর্থ পাদে রয়েছে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা। তার বহিরঙ্গ সাধন, যাগযজ্ঞাদি ও নিষ্কাম আশ্রম-ধর্ম্ম ও অন্তরঙ্গ সাধন, শ্রবণ, মনন ও নিধিধ্যাসন প্রভৃতি নিরূপিত হয়েছে।

চতুর্থ ফলাধ্যায়ে—প্রথম পাদে উপাসনা ও সাধনা দ্বারা সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের উৎপত্তি ও জীবমুক্তির উপদেশ আছে। দ্বিতীয় পাদে মুমূর্ষুদিগের প্রাণ-বিয়োগের পর বিভিন্ন গতির কথা, তৃতীয় পাদে ব্রহ্মোপাসকদের দেবযান-গতি এবং চতুর্থ পাদে নির্গুণ মুক্তির কথাই বর্ণিত হয়েছে। সাধারণতঃ চারটি অধ্যায়ের এই বিষয়গুলি দেখলেই বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য কি তা বোঝা যায়। এখন কয়েকটি সূত্রের অনুবাদ দেখলে হয়তো জিনিসটা আরও স্পষ্টতর হবে।

প্রথমসূত্র—"অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—অনন্তর তাই ব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্ম কি জানবার ইচ্ছা হওয়া প্রত্যেকের স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় সূত্র—জন্মাদ্যস্য যতঃ—জন্ম স্থিতি লয় এই সবের যাহা হইতে সৃষ্ট, যাহার কৃপায় স্থিতি ও যাহাতে লয় তাহাই ব্রহ্ম।

তৃতীয়সূত্র—তত্তু সমন্বয়াৎ—তাতেই সব কিছুর সমন্বয়। এর প্রতিটি শব্দের মধ্যে নানা কথা, নানা বিচার, নানা আলোচনা লুকিয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা অমনি হয় না—সে ইচ্ছাও তো সাধারণ নয়—অসাধারণ সে ইচ্ছা প্রতি মানুষের আসে না—তবে আসে যে কখন কার কি ভাবে এই নিয়েই তো কথা। শম, দম, বৈরাগ্যাদিগুণের

সমন্বয় হলে তবে না ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার জন্য মন হবে উতলা। এখন এই গুণের বিচার প্রয়োজন। যা জানতে চাইলেন সেই ব্রহ্মের বিচার —প্রথম সূত্র নিয়ে ঐ বিরাট আলোচনা চললো।

অমনি নানাদর্শনের আপত্তি হল। "ব্রহ্ম হইতেই জগত।" একথা শুনেই সাংখ্য বলবে ভুল—জড়স্বভাব প্রকৃতি জগত-সৃষ্টির কারণ। ন্যায় ও বৈশেষিক বলবে পরমাণুই জগতের উৎপত্তির কারণ। জগত-সৃষ্টির অন্য সব কারণই বলেছেন অন্যান্য দর্শন। আধুনিকরাও তাই বলবে, নব্যবিজ্ঞানও তাই বলবে, তবে বেদান্তের একথা মানবো কেন? বেদান্তকার তাই খুলে বসলেন বিরাট পুঁথির অসংখ্য পাতা—"এই ব্রহ্ম হইতে জগত"—এইটুকু বোঝাতে এবং শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বমত খণ্ডন করে তা বোঝালেন। আর তাই বেদান্ত দর্শনের নানা ভাষ্য হলেও অন্যান্য দর্শনের কথা যেমনই ভাষ্যকারের মনে ধাক্কা দিয়েছে—তাঁরা বানচাল হয়ে এদিক ওদিক চলে গেছেন—কেবল শঙ্করই একভাবে অটল হয়ে অদ্বৈতবাদকে ধরে রইলেন। আজ আচার্য্য শঙ্করের কৃপায় ও পাণ্ডিত্যে বেদান্ত দর্শন সারা বিশ্বে হিন্দুজাতির গৌরব প্রচার করে চলেছে। আর তাই প্রফেসর হপকিন্স বলেছেন—Thales ও Parmenides এর ব্যাখ্যা ও সকলপ্রকার দার্শনিক চিন্তার ও তত্ত্বের সঙ্গে হিন্দু দার্শনিকগণ বহুপূর্ব্বে পরিচিত ছিলেন। গ্রীক Eleatic দর্শন যেন উপনিষদেরই ছায়া। খুব সম্ভব Anaxamendar ও Heraclitus এর দার্শনিক মত ভারতবর্ষের নিকট সম্পূর্ণ ঋণী। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের মত—বেদান্ত-দর্শন অতুলনীয়।

ফ্রেডারিক শ্লিগেল লিখে গেছেন—বেদান্ত প্রতিপাদ্য জীব ও ব্রহ্মের একত্ববাদ মানুষকে সংসারের ঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্যেও তাহার প্রকৃত স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব ও অমরত্বলাভে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেছে। ভারতীয় দর্শনের সহিত তুলনায় পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশরূপ গ্রীকদর্শনও মধ্যাহ্ন সূর্য্যের সম্মুখে নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ শিখার ন্যায় হীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

সেই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য মূল বিষয় হচ্ছে অদ্বৈতবাদ। শুদ্ধ দ্বৈতবাদ বলবে ব্রহ্ম থেকে জীব ও জগত উভয়ই পৃথক। জীব ও জগত অতিরিক্ত তত্ত্ব ও সত্য, কিন্তু অদ্বৈতবাদ তা বলে না। সে বলে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এক ছাড়া কিছু নেই। এই ব্রহ্মই অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী। নাম ও রূপযুক্তা এই জগতের পারমার্থিক সত্ত্বা নেই—তাহার ব্যবহারিক সত্তামাত্র আছে। এরই একটু অদল-বদল হ'লো—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। সে মতে ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের কোন ভেদ না থাকলেও স্বগতভেদ আছে। যেমন গাছ এক, কিন্তু তার ডাল-পাতা-ফুল পৃথক পৃথক। সব মিলিয়ে কিন্তু গাছ। তেমনই ব্রহ্ম এক জগতের অন্যান্য সব স্বগতভেদ।

তারপর হল নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদ—শঙ্কর ব্যতীত কেউ আর এই নির্ব্বিশেষাদ্বৈত হৃদ্গত করেন নি। তিনি বলেন যে—ব্রহ্ম একরূপ, এক রস, ও এক। তাতে কোন রকমের বিশেষ কোন ভেদ নেই। আমি, তুমি, তাহা, ইহা এসব প্রতিভাস মাত্র অর্থাৎ আত্মভ্রান্তি। ব্রহ্মই মূলতত্ত্ব, এই বিশ্ব মিথ্যা—মায়া-প্রতিভাস।

এবার একটু আমাদের মতন সহজ কথায় সাধারণ ভাবে জিনিসটা ভাবা যাক।

আমার বাড়ী, গাড়ী, সন্তান রইল—আমি বুড়ো হলাম—ছেলে বৈজ্ঞানিক—চোখের সামনে যন্ত্র, কলকব্জা। এল মৃত্যু—আমার কাছে সব মিছে হয়ে গেল। যদি ভাবি আমিই কি শুধু যাব? ঐ বৈজ্ঞানিক সন্তান? ওকি থাকবে অমর? না, সেও যাবে—তার সন্তান?—সেও যাবে—ঐ বৈজ্ঞানিক কলকব্জা একদিন শেষ হবেই। ভূমিকম্প দেশকে ভেঙ্গে চুড়ে দেয়—প্লাবন সব যন্ত্রপাতির চিহ্ন মিটিয়ে দেয়—চোখের পলকে লাখটাকার বাঁধ ধুয়ে মুছে যায়—পদ্মার ভাঙ্গনে বড় বড় গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়—সাগরের গ্রাসে মরুভূমি জলময় হয়, আবার সাগরের পিছু টানে হিমালয় মাথা উঁচু করে। রামের রাজ্য থাকে নি, থাকে নি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন—থাকে নি হস্তিনাপুর—টেঁকে নি

পাঠান মোগল—আমাদের পূর্ব্বপুরুষ গত—আমি যাব—পরবর্ত্তী পুরুষও লীন হবে মহাকালের কোলে

এই তো বেদান্তের মূল কথা। যখন যাবে তখন তা মিথ্যা—মায়া। সব গিয়েও যে শক্তি টিকে থাকবে আবার প্রকৃতির সাহায্যে সব গড়তে—তিনিই 'ব্রহ্ম।' তাই ব্রহ্মেই সব সৃষ্টি—ব্রহ্মেই স্থিতি আবার ব্রহ্মেই লয়। একথা বলেছেন বেদান্ত, কিন্তু বিপক্ষে যাঁরা বলেছেন তাঁরাও বড় বড় দার্শনিক, মহর্ষি—জ্ঞানবৃদ্ধ, তাই তাঁদের মত খণ্ডন করতে প্রয়োজন হয়েছে কঠিনতর যুক্তির। মুক্তির সেই যুক্তি, মোক্ষের সেই মন্ত্রই—বেদান্ত-দর্শন।

আচার্য্য শঙ্কর হতেই সেই সব কঠিন তত্ত্বকথা সরল ভাষ্যে, অর্থে ও ভাষ্যকারের মহিমায় হিন্দুসমাজে উজ্বল হয়ে রইল যুগের পর যুগ। তাঁর কৃত শারীরক ভাষ্য—তাঁকে চিরদিনের জন্য অমর করে রাখবে। আচার্য্য শঙ্করের আগে বোধায়ন মুনি ও আচার্য্য উপবর্ষ (পাণিনির অধ্যাপক) এর ভাষ্য করেন। তাঁরা যে কোন্ মতাবলম্বী ছিলেন তা ঠিক জানা না থাকলেও রামানুজ স্বামীর ভাষ্যে বোঝা যায় যে বোধায়ন ও উপবর্ষ ছিলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী

সে যুগে নানা মত ও পথে বেদান্ত-তত্ত্ব যখন গভীর বিচারের বস্তু হয়ে দাঁড়াল, যখন বহু বিভিন্ন মতে হ'ল তার ব্যাখ্যা, ভাষ্য-ও টীকা তখন আচার্য্য শঙ্করই তাঁর নিজ অদ্ভুত বিচার শক্তিতে ভিন্ন মতবাদ খণ্ডন করে, নিজ অদ্বৈতমত স্থাপন করলেন।

তাঁর মতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ—নিত্য, সত্য এবং অদ্বিতীয় নির্গুণ ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্তা—সুতরাং জীব, জগত তারই অন্যরূপ। ব্রহ্ম থেকে অতিরিক্ত কিছু নয়—একান্তই অভিন্ন।

জগতের মহাপ্রলয়ের অবস্থায় যে মায়া ব্রহ্মের মধ্যে লীন থাকে তাই পরে প্রভাবান্বিত হয়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তারূপে সগুণ ঈশ্বর হয়ে প্রতীয়মান হয়। তখন যেন ঐ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বলেন, "একোঽহং বহুস্যামঃ"—এক আমি, এবার বহু হ'ব। হব জগত, হব জীব,

হব মানব, প্রাণী, বস্তু। তারপর আবার নিজ মায়া প্রভাবে যা সৃষ্টি করেন তাতেই থাকেন লুকিয়ে। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—এই অঘটন ঘটনপটীয়সী প্রকৃতিরূপা মায়া তখনই শেষ হয় যখন জীবের ব্রহ্মজ্ঞান হয়—যেমন দড়ি চিনলে সাপের ভয় শেষ হয়। এই সমস্ত জগত ত্রিগুণময়ী মায়ার অধীন—সত্ত্ব, রজঃ ও তমে তা পূর্ণ। সেই মায়ার আবার দুটি শক্তি—আবরণ ও বিক্ষেপ।

শঙ্করের ভাষ্যের উপর 'ভামতী' টীকা লেখেন বাচস্পতি মিশ্র। সে টীকার টীকা কল্পতরু, তার টীকা পরিমল, তার টীকা আভোগ।

শঙ্কর শিষ্য পঞ্চপাদিকা টীকা লেখেন। তারপর সর্বজ্ঞাত্ম মুনি লেখেন শঙ্করভাষ্যের তাৎপর্য্য—নাম তার সংক্ষেপশারীর। মণ্ডনাচার্য্য লেখেন—ব্রহ্মসিদ্ধি। সুরেশ্বর লেখেন বার্ত্তিক।

এরপর প্রসিদ্ধ ভাষ্য হচ্ছে—শ্রীভাষ্য—আচার্য্য রামানুজের লেখা। মোটামুটি তাও অদ্বৈতবাদের অনুসরণ। একটু বৈষম্য এই যে—সে মত বলে, সাগর যেমন এক, তার তরঙ্গ, ফেন এসব পৃথক হলেও সাগরের অঙ্গ—তেমনই ব্রহ্ম এক হলেও তার তরঙ্গ আছে ফেন আছে। ব্রহ্ম থেকে জগত পৃথকও বটে, আবার একও বটে।

দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত মাদ্রাজে শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের মধ্যে আচার্য্য রামানুজের দার্শনিক মতবাদই প্রচলিত। শ্রীমৎ রামানুজ আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ স্বীকার করলেও জীব ও ব্রহ্ম একই এ স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন জীব ব্রহ্মেরই অংশ বটে কিন্তু জীব ব্রহ্ম স্বরূপ নয়। শ্রীভাষ্যে তিনি বলেছেন জীব ও জড়ে পরিপূর্ণ এ জগত মিথ্যা মায়া নয়। ব্রহ্ম সগুণ—তিনি অনন্ত কল্যাণ ও গুণের আকর। তিনি একাধারে সমস্ত তেজ, বল, জ্ঞান, বীর্য্যের আকর—তারই কণামাত্র আনন্দশক্তি দ্বারা তিনি সমস্ত জীবকে ধারণ করে আছেন। ব্রহ্ম সবিশেষ অর্থাৎ নিজের শক্তি দিয়ে শুদ্ধ চিৎ, চিদাচিৎ ও অচিদ্‌রূপে প্রকাশমান। এই শুদ্ধচিৎ পরমেশ্বর। পরমেশ্বর চিদ্‌ঘন আর জীব চিৎকণা মাত্র। চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব

ও জড় সবই ঐ শুদ্ধচিৎ এর অংশ বা পরমেশ্বরের শরীর। এই যে পরমেশ্বর কল্পনা এ থেকেই ভক্তির প্রবাহে বোধ হয় এল তার ব্রহ্মে দেবজ্ঞান—অবতারে পরমেশ্বরের কল্পনা। তাই রামানুজ বলেন ঈশ্বর প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না। শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা দ্বারা তার স্বরূপ বুঝতে হয়।

রামানুজের পর মধ্বাচার্য্য লেখেন বেদান্ত সূত্রের উপর চারখানি গ্রন্থ। তা ছাড়া মহাপণ্ডিত ছিলেন তিনি, বহু গ্রন্থই লিখে যান। তিনি অতি প্রবল যুক্তি ও তর্কে শঙ্করের অদ্বৈত মত, তাঁর মায়াবাদ এবং ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্যবাদ খণ্ডন করেন। তাঁর মতে ঈশ্বর ও জীব স্বতন্ত্র। এবং জীবের একমাত্র মুক্তি ও পথ ঈশ্বরের ভক্তি। তিনিও বাসুদেবে ব্রহ্মস্বরূপ দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মতেও তরঙ্গ যেমন সমুদ্রের অংশ—স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, তেমনই জীবও ব্রহ্মেরই এক অংশ—তারই স্ফুলিঙ্গ। তারপর নিম্বার্ক লেখেন—বেদান্ত পারিজাত সৌরভ নামক ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য। তাঁর মত দ্বৈতাদ্বৈত মত নামে প্রচারিত। শ্রীনিম্বার্ক স্বামী বলেন, ব্রহ্ম অদ্বৈত—কিন্তু তা থেকেই দ্বৈতরূপে এসেছে তাঁর চারটি প্রকাশ—অক্ষর, পরমেশ্বর জীব এবং জড়। ব্রহ্ম গুণী, জগত গুণাত্মক।

এরপর কেশব ভারতী প্রভৃতি নানা গ্রন্থের পর আমরা পাই বল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। তিনি বললেন, ব্রহ্ম নির্গুণ নন—তিনি সর্ব্বগুণের আধার। তিনি কর্মফলের বিধাতা। তাঁর গ্রন্থে ভক্তি-বাদই চরম কথা। এমন কি তিনি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকেই পরমব্রহ্ম বলে স্বীকার করে গেছেন। তারপরই অভ্যুদয় শ্রীচৈতন্যের—সর্ব্ব-দর্শনের সার জেনেও তিনি আপনার গ্রন্থ সবই গুরু মহিমা বর্দ্ধনে বিসর্জন করেন।

এ ছাড়াও ভারতীয় বহু পণ্ডিতই বেদান্তদর্শনের উপর নানা ভাষ্য বা গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। অনেকের হয়তো শুনতে ভাল লাগবে না—আমাদের বেদ বা উপনিষদ যে রকম প্রাচীন বা অপৌরুষেয়

গৌরবে গৌরবান্বিত ষড় দর্শনের প্রত্যেকটি তত প্রাচীন নয়। বেদ ও উপনিষদের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য করতে গিয়েই ষড়দর্শন। আবার তাকে বোঝাতে গিয়েই আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতির নানা বেদান্তদর্শন। সবই সেই দেবতাদের যুগে বা প্রাচীন ভারতের সেই রামরাজত্বের আগে বর্ণিত হয়নি—মূল বেদ আদি বটে, কিন্তু তারপর নানা হিন্দু শাস্ত্র ছড়িয়েছে যুগ যুগ ধরে প্রয়োজনে ও পরিবেশে রূপান্তরিত হয়ে।

অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন আর্য্যসন্তান যেদিন ভারতে এলেন বেদ-গান কণ্ঠে নিয়ে—সেদিন হয়তো তাদের উপনিবেশ তৈরী হয়নি—তৈরী হয়নি সমাজ, তাই শুধু প্রার্থনা আর মন্ত্র। প্রকৃতির রূপে ও রাগে সে মন্ত্র পল্লবিত। তারপর সমাজ হল—তাই হল নিয়ম। নিয়মে এল অনুষ্ঠান, যাগ, যজ্ঞ।

বেদের অদ্বৈত পরব্রহ্ম যেন অনুষ্ঠানের আসনে এসে নানা রূপ ধরতে চাইলেন।

গর্জে উঠলো একদল—বললে, চলবে না—ব্রহ্ম এক, অন্য কিছু করার নেই আমাদের—জ্ঞানই সব।

আর একদল বললে—না, কর্মের প্রয়োজনে যাগ, যজ্ঞ, মন্ত্র, প্রার্থনা এ সবই দরকার—দেবতার তৃপ্তিও কল্যাণের, জন্য। কিন্তু কে সে? নিত্য কি? কে সেই মূল? জন্ম হল সেই বিচার থেকে সাংখ্য দর্শনের—এল তারপর ন্যায় দর্শন—এল বিশেষকে চিনিয়ে দিতে বৈশেষিক দর্শনের পরমাণুতত্ত্ব।

আবার পুরোপুরি হিন্দুধর্মের কাঠামো নিয়েই অন্যরূপে অন্যছন্দে—অন্য মত ও অন্য পথ ধরে এল জৈন মত, বৌদ্ধ মত। যা ভারতীয় হিন্দুধর্মের শাখা হয়েও অন্য ধর্ম রূপে বিঘোষিত হল। গোঁড়া হিন্দু যারা তারা সইতে পারলো না—বললে, ওসব নাস্তিক দর্শন। তাই জৈন দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনকে ভুল প্রতিপন্ন করতেই উদ্ভূত হল আবার অন্য দর্শন—তারই সূক্ষ্ম বিভিন্ন সংগ্রহ নিয়ে এই বেদান্ত দর্শন। বেদান্ত দর্শন এ যুগেরই লেখা।

যাই হোক দর্শনাদির নানা তথ্য ও ইতিবৃত্ত ইতিমধ্যে যেভাবেই নিরূপিত হোক না কেন—কপিলের সাংখ্যদর্শন খৃষ্ট-জন্মের ৭০৯ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হলেও, মনে হয় পতঞ্জলি প্রভৃতি দার্শনিকগণ কিন্তু তাদের মতবাদ প্রচার করেছেন জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের পরবর্ত্তী কালে। তবে কালাকালের প্রশ্ন না তুলে এটা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বেদ ও উপনিষদের সারভূত এই 'বেদান্ত'। ব্রহ্ম ও জড়জগত নিয়ে ঋষিরা যখন বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন—ব্রহ্ম থেকেই জগত, না জগত এক পৃথক সত্তা—এরই মীমাংসার ফলে উৎপত্তি হলো দর্শন শাস্ত্রের।

ভিন্ন মত ও ভিন্ন বিচারগুলি প্রায়ই ছিলো আস্তিক-ধর্ম্মোচিত জ্ঞানে প্রবুদ্ধ—তার প্রতিবাদে এল জৈন ও বৌদ্ধদর্শন এবং চার্বাক দর্শন। সে সব দর্শনকে আস্তিকরা বল্লেন, নাস্তিক দর্শন। তারপরেই প্রয়োজন হলো এমন দর্শনের—যা সকল মীমাংসাকে খণ্ডন করতে সমর্থ হ'লো—তাই বেদান্ত দর্শনের আবির্ভাব।

আস্তিক দর্শন—বেদকে প্রামাণ্য মেনেই তাঁদের যা মত তাই ব্যক্ত করেছেন। আর নাস্তিক দর্শন অর্থাৎ চার্ব্বাক, জৈন বা বৌদ্ধ-দর্শন তা মানেনি।

চার্ব্বাক দর্শন

অনেকের ধারণা যে চার্ব্বাক এক হিন্দুঋষি। ঋষি তো বটেই—তিনি মনীষি এবং মহাপুরুষ। নইলে মতবাদের স্বীকৃতি এতদিন ধরে চলে আসে কি করে? চার্ব্বাক কথাটার মানে কিন্তু—চারু ও বাক্ অর্থাৎ সুন্দর কথা। অথচ চার্ব্বাক বলতেই আমরা একজন দুর্ম্মুখ ঋষিকেই কল্পনা করে বসি। আসল মানুষটি কল্পনা না সত্য—অথবা কে সে চার্ব্বাক এই নিয়ে আছে নানা মতভেদ।

পৌরাণিক মতে চার্ব্বাক বৃহস্পতির শিষ্য। চার্ব্বাকের নাস্তিক মতবাদ না কি দেবগুরু বৃহস্পাতির মত থেকে নেওয়া।

আবার চার্ব্বাক নামে এক রাক্ষসের দেখা পাই মহাভারতে পাণ্ডবের গৃহে। ছদ্মবেশে সে পাণ্ডবের সর্ব্বনাশ করতে আসে। শেষে ব্রাহ্মণরা তাকে চিনতে পেরে পুড়িয়ে মারে।

এসব কাহিনীকে যদি ইতিহাস বলে ধরা না হয়—তবে দার্শনিক একজন কেউ অবশ্যই ছিলেন—যার মতবাদকে চারুবাক বা সুন্দর কথা মনে করে একটা দল গ'ড়ে ওঠে—যে দলের নাম হয় চার্ব্বাক-সম্প্রদায়।

চার্ব্বাকের কথাগুলো বর্ত্তমান নব্য যুবকদের—অন্ততঃ ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অনেকের চারু বা সুন্দর বলেই মনে হবে!

মোটমাট চার্ব্বাকের মতবাদ বেদান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে যে—একদল লোক বলে জগত পঞ্চভূত থেকেই হয়েছে। সৃষ্টি-কর্ত্তা কেউ নেই। লোকের উন্নতির জন্য লোকমধ্যে প্রচারিত সে মতের নাম দেওয়া হল—'লোকায়ত।'

'ভাগুবি' প্রভৃতি পণ্ডিতরা এই লোকায়ত-দর্শনেরও ভাষ্য করেছেন। এই মত ও চার্ব্বাক মত প্রায় একই। মহাভারতে চার্ব্বাকদের হেতুবাদী বলেছে বটে, আবার অনেকে বলেন, চার্ব্বাক মতও বৌদ্ধযুগের সমসাময়িক। যাই হোক, চার্ব্বাক মত বেদকে খণ্ডন করে দেয়। তাদের মোটমাট মত—ব্রহ্ম বলে কোন পদার্থ নেই—বেদ প্রামাণ্য নয়। সচেতন দেহ ছাড়া আত্মা বলে কোন পদার্থ নেই—মৃত্যুর পর দেহ পুড়লেই সব গেল। পরলোক বা স্বর্গ নরক কিছু নেই—প্রত্যক্ষ ছাড়া প্রমাণ তারা মানে না, পঞ্চভূতে জগত ও দেহের সৃষ্টি—কেউ সৃষ্টি করে না—সুখই একমাত্র কাম্য। পরলোকের আশায় কোন কিছু কাজ করা বা দুঃখ ভোগ করা মূর্খের কাজ। উত্তম ভোজন, সুখ-বিলাস, স্ত্রী-সম্ভোগ প্রভৃতি সুখই পুরুষার্থ। এতে যদি কোন দুঃখ আসে সে মাছের কাঁটা বা ধানের তুষের মতন। ওটুকু থাকলেও কেউ ভোগ করতে ছাড়ে না। প্রতারক পণ্ডিতরা স্বর্গ নরকের বাহানা করে—যজমানদের নানা

অনুষ্ঠান করায়। নইলে বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোম, দণ্ডধারণ, ভস্মলেপন যাগযজ্ঞ, তপস্যা-সাধনা এসব কিছু নয়—। বলি দেওয়াতে যদি জীবের স্বর্গলাভ হয় তবে বাপ-মাকে বলি দিলেও চলে। শ্রাদ্ধ করলে যদি মৃতলোক তৃপ্ত হয় তবে বিদেশস্থ আত্মীয়দের শ্রাদ্ধ-ব্যবস্থা নেই কেন? মোট কথা, তারা বলেন—ওসব কিছুই নয়—'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।'

চার্ব্বাকের ন্যায় মতবাদ দেখি, বুদ্ধের সমসাময়িক মঘলিপুত্র গোশাল এবং দীঘনিকার কেশকম্বলীও এই মতবাদ প্রচার করেছেন। তাঁরা বলতেন—সন্ন্যাসী হয়েও স্ত্রী-সম্ভোগ করা চলে—কারণ ওটা স্বাভাবিক বৃত্তি। যাই হোক, এ ধর্ম্ম লোকায়ত নামে প্রসিদ্ধ।

জৈন দর্শন

এর পরই আসে জৈন সম্প্রদায়ের কথা। জৈনদের মতে প্রতি-সৃষ্টিতে জৈন ধর্ম্ম নব নব ভাবে আবির্ভূত হয়। বর্ত্তমান সৃষ্টিতে ঋষভ দেব আদি ও মহাবীর শেষ তীর্থঙ্কর। অনেকে বলেন, মহাবীরের আগে ছিলেন পার্শ্বনাথ—তাঁর আগে ছিলেন অরিষ্টনেমী। মহাবীরের আশীহাজার বছর পূর্ব্বে না কি তাঁর নির্ব্বাণ হয়। হয়তো এটা কাহিনী বা কল্পনা। যাই হোক, জৈন ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রাচীন। ২৪জন এঁদের তীর্থঙ্কর। তীর্থঙ্কর কথাটির অর্থ দর্শন-কর্ত্তা। জৈনরা দুই সম্প্রদায়—শিবভূতি প্রতিষ্ঠিত শ্বেতাম্বর অর্থাৎ সাদা কাপড় পড়েন তাঁরা, আর একদল ভদ্রবাহু প্রতিষ্ঠিত দিগম্বর—তাঁরা থাকেন উলঙ্গ। শ্বেতাম্বররা যেসব গ্রন্থকে মূল আগম বলেন—দিগম্বররা সেসব গ্রন্থ মানেন না। মতভেদ নানা থাকলেও, দুই সম্প্রদায়ই মূল এক দর্শন তত্ত্বকেই মানেন, তবে আচারগত ব্যাপারে অনেক অমিল তাঁদের। জৈনরা বলে, সব পদার্থের মধ্যে একটা অংশ অস্থায়ী হলেও অপর এক অংশ স্থায়ী। প্রতি দ্রব্যে কিছু স্থায়ী গুণ থাকে, কিছু উৎপন্ন হয়—কিছু ধ্বংস হয়।

এছাড়া জৈনদের মতবাদের মধ্যে বিশেষ মতবাদ হল—'স্যাৎ-বাদ'। কথাটা হচ্ছে এই যে 'স্যাৎ' মানে হতেও পারে। জৈনরা বলেন, নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী বা বিচার দিয়া বস্তুর একটা দিক দেখে—'এইটাই ঠিক' 'এটা হতে পারে না'—এ রকম বলা উচিত নয়। বলতে হবে—এটাও হতে পারে, আবার নাও হতে পারে! এই-রকম অস্থিরভাবে স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ—এই রকম সাতভাবে বিচার করে সপ্তভঙ্গি ন্যায়ে জৈনদের দর্শন-বিচার পুষ্ট। তাঁরা বলেন—কেউ জগতের কোন বস্তু সম্বন্ধে এইটাই ধ্রুব—ঠিক, এমন বলতে পারে না। জৈনরা আত্মা মানেন। কর্ম্মফলে জন্মান্তর স্বীকার করেন। কালকে তাঁরা একটি দ্রব্য মনে করেন। মনে করেন, কাল পরমাণুর ন্যায় অসংখ্য। জৈনদের মতে যোগদ্বারা মোক্ষলাভ হয়। তাদের মধ্যে জ্ঞান, তীর্থঙ্করদের বাক্যে শ্রদ্ধা ও চরিত্রে সংযম এই তিনটি নিয়েই যোগসিদ্ধ হয়। চুরি না করা, সত্যবাক্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ অর্থাৎ সবরকম লোভ ও আসক্তি থেকে বিরতি—এই নিয়ে চরিত্র-সংযম বুঝিয়েছেন। জৈনদের মতে আত্ম-জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। আত্মা যতক্ষণ কষায়-হীন অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ শূন্য না হয় ততক্ষণ যোগে বা মোক্ষের জন্য তৈরী হতে পারে না—সংসার আবর্ত্তেই তাকে ঘুরতে হয়। অতএব ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ এই চারটি কষায় থেকে মনকে ফিরিয়ে আত্মাকে মোক্ষ-লক্ষ্যে যোগ-সাধন করতে হবে—এই জৈন মত।

জৈনদের মূল ধর্ম্মশাস্ত্র—কল্পসূত্র ও আগম। তার আবার চতুর্দ্দশ পূর্ব্ব, একাদশ অঙ্গ, দ্বাদশ উপাঙ্গ, চারসূত্র, দশ প্রকরণ প্রভৃতি নানা ভাগ আছে। সংস্কৃত, মাগধী ও প্রাকৃত ভাষায় সে সব লেখা। এদের মতে দুই যুগ ;—যে যুগ থেকে কালের উন্নতি হয়—তা উৎসার্পণ আর অবসার্পণ—যখন থেকে সুরু হয় তার অবনতি।

প্রতিযুগে ২৪জন জিন, ২১ জন চক্রবর্ত্তী, ৯জন বলদেব, ৯জন বাসুদেব আবির্ভূত হয়। এদের মতে জগতের লয় নেই—মানব জীবন

নিত্যসিদ্ধ; মুক্তাত্মা ও বদ্ধাত্মা তিনভাগে বিভক্ত। এদের প্রধান ধর্ম্মই হচ্ছে পঞ্চ প্রতিজ্ঞা। (১) চুরি করিও না (২) মিথ্যা বলিও না (৩) হিংসা করিও না (৪) চিন্তা ও কর্ম্মে ন্যায়গামী হও (৫) অনুচিত আশা করিও না।

বৌদ্ধ-দর্শন

ইতিহাসে সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত দেশ, কাল পাত্রে পূর্ণ নির্দ্ধারণ এই দর্শনের সময় থেকেই আমরা পাই। আর সেই প্রামাণ্য স্বীকৃতিতেই হয়তো প্রাচীনতম হিন্দু দর্শনকে অতিক্রম করে বৌদ্ধ দর্শন পৃথিবীর অর্দ্ধ অংশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শাক্যবংশের রাজা শুদ্ধোধন-পুত্র রাজকুমার সিদ্ধার্থই নিজ তপস্যার দ্বারা বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়ে এই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। পিতামাতা তাকে বিবাহ দিলেও সহসা একদিন পথে এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, এক রোগাতুর মুমূর্ষু, এক মৃত এবং একটি সন্ন্যাসী দেখে তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়—মনে হয়, কেন এ জরা, কেন এ ব্যাধি—পরিণাম তো ঐ মৃত্যু, আর এ সব বুঝি অতিক্রম করেছেন ঐ সন্ন্যাসী। এই জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর দুঃখকে অতিক্রম করতেই তিনি সাধনা সুরু করেন মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে।

এই সাধনার চরম অবস্থায় 'মারে'র বহু প্রকার মায়া বা বাধাকে অতিক্রম করে তিনি গয়ার অনতিদূরে এক বৃক্ষতলে দীর্ঘ তপস্যায় বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। বোধিতলে বোধপ্রাপ্তির পর শিষ্য পঞ্চসহ তিনি সারনাথে তাঁর ধর্ম্ম প্রচার সুরু করেন। শেষ পর্য্যন্ত ৮০ জন শিষ্য হয়েছিল তাঁর। আর তাঁদেরই তিনি বলেছিলেন, তাঁর ধর্ম্মকে সারা ভারতে—সারা বিশ্বে—সারা মানব-সমাজে প্রচারিত করতে।

তিনি মাত্র ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তারপর তিনি নানা সূক্ষ্মতর অবস্থার মধ্য দিয়ে মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন।

তিনি কোন গ্রন্থ লিখে যাননি। তবে তার শিষ্যরাই তাঁর মতবাদ প্রচার করেন এবং বিভিন্ন শিষ্য বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। বুদ্ধের সেই সব বচন নিয়ে বিরাট এক বৌদ্ধ সাহিত্য সেদিন গড়ে উঠেছিল—ভারতে আজ তা প্রায় অবলুপ্ত। বরং চীন জাভা প্রভৃতি স্থান থেকে আজ তার অনেক সংগৃহীত ও অনূদিত হচ্ছে। সে সব গ্রন্থাবলী প্রায়ই তিন ভাগে বিভক্ত। সুত্ত পিটক, বিনয় পিটক ও অভিধর্ম্ম পিটক। সূত্রপিটক বা সুত্ত পিটকে আছে পাঁচটি গ্রন্থ—দীঘ নিকায়, মাজ্ঝিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, খুদ্দক নিকায়। আবার এই খুদ্দক নিকায়ে আছে—ধম্মপদ উদান, ইতি-বুত্তক, সুত্ত নিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরী-গাথা, জাতক, নির্দ্দেশ, পটিসম্ভিদা, মগ্গ অপদান, বুদ্ধ বংশ এবং চর্য্যাপিটক।

অভিধম্মপিটকে আছে; পঠ্যান্ ধম্মসঙ্গণি, ধাতুকথা, পুগ্গল পঞ্ঞত্তি, বিভঙ্গ, যমক এবং কথাবত্থু। এ ছাড়া বিনয় পিটক হলো বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়ম ও অনুশাসনের গ্রন্থ। এসব গ্রন্থই পালিভাষায় লেখা। পালি ভাষায় লেখা, বৌদ্ধ দর্শনে যে মতবাদ প্রচারিত হয়েছে তাকে বলা হয় স্থবিরবাদ বা 'থেরবাদ'। থেরবাদ অবলম্বনে লিখিত বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে বুদ্ধঘোষ লিখিত গ্রন্থই বিখ্যাত।

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে মহারাজ অশোক এক বৌদ্ধ সম্মেলন আহ্বান করেন। আবার 'খৃঃ প্রথম শতকে মহারাজ কণিষ্ক আহ্বান করেন আর এক বৌদ্ধ পরিষদ। ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় সহসাজাত কোন ধর্ম্মই এভাবে রাজানুগ্রহে পুষ্ট হয়নি। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে যখন এই মতভেদ সুরু হয় তখন মহাসঙ্ঘিক নামে যে নূতন দলের উৎপত্তি হয়—কালে সেই দলই মহাযান সম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়। এই মহাযান সম্প্রদায়ের মহাযানসূত্র সমুদয়ই শেষ পর্য্যন্ত বৈপুল্যসূত্র নামে খ্যাত হয়। মহাযান সাহিত্য কিন্তু সংস্কৃতে লেখা। পরে চীন দেশে চীনভাষায় ইহা অনূদিত হয়। এইসব গ্রন্থের আলোচনা করবার আগে জানতে হবে মূল ধর্ম্মের বক্তব্য কি?

সিদ্ধার্থ ও গৌতমের মনে প্রথমেই সেই জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু দেখে প্রশ্ন এল—এইসব দুঃখের কি ক'রে শেষ করা যায়। কেন এসব হয়? এবং কি করলে এসব হয় না। উত্তর পেলেন—জন্ম নিয়ে। জন্ম না হলে দুঃখ হবে না—আসবে না এই ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু। এবার প্রশ্ন এল মনে তাঁর—কেন এ জন্ম হয়? উত্তর পেলেন নিজের বোধের কাছে—সঞ্চিত কর্ম্ম বা 'ভব' না থাকলে জন্মই হবে না। তবে এ কর্ম্ম মানুষের রুদ্ধ হয় কিসে? উত্তর এল—কামনা থেকেই আসে কর্ম্ম। যা পাবার জন্যে মানুষ কাজ করে। এই যে চাওয়া—এই যে তৃষ্ণা এর নাম দিলেন তিনি উপাদান। এই তৃষ্ণা বা সুখ দুঃখের কামনাই তো কর্ম্ম বা জন্মের উপাদান। সে কামনার মূলে ইন্দ্রিয় সংস্পর্শ। দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন এই মিলেই করে কামনা—এদের নাম দিলেন 'নামরূপ।' এই দেহ মন থাকার জন্যেই এল জ্ঞান-বিজ্ঞান। এদের নাম দিলেন অনুস্যুতে। এই বিজ্ঞান বা জ্ঞান তো একটা জিনিস নয়। অনেকগুলি দ্রব্য মিলে হয় বিজ্ঞান! পরস্পর মিলতে চায় এমন যে সব বস্তু—যা বিজ্ঞান বা জ্ঞানের সৃষ্টি করে তাকে তিনি বললেন—সংখার। এই সংখারের মূলে আছে অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান।

তাহলে অবিদ্যা, সংখার, বিজ্ঞান, ইন্দ্রিয়, মন, কর্ম্ম, জন্ম, জরা ও মরণ এই সব নিয়ে এক কর্ম্মচক্র ভবচক্র ঘুরে চলেছে—তার জন্যে মানুষ জন্মে আর মরে। বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তনের মূলে এই ভবচক্র দেখা দিল তাঁর মহান বৌদ্ধ দর্শনে। তিনি বলেছেন—মানুষের তিনটি জন্মে এই ভবচক্রের একটি ঘূর্ণন পূর্ণ। প্রথম চক্রে বা প্রথম জন্মে বিজ্ঞান, সংখার ও অবিদ্যা। সে চাকা ঘুরে মনে কামনা আনলো, তখন দ্বিতীয় জন্মে দ্বিতীয় চাকা ঘুরলো তার ইন্দ্রিয় বা মনের ভোগ আর কর্ম্ম-প্রবৃত্তি নিয়ে, আর তারই অনুসারে তৃতীয় জন্মে বা তৃতীয় চক্রে এল জন্ম, জরা ও মৃত্যু। এই মৃত্যুর সময় যে কামনা তার জাগে সেই অনুসারে বিজ্ঞানের বলে মাতৃগর্ভে তার জন্ম

হয়। কামনা না থাকলে জন্ম হয় না। এইসব ভিত্তি করেই সংখার স্কন্ধ, রূপস্কন্ধ, বেদনা-স্কন্ধ বিজ্ঞানস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ নামে পাঁচ খণ্ড বা স্কন্দে শারীরিক ও মানসিক অবস্থাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে বৌদ্ধ-দর্শন-এর নানা আলোচনা করেছে। কিন্তু মোট বক্তব্যই হচ্ছে তার অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও কর্ম্মই দুঃখের মূল। অবিদ্যা ও মায়াতেই আসে কামনা, তাতেই করে কাম্য কর্ম্ম, তারই সঞ্চয়ে আসে জন্ম—জন্ম হলেই হবে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু। এখন যদি সাধক এই তৃষ্ণার বা কামনার নিবৃত্তি করতে পারে তবে শেষ পর্য্যন্ত জন্ম তার হবে না—সে পাবে মুক্তি। নিষ্কাম ধর্ম্মেরই এ আর এক রূপ। এই মূল করে বৌদ্ধরা চারটি বিষয় সম্বন্ধে মনকে ও মানবকে জাগ্রত হতে বলেন—(১) জগত দুঃখের (২) সে দুঃখের কারণ কি (৩) সে দুঃখ দূর করবার উপায় কি (৪) আর তার ফল কি?

এই চারটি হল বৌদ্ধ আর্য্য-মত। বৌদ্ধ মতবাদের রূপ যাই হোক—উপনিষদের গোড়ার কথাই তিনি মেনেছেন—তবে তা অন্য ভাবে বলেই বৌদ্ধ-দর্শনকে নাস্তিক দর্শনের মধ্যে ফেলতে প্রাচীন হিন্দুদের বাধে না। বুদ্ধকে অবতার বলে মানবার পরও কি করে এমন ভাবে তাঁরা বলেন, এবং সাত্বিক হিন্দু পর্ব্ব-সূচীতে বুদ্ধপূজার উল্লেখ থাকে তা জানি না। হয়তো আধুনিক ইতিহাসের প্রামাণ্যের বাস্তবতায় এই মহাপুরুষ কল্পনার রঙে রঙীন হয়ে ওঠেন—ধ্যানের ঠাকুর হয়ে ওঠেননি। সমস্ত তৃষ্ণা নিবারিত হলে যে অবস্থা সাধকের আসে তাকে বৌদ্ধরা অর্হৎ বলেছেন—আর সেটাই আমাদের আস্তিক-দর্শনের জীবন্মুক্ত অবস্থা। হিন্দু বা জৈন দর্শনের মতন বৌদ্ধ-দর্শনও স্বীকার করেছেন চরিত্রের সংযম সব সাধনার গোড়ার কথা। পাঁচ প্রকার সংযমকে তাঁরা বলেছেন পঞ্চ সম্বর। তন্মধ্যে—পাটি মোক্ষ সম্বর মানে চিত্ত-সংযম, মতিসম্বর মানে মনের সংযম—সাধু চিন্তা ছাড়া সে যেন আর কিছু না করে, শীতে বা গরমে যেন একভাবে থাকতে পারে, জ্ঞান সম্বরে—জ্ঞানের দ্বারা গ্লানি থেকে থাকবে সংযত,

বীর্য্যসম্বর মানে বীর্য্য রক্ষা। এও হিন্দু বা জৈন দর্শনেরই এক বিভিন্ন রূপ বা নাম মাত্র। এই পাঁচটি সম্বরকেই বলা হয় পঞ্চশীল। পঞ্চশীলেই সমাধি মার্গে প্রবেশ, সিদ্ধিলাভ ও মুক্তি বা নির্ব্বাণ সম্ভব।

সংযমের উপায় বলতে গিয়ে বলেছেন—শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণে হবে চিত্ত-সংযম, মৈত্রী করুণা ও উপেক্ষা দ্বারা হবে সেই চিত্ত-শুদ্ধি। একেই বলে ব্রহ্ম-বিহার। এই ভাবে শুদ্ধ-চিত্ত নিয়ে চরম ধ্যানে সুখ, দুঃখ এবং রাগ দ্বেষ থেকে নিবৃত্তি হলেই হবে নির্ব্বাণ লাভ।

এই নির্ব্বাণ নিয়েও মতভেদ আছে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মধ্যে। মহাযানদের মতবাদ আমরা যেমন পাই 'অভিধর্ম্ম-কোষে', তেমনি হীনযান মতবাদীদের কথা পাই থেরবাদী সব গ্রন্থে।

এই দুটি মতবাদের পার্থক্য নিয়ে মহাযানরা বলেন যে হীনযানরা শুধু নিজের নির্ব্বাণ নিয়েই চিন্তা করেন, মহাযান মতবাদীরা চেয়েছেন বিশ্বের সমস্ত মানবের নির্ব্বাণ বা মুক্তি।

হীনযানরা বলেন, সব বস্তুই ক্ষণস্থায়ী। মহাযানরা বলেন, বস্তুই তারা নয়—তারা প্রতিভাষমাত্র—কেবল প্রতীতি।

মহাযান-শাস্ত্র শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ এই দুই ভাগে বিভক্ত। বিজ্ঞানবাদ প্রায় আমাদের যোগাচারের অনুরূপ। আর শূন্যবাদ এত দুর্ব্বল যে শঙ্করাচার্য্য এ মত খণ্ডনের চেষ্টাও না করে অবহেলাই করেছেন। খণ্ডন করেছেন তাঁর শিষ্য কুমারিল। বুদ্ধ চরিত্রের প্রসিদ্ধ লেখক অশ্বঘোষ শ্রদ্ধোৎপাদ সূত্র নামক দার্শনিক এক গ্রন্থ লেখেন। তিনিও বলেছেন—অবিদ্যা দ্বারা দ্বৈতবোধ আসে। তাঁর সব কথা—এমন কি বৌদ্ধ দার্শনিক সব ক'জনার লিখিত গ্রন্থ দেখে মনে হয় যে তাঁরা হিন্দু দর্শন ও উপনিষদে পাণ্ডিত্য অর্জন করে বুদ্ধদেব প্রচারিত মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাকে সার ক'রে সত্য, অহিংসাকে মূল করে যা কিছু বলেছেন সবই হিন্দুদর্শনের বিভিন্ন মতের রূপান্তর মাত্র।

উপাস্য ও উপাসনা

উপাস্য কে? উপাসনা করবো কার?

"তদেব ব্রহ্মং ত্বং বিদ্ধিঃ নেদং যদ্-ইদং উপাসতে"

তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জান—এটা ওটা ভেবে যার উপাসনা কর আত্মারূপ ব্যতীত অন্য সে সব ব্রহ্ম নয়। অথচ সবাই কি এ মত মানেন? মানেন না বলেই তো বেদ উপনিষদের পরও হলো—তন্ত্র-মন্ত্র, স্মৃতি-শ্রুতি, পুরাণ। প্রকৃত পক্ষে উপাস্য কে?

এ প্রশ্নের উত্তরে সবাই প্রায় এক মত—সব ধর্ম্ম, সব জাত, সব দেশ। তবে তার উপাসনার রীতি ও নীতি, উপাস্য দেবতার প্রতীক আর প্রতিমা—ধর্ম্মের সঙ্গে বিভিন্ন কর্ম্ম নিয়েই যত ভেদ আর বিভ্রম। এই উপাস্য আর উপাসনার রীতি নীতিকেই সাধারণত লোকে ধর্ম্ম বলে জানে। ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা বেদ সঙ্কলয়িতা ধর্ম্মকে প্রণাম করতে গিয়ে তাই প্রথমেই বলে বসলেন—

"য পৃথগ্ ধর্ম্মাচরণাঃ পৃথগ্ ধর্ম্মফলৈষিণঃ;
পৃথগ্ ধর্ম্মৈঃ সমর্চন্তি তস্মৈ ধর্ম্মাত্মনে নমঃ!"

পৃথক পৃথক ধর্ম্ম আচরণের দ্বারা, পৃথক পৃথক ধর্ম্মফল প্রাপ্তি কামনায়, পৃথক পৃথক ধর্ম্মাবলম্বিগণ যে ধর্ম্মকে অর্চনা করেন—সেই ধর্ম্মকে নমস্কার।

কি সে ধর্ম্ম?—এর উত্তরেও ব্যাসদেব বললেন—"ধারণাৎ ধর্ম্ম-মিত্যাহু—ধর্ম্মোধারয়তে প্রজা।" যিনি ধারণ করেন, রক্ষা করেন, তিনি ধর্ম্ম আর ধর্ম্মকে ধারণ করেই সব। কিন্তু সে ধর্ম্ম যদি এক এক দেশে, কালে, পাত্রে ভিন্নরূপী হয় তবুও কোন বিরোধ নেই তা নিয়ে ভারতবর্ষে। তাই দেখি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টত নিজে বলেছেন—

"ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্মতৎ,
অবিরোধী তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মো মুনিপুঙ্গব।"

যে ধর্ম্ম অন্য কোন ধর্ম্মকে বাধা দেয়—সে ধর্ম্ম কুধর্ম্ম, অবিরোধী ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম।

অতএব ধর্ম্ম নিয়ে ভেদ যে ভারতে নেই, উপাস্য আর উপাসনা নিয়েও সে ভারতে প্রকৃত পক্ষে কোন প্রভেদ নেই।

দ্বৈত ও অদ্বৈত

তবু সেই আদিম যুগ থেকেই আর্য্যগণের মনে প্রশ্ন এসেছিল কে সে উপাস্য—তাঁর কি রূপ আছে, তিনি কি একজন অথবা সেই অদ্বৈতের ভিন্ন রূপ? বেদ প্রথমেই বলেছিলেন—

ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ওঁ ॥

যিনি আমাদের ধী শক্তিতে প্রবুদ্ধ করেন সেই জ্যোতির্ম্ময় বরণীয় ভর্গ—অর্থাৎ পরব্রহ্মাত্মক সেই তেজকে আমরা ধ্যান করি। একটা জ্যোতি—একটা তেজ—একটা শক্তি। তাই কি তবে উপাস্য?

প্রার্থনাও শুনি বেদ মন্ত্রে—

"তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি
বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি
বলমসি বলং ময়ি ধেহি

স্বর্গ, মুক্তি, ধন কিছু নয়—তেজ দাও, বল দাও। বীর্য্য দাও।

তবু তো দেখি প্রার্থনায়—দাতা ও গ্রহীতার কল্পনা। ভাবি, কেউ আছেন—আছে তাঁর দানের শক্তি—তাই এই প্রার্থনা—প্রার্থনায় দাতাকে স্মরণ!

এই টুকুই যে প্রয়োজন। উপাসনা অর্থে—বহু শাস্ত্রই বলেছে—'সর্ব্বদা স্মরণ'। স্মরণই যদি করতে হয় তবে অরূপ, অব্যয়, অসীমকে স্মরণ করা কি সহজ? তাই একটা রূপ কল্পনার প্রয়োজন এল—আর তা এল বলেই যেন বেদ-বাণীর মাঝে ধ্বনিত হল—

"হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ত ভাগে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ"

—সর্ব্ব প্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই ছিলেন—তিনি জাত মাত্রেই সর্ব্বভূতের পতি বা অধীশ্বর হলেন।

হিরণ্যগর্ভের এক অপরূপ রূপ তাতেও পাই অধীশ্বরে এক দেহীর কল্পনা! মস্তক, চক্ষু বা হস্তাদি দ্বারা তাঁর রূপ-আরোপের কথাও যেন আসে মনে। যে বেদ বলে গেলেন তিনি অদ্বৈত, অনাদি অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী সেই বেদেই দেখি—অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র। নানা রূপে তাঁর বিভূতি প্রকাশের এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত—মন্ত্রে তাদেরও আহ্বান করি।

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ সসুপর্ণো গরুত্মান্
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বান মাহুঃ।

বেদের পর উপনিষদও বললে—জানার মধ্যে যাঁকে জানা যায় না, ধরার মধ্যে যাঁকে ধরা যায় না, যাঁর নেই গোত্র, নেই বর্ণ, নেই জ্ঞানেন্দ্রিয়, নেই কর্ম্মেন্দ্রিয়, সেই "তিনি"—যিনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অবিনাশী—তাকেই জ্ঞানীগণ সমস্ত প্রাণীর পরমকারণ পরমব্রহ্ম রূপে জানে (মুণ্ডক্য ১-৬)। একেবারে অরূপ বিদেহ অব্যয়ের রূপ। আবার সেই উপনিষদই বলছে "এষ লোক-পাল, এষ লোকাধিপতিঃ। এষ সর্ব্বেশ্বরঃ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ "

লোকপাল লোকপতি হয়ে উঠলেন অরূপ দেবতা। অব্যয় অবাঙ্‌মনসোগোচর পরব্রহ্ম বললেন একদিন "একোঽহং বহু স্যাম" এক আমি হব বহু। অরূপ হলেন বহুরূপী। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেব প্রবিশৎ।" তিনি জগত সৃষ্টি করে তাতেই অনুপ্রবেশ করলেন।

অদ্বৈত ছিলেন যিনি তাঁর হ'ল দ্বৈতে প্রবেশ। তাই ভগবান শঙ্করাচার্য্য বললেন—ব্রহ্ম নিজ মায়া-শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা সগুণ ঈশ্বর রূপে প্রতীয়মান হন। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর দ্বৈত-বাদের ইঙ্গিত দিলেন—অদ্বৈতরূপ, নির্গুণভাব ভাবা সহজ নয় তাই দ্বৈতভাবের প্রকাশে সাধকরাই হলেন উদ্যোগী। তাই ব্রহ্মের প্রথম সৃষ্টিকেই রূপ দেওয়া হ'ল 'ব্রহ্মা'।

শুধু তাই নয়—সৃষ্টি হলেই তো হবে না, তাই সৃষ্টিকে পোষণ, পালন করবার জন্য ব্রহ্ম সব কিছুর মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে মিলিয়ে রাখলেন সবাইকে পালন করতে। এই যে সবের মধ্যে তার অস্তিত্ব, এরই রূপ হলেন পালনকর্ত্তা—'বিষ্ণু'। বিষ্ণু শব্দটির অর্থই হচ্ছে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ। বেদে এ রূপও তো তাঁর পেয়েছি, উপনিষদ এ রূপ তাঁর মেনে নিয়েছে। ভক্ত, সাধকরা তাঁর রূপ দিলেন পালকের রূপ—ঐশ্বর্য্য তাঁর বিভূতি। ধনে, জনে, বিত্ত বিলাসে তিনি পূর্ণ।

তারপর হল তাঁর প্রলয়ের রূপ—লয়ের মূর্ত্তি। আর্য্য-ভারত কোন দিন লয়কে ভয় করেনি। তারা জানে পরমাত্মা আত্মারূপে থাকেন প্রতি দেহীর অন্তরে। দেহে যতক্ষণ থাকে পরমাত্মার অংশ, ততক্ষণ আত্মা পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আটকে থাকে এই দেহে। দেহ নাশ হলেই আত্মার মুক্তি—খাঁচা ভাঙলেই বিহঙ্গ উড়ে যায় তার মালিকের কাছে—আত্মা পরমাত্মায় যুক্ত হয়। তাই হিন্দুর পরম কাম্য এই লয়। লয় তার কাছে অশুভ বা অশিব নয়। শিব বা মঙ্গলময় তা। তাই প্রলয়ের ঠাকুররূপে কল্পনা হল তাঁর—শিব রূপ—গ্লানিহীন শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়রূপ। সমস্ত অশুভ-রূপ বিষ, তিনি শেষ ক'রে—নিজে শুভ বা শিবময়রূপে জগতকে দেন কল্যাণ, আত্মার দেন মুক্তি।

তাহলেই নির্গুণ, অব্যয় অরূপ সেই পরমাত্মা তাঁরই রচিত সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মধ্যে তাঁরই বিভিন্ন রূপকে করেন রূপায়িত। হিন্দু তাঁকেও সেই পরমাত্মার রূপ-প্রকাশ রূপে মনে করে।

প্রতীক ও প্রতিমা—

"ব্রহ্ম" কি ?—এ নিয়ে আমরা মোটামুটি আলোচনা করেছি। বুঝেছি অরূপ, অব্যক্ত, জ্যোতির্ম্ময় আত্মা তিনি ? তাঁকে না যায় দেখা, না যায় ছোঁয়া। এখন তাঁরই অংশ শক্তি বা প্রভাব নিয়ে তৈরী হল জগত—সৌরজগত বা দেবলোক।

আধ্যাত্মিক জগতে যিনি ব্রহ্ম—আধিদৈবিক জগতে তিনি আকাশ-ব্রহ্ম, আদিত্য-ব্রহ্ম। অন্তরস্থ ব্রহ্ম থেকে মন এল বাহির পানে—বাইরের জন্য দেখলো ব্রহ্মের রূপ। প্রতীক শব্দটির অর্থই হচ্ছে বাইরের দিকে যাওয়া। অতএব ব্রহ্ম—যখন বাইরের দর্শনীয় হয়ে এক রূপ নিলেন—সেটি হ'ল প্রতীক। সে ঐ সূর্য্য চন্দ্র হতে পারেন—হতে পারেন বিষ্ণু, শিব বা ইন্দ্র, চন্দ্র—হতে পারেন রাম, কৃষ্ণ অথবা রামকৃষ্ণ, শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেব আবার বট, অশ্বত্থ, নদ-নদী কিন্তু সবের মাঝেই ব্রহ্মের প্রভাব বা অংশ—আর তাই তাঁরা ব্রহ্ম-প্রতীক।

কিন্তু প্রতিমা হয়নি তখনও। প্রতীকের পর হ'ল প্রতিমা। যেমন শিবের, বিষ্ণুর, ইন্দ্রের, চন্দ্রের—তেমনই বুদ্ধের রামকৃষ্ণের শঙ্করাচার্য্যের। এদের মধ্যে সাক্ষাৎ ইতিহাসের কোঠায় যাঁরা—তাঁরা হলেন মানব-মূর্ত্তি, যাঁরা পুরাণের পাতায় তাঁরা পঞ্চানন শিব, চতুর্ভুজ বিষ্ণু বা দশভুজা শক্তি।

তা হলে দেখলাম, ব্রহ্ম আছেন সবার অলক্ষ্যস্থানে, অজ্ঞাতে অব্যয়ভাবে আর তাঁর প্রভাবে যাঁরা জাত—তাঁরা হলেন ব্রহ্মের প্রতীক আর প্রতীককেই টিকিয়ে রাখলাম আবার অন্তরে ও বাহিরে এই প্রতিমার মাঝে।

ব্রহ্ম আছেন আমার আত্মায়—আমার পিতার আত্মায়, গুরুর আত্মায়। গুরু বা পিতা আমার কাছে ব্রহ্মের প্রতীক—আর তার ফটো বা মূর্ত্তি আমার কাছে পিতৃ-প্রতীকের প্রতিমা।

ব্রহ্মকে যিনি পেয়েছেন, তিনি ব্রহ্মে লীন হয়েছেন—তিনি ব্রহ্মজ্ঞ। কিন্তু ততদূর যিনি উঠতে না পারলেন—তিনি পাবেন সহজে সেই ব্রহ্মকে ব্রহ্মের প্রতীকের মধ্যে। আর তার চেয়েও অতি সহজে সাধন-পথে যাঁরা এগোতে চান তাঁরা ভক্তি দিয়ে গড়ে তোলেন প্রতিমা। ক্রমে প্রতিমা থেকে তাঁরা পৌঁছুবেন ব্রহ্ম-প্রতীকে—তারপর ব্রহ্মে। এ শুধু সিঁড়ির ধাপ। ব্রহ্মের হাতে গড়া ঐ প্রতীক আর প্রতীকের হাতে গড়া তাঁর প্রতিমা।

অবশ্য সেযুগের শিল্পীরা নিজেদের গড়া জিনিসকেও প্রতীক বলেছেন, যেমন ঐ ত্রিকোণ, ত্রিভুজ, বৃত্ত, মণ্ডল, চিতি—প্রতীকের কল্পনায় আছে নানারকম চিহ্ন—এগুলি ঠিক যেন মূর্ত্তি-গড়ার আগের চেষ্টা মাত্র।

আর্য্যগণ মূর্ত্তি দিয়ে নয়—প্রথমেই প্রতীক দিয়ে প্রকৃতির প্রকৃত প্রতিকৃতি আঁকতে চেষ্টা করলেন। শিল্পী সেদিন তাই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের ত্রিভাবকে ত্রিকোণের প্রতীকে এঁকে দিলেন। অনন্তের ভাব প্রচার করতে 'বৃত্ত' আঁকলেন—স্বস্তিক চিহ্নকে মিলনের কল্যাণের চিহ্ন করলেন। বেদের যজ্ঞেই এসব অঙ্কন বা 'চিতি', মণ্ডল সুরু হ'ল। আজও তা আলপনার রূপ ধরে শুভকাজে মণ্ডলের আশে-পাশে মণ্ডপে-মন্দিরে জেগে থাকে।

একদিন আবার সেই মন্দিরেই এলেন প্রতিমা—ভক্তের কল্পনার রূপ ধরে, প্রতীক-চিহ্নের পাশে। তবে প্রতিমার কথা বলার আগে আমাদের জানতে হবে প্রাচীন সে আর্য্য ধর্ম্ম কি করে নানা উপাসনার পথে এগুলো—কি করে নানা সম্প্রদায়, নানা প্রতিমা গ'ড়ে উঠলো, কি করে উপাস্য হ'ল ভিন্ন—বিভিন্ন হ'ল তার উপাসনার রীতি বিভিন্ন ধর্ম্মের মাধ্যমে। তাই আগে জানতে হবে প্রকৃত ধর্ম্ম কি ?

প্রকৃত ধর্ম—

বিশ্বের সর্ব্বত্রই প্রকৃত ধর্ম্ম এক। আর সেটি হ'ল সত্য, অহিংসা ও ত্যাগ। এই তিনটি জিনিসকে মূল মন্ত্র ধরে যদি ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছই, তবে দেখবো সকল জাতি, সকল দেশ ও সকল ধর্ম্ম যে নীতি প্রধান ধর্ম্ম বলে মেনে নিয়েছে তা স্থূলতঃ কিছু বিভিন্ন হলেও, মূলতঃ এক। সে ধর্ম্ম হচ্ছে—সত্য ধর্ম্ম, ত্যাগ ধর্ম্ম, অহিংসা ধর্ম্ম। আর তারই সাথে কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম, ন্যায় ধর্ম্ম, ক্ষমা ধর্ম্ম, শ্রদ্ধা ধর্ম্ম, স্নেহ ধর্ম্ম, সরলতা ধর্ম্ম, অক্রোধ ধর্ম্ম, শক্তি ধর্ম্ম, নির্লোভ ধর্ম্ম, সংযম ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ধর্ম্ম, নিরহঙ্কার ধর্ম্ম, শুদ্ধি ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম, অস্তেয় ধর্ম্ম (চুরি না করা), শীলতা ধর্ম্ম, দয়া ধর্ম্ম, পরোপকার ধর্ম্ম,

দান ধর্ম্ম, শারীর ধর্ম্ম, বাচনিক ও মানসিক তপ ধর্ম্ম প্রভৃতি। বিশ্বের যে কোন প্রচারক এর যে কোন ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করেননি।

জগতের তিন মহাপুরুষ—বুদ্ধ, যীশু ও মহম্মদের প্রচারিত বাণীর মূল বক্তব্য সেই বেদের কথা—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"

"অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।"

অর্থ—সত্য জ্ঞানই অনন্ত ব্রহ্ম—অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও, আঁধার থেকে আলোতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে নিয়ে যাও অমৃতে।

বুদ্ধদেব বলেন—সত্যকে আশ্রয় কর, স্বার্থ ত্যাগ কর, সর্ব্বভূতে দয়া কর, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় কর।

যীশু বলেন—ধর্ম্ম অন্তরের জিনিস, ভগবান অন্তরের ধন, পাপ-পুণ্য বাইরের কৃত্রিম জিনিসের ধার ধারে না—সবাই ঈশ্বরের সন্তান—মানুষের ঘৃণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস-পূর্ণ ভক্তির দ্বারাই ধর্ম্ম সাধনা হয়। বাহ্যিকতা মৃত্যুর নিদান।

মহম্মদ বলেন—খণ্ড খণ্ড ধর্ম্মবুদ্ধি থেকে অখণ্ডের দিকে এগিয়ে যাও অনন্তের দিকে—যা সরল সত্য তাকে জান। এইভাবে জগতের অন্য সব ধর্ম্মের প্রচারকই সত্য, অনন্ত, জ্ঞান ও প্রেমের উপাসক।

হিন্দুধর্ম—

মহান এইসব ধর্ম্ম হচ্ছে মানবধর্ম্ম। কিন্তু তারপর কর্ম্মে বা ক্রিয়ার বিভেদে ভারতে যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হ'ল তার নাম হিন্দু ধর্ম্ম। আর্য্য ধর্ম্ম থেকে হিন্দু ধর্ম্ম কি কারণে অন্য নাম গ্রহণ করলো জানি না। যাই হোক ভারতের ধর্ম্ম আর্য্য ধর্ম্ম, আর আর্য্য ধর্ম্মের অপর নাম হয়েছে হিন্দু ধর্ম্ম।

স্বর্গ বা দেবলোক কিংবা ইলাবৃত বর্ষ থেকে যাঁরা নেমে এলেন ভারতে তাঁরা হলেন সনাতনধর্ম্মী, দেবভাষা-ভাষী আর্য্য কিন্তু

তারপর তাঁদের প্রথম সিন্ধু উপনিবেশ কি করে উচ্চারণের তারতম্য ইনডাস হ'ল আবার তা থেকে হ'ল ইণ্ডু বা হিন্দু তা জানেন অতীতের কাল-পুরুষ। সংস্কৃত অভিধানে বা ধাতুগত শব্দে "হিন্দু" না পেলেও —এই দেশ পুরোপুরি সহসা-প্রাপ্ত ঐ হিন্দু নামটাকে এমন ভাবেই বরণ করে নিল যে অতি সহজে—সুপ্রাচীন "আর্য্য" কথাটি "হিন্দু" হয়ে গেল আর আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ "হিন্দুস্থান" হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মেরও নাম হয়ে পড়লো "হিন্দু ধর্ম্ম"। অথচ হিন্দু শব্দটির উল্লেখ ঋগ্বেদ, উপনিষদ বা পুরাণের কুত্রাপি নেই। আজ সেই হিন্দুস্থানে হিন্দু আর্য্যগণ পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন ধারায় যে বিভিন্ন ধর্ম্মে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তা মোটামুটি প্রায় ৫ রকম—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, উপজাতির ধর্ম্ম।

তারপর যে বৈদেশিকরা আজ ভারতে নিজেদের আসন করেছে তাদের মধ্যে মুসলমান, খৃষ্টান, পারসিক, ইহুদী ও অন্যান্য কয়েকটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ও ভারতে আছে। লোক গণনার সূত্রে অনুমান যে ভারতে বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ২৫৪৯৩০৫০৬; বৌদ্ধ প্রায় ২৩২০০৩, জৈন ১৪৪৯২৮৬ এবং শিখ ৫৬৯১৪১৭।

অতএব ধর্ম্ম বা জাতি জগতেও ভারত এক মহাসাগর। অথচ ভারতের বিশেষত্ব এই যে সে অন্য কোন ধর্ম্মকে হেয় মনে করেনি, কোনদিন ঘৃণা করেনি। কোনদিন বলেনি নিজ ধর্ম্ম ছেড়ে আমাদের ধর্ম্মে এস—বরং বলেছে "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।" হিন্দুধর্ম্মী হয়েও বিশ্বকে বলেছে "পরধর্ম্মো ভয়াবহ"—কাউকে সে ভাঙতে চায়নি। তবে তারা জেনেছে যে অন্যসব ধর্ম্ম কোন এক মহাপুরুষকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে—আর আর্য্যধর্ম্ম সনাতন—অতি প্রাচীন কাল থেকে স্বপ্রবাহে প্রবাহিত—আর তাই সে ধর্ম্ম কোন ব্যক্তি বিশেষ, জাতি বিশেষ, আচার বিশেষ বা সংস্কার বিশেষের অধীন হয়নি—কোন পরিবেশে ক্ষুণ্ণ হয়নি—যেমনভাবে পারুক না কেন মানুষ সাধনপথে এগিয়ে যাক—পরম পুরুষকে লাভ করুক—পরমাত্মায় বিলীন হোক

এই তাদের কাম্য। তাইতো পাশ্চাত্ত্য-পণ্ডিত মোক্ষমুলার বলেছেন—"নিতান্ত বর্ব্বর কুসংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ অধ্যাত্ম-জ্ঞানের অবস্থা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-সাধনার এমন কোন দিক বাকি নাই যা ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না।"

তবে ভারত চিরদিন বলেছে—ভুললে চলবে না—সব সাধনার মূলই ঐ সত্য, ধর্ম্ম, বেদ ও আচার। মহাশক্তির একমাত্র ইঙ্গিত—

"সত্যান্ন প্রমাদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমাদিতব্যং
বেদান্ন প্রমাদিতব্যমাচারান্নাপগন্তব্যম্"

"ভুলের বশেও সত্য ও ধর্ম্ম থেকে পরিভ্রষ্ট হয়ো না, বেদ থেকে পরিচ্যুত হয়ো না আর আচার থেকে উৎপথে যেও না।" এই আর্য্য-ধর্ম্মের মূল কথা। অন্যসব অনুষ্ঠান ভক্তের কল্পিত ইঙ্গিত ও সহজ-সাধ্য পথ মাত্র। এ কল্পনার মূল হল মন। পঞ্চদশীতে এই মন নিয়ে চমৎকারভাবে সাধনতত্ত্ব বোঝান হয়েছে।

মন—রাজা দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ সে। এক একটি ইন্দ্রিয় দিয়ে সে এক একটি বিষয় জানতে পারে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে সে আকুলিত হয়—ইন্দ্রিয় যখন থাকে সচেতন। মন তাদের নায়ক। কিন্তু মনের তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। এখন যেমন মানুষ বাত পিত্ত, কফ, এই তিন গুণে বা সত্ত্ব, রজঃ, তমের আশ্রয়ে বিভিন্ন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়—মনও তাই। সত্ত্বগুণে সে যখন মাতে তখন বৈরাগ্য, ক্ষমা, উদারতা প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার হয় তার; যখন রজ-গুণে মাতে তখন সে লোভে, ক্রোধে, কামে হয় জর্জরিত আর তমোগুণে অভিভূত হলেই তার হয় আলস্য, ভ্রান্তি, তন্দ্রা।

সাত্ত্বিকগুণে পুণ্যের পথে সে এগোয়—রজঃর প্রভাবে মায়া ও পাপের উৎপত্তি হয় আর তমোতে পরমায়ু ক্ষয় ও জীবন হয় ব্যর্থ; অতএব এর সাধনায় মন তখনই সিদ্ধিলাভ করবে যখন সেই রাজা-মন ইন্দ্রিয়ের দাস না হয়ে ইন্দ্রিয়কে দাস করে। ইচ্ছামত শব্দ স্পর্শ

রূপ, রস ও গন্ধের আস্বাদ নিয়ে ইচ্ছামত সত্ত্ব রজঃ তমোর প্রভেদ-জ্ঞানে ইপ্সিত পথে যেতে পারে।

কিন্তু যাওয়ার পথে বাধা আসে তখন তার। মনের সিংহাসন হ'ল অন্তঃকরণে—তার আবার চারটি পায়া—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আর চিত্ত—মনের পথে সে দেখা পায় 'সংশয়ের', বুদ্ধির পথে তার দেখা হয় 'নিশ্চয়ের', অহঙ্কারের পথে দেখতে পায় 'গর্ব্বকে' আর চিত্ত দেখতে পায় "স্মরণ-পথ"। এখন মনের মানুষ যখন বোঝে ঐ সংশয়, নিশ্চয় আর গর্বের চেয়ে ভাল আমার স্মরণ, তারই স্মরণ নিলে আসবে কামিত সম্পদ—তখন সে করে ব্রহ্ম-স্মরণ, মন্ত্র-স্মরণ, দেবতা-স্মরণ।

বিশেষ ধর্ম্ম

এই মন্ত্র, দেবতা বা ব্রহ্ম—আর তাদের উপাসনার রীতি নিয়ে ভারতের হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ যে কার্য্য প্রণালী দেখা যায়, মোটমাট তাকে ভাগ করা যায় এগার রকমে।

১। বৈদিক ধর্ম্ম।

২। স্মৃতি-শ্রুতি-পুরাণাদিসম্মত দৈবী জগত বা দেব-পদ-ধারীর প্রতি বিশ্বাস.

৩। কর্ম্ম ও সংস্কারে আস্থা।

৪। শ্রাদ্ধ ও জন্মান্তরবাদ।

৫। অবতারবাদ বা বিভূতি-তত্ত্বে বিশ্বাস।

৬। উপাসনা, সাধনা ও যোগ পদ্ধতি।

৭। মূর্ত্তিপূজা, তীর্থ ও পীঠরহস্য।

৮। শুদ্ধাশুদ্ধ ও স্পর্শাস্পর্শ বিচার।

৯। যজ্ঞ বা মহাযজ্ঞ।

১০। বর্ণাশ্রম ও সমাজ-রীতির প্রতি আস্থা।

১১। সগুণ ও নির্গুণ তত্ত্ব ও মুক্তি-কাম।

১। **বৈদিক ধর্ম্ম**—বৈদিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে বেদাধ্যায়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। বৈদিক ধর্ম্মে বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞই প্রধান আর সেই মন্ত্র বা গানই তার আকর্ষণীয় সম্পদ! এই গানের জন্য সামবেদকে ভগবান শ্রেষ্ঠ বলেছেন। আর সেই গানের মধ্যেই পাই আমরা **শব্দ-ব্রহ্ম**।

"শব্দ-ব্রহ্মং পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতীতনু"—শব্দ-ব্রহ্ম মানে শাস্ত্র আর পরব্রহ্ম হচ্ছেন তুরীয় চৈতন্য—এ দুই আমার নিত্যশরীর।

বাক্য জড় বটে কিন্তু সে যখন শব্দ ব্রহ্মে পরিণত হয় তখন সেই শব্দই মন্ত্র হয়, মন্ত্রশক্তির প্রভাব—আত্মদর্শন করায়, জীবন দান করে, রোগমুক্তি করে, কল্যাণ করে। এ ধারণা নয়,—প্রত্যক্ষ সত্য।

এখন এই মন্ত্র টিঁকে আছে আমাদের দশবিধ সংস্কারে, আমাদের বেদ উপনিষদের গ্রন্থে আর পূজাপার্বণে ও উৎসবে। 'বন্দেমাতরম্' বলে আজ যেমন লক্ষ প্রাণ মন্ত্রশক্তির উত্তেজনায় রাজনৈতিক যুদ্ধ-বরণে মরণকে আলিঙ্গন করে—তেমনিই নানা মন্ত্রে নানা দেবতার নানা স্তব, স্তুতি ও পূজার প্রচলনে মানুষ সামাজিক জীবনের দুঃখ ভুলে—সুখের আশা করে—বিপদের মধ্যে সান্ত্বনার পথ খুঁজে পায়।

অবশ্য বৈদিক যুগে মন্ত্র বা গান সকলের প্রিয় হলেও, সঙ্গে ছিল তার হবন, ধ্যান ও সাধনা। পরবর্ত্তী তন্ত্রশাস্ত্রেও আছে এর স্বীকৃতি—

মননান্মন্ত্রমিত্যাহুর্ধ্যানাদ্ধ্যানং প্রচক্ষতে,
সমাধানাৎ সমাধিঃ স্যাৎ হবনাৎ হোম উচ্যতে

—মনোবৃত্তির প্রক্রিয়ায় সাধ্য হ'ল মন্ত্র, ধারণা বা চিন্তনের পথই হ'ল ধ্যান, ইষ্টদেবতার স্বরূপে আত্মসমাধানেই সমাধি আর হবনের জন্যই হোম।

এই হ'ল বৈদিক তত্ত্বের শেষ কথা—মূল কথা তার 'ব্রহ্মকে জান' আর তার কর্ম্ম পথ বা হবন, ধ্যান, সমাধি ও মন্ত্র।

অ-বৈদিক ধর্ম্ম

কিন্তু যখন বেদের সহস্র শাখা লোপ পেতে বস্‌লো, লক্ষ লক্ষ আর্য্য সন্তানের বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করা হ'ল কঠিন—সমিধ সংগ্রহ থেকে সুরু ক'রে পবিত্র ঘৃতেরও হল অভাব, পয়স্বিনী গাভীর অভাবে ঘৃত হ'ল দুষ্প্রাপ্য, যখন পর্ব্বত-প্রমাণ পশুমাংসে আহুতি হ'ল অসম্ভব, যখন হোমাগ্নি-মধ্যে ভগবান বৈশ্বানরের আবির্ভাব এবং 'বরং বৃণু' ব'লে বরদানে উন্মুখ হওয়া, কল্পনার আশ্রয়ে গল্পকথার সামিল হ'ল তখন বেদ-বিধি হয়ে উঠ্‌লো অবজ্ঞেয় এবং ক্রমে হ'ল অবিশ্বাস্য। তাই ঋষিগণ হয়ত তখন বল্‌লেন, সাধনার পথে এগিয়ে চল—সমাধি লাভ ক'রে আত্মাকে পরমাত্মায় বিলীন কর।

ক্রমে যখন তাও হ'ল অসম্ভব—প্রকৃত গুরুর অভাবে কৃত সাধনার অক্ষমতায় ও বিকৃত সংযমের আধিক্যে সাধনাও হতে চল্ল নিষ্ফল তখনও আর্য্যঋষি বল্‌লেন—ইষ্টের ধ্যান কর।

সে ধ্যানেও যখন আসে চাঞ্চল্য, মুদিত নয়নে আসে তন্দ্রা বা নানা অসার চিন্তা কিংবা ভাবনা তখন ঋষি বল্‌লেন—থাক ওসব ; শুভ মন্ত্র পাঠ কর। শব্দব্রহ্ম তোমাকে ধীরে ধীরে পথ দেখাবে—ধ্যানের শক্তি দেবে—সংযত করতে সাধনার পথে নেবে—সমাধি সহজ হয়ে আত্মা পরমাত্মায় লীন হবে। তাই ক্রমে মন্ত্রই হল আমাদের প্রধান আশ্রয়—আর তাই নাম, জপ, কীর্ত্তন, স্তুতি, মন্ত্র ও তন্ত্র হয়ে উঠলো, বিভিন্ন পথের ধারক ও বাহক।

মননাৎ পাপ তন্ত্রাতি মননাৎ স্বর্গমশ্নুতে
মননান্মোক্ষমাপ্নোতি চতুর্ব্বর্গ ময়ো ভবেৎ।

যাঁর মনন হেতু জীব পাপ থেকে ত্রাণ পায়, যাঁর মননে জীব স্বর্গ ভোগ করে—মননে যাঁর জীব মোক্ষ লাভ করে—যাঁর দ্বারা জীব এই ভাবে চতুর্ব্বর্গময় হয়ে যায়—সেই জিনিসই হ'ল মন্ত্র। আর সে মন্ত্রের ল মৃকেন্দ্র গান—সামগান—বেদগান।

২। **দৈবী জগত**—ভারতে হিন্দু ধর্ম্মে প্রত্যেক প্রধান কর্ম্মেই ঐ দেবতা। ব্রহ্মের প্রতীক রূপে এক এক শক্তিকে আমরা দেবতা মেনে নিয়েছি। সত্য কেউ ইন্দ্র ছিলেন কিনা জানি না, বুঝি না তবু সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ সবই আমাদের দেবতা। আর তার নিবাস স্থানকে আমরা সাধারণ ভাবে মনে করি দেবলোক।

দেবতা ও দেবলোক—সাধারণতঃ ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক এই ত্রিলোক। এ ছাড়াও অন্য মতে বা ধারণায় তল, অতল, বিতল প্রভৃতি নীচের সাতটি লোক এবং ভূ, ভুবঃ, স্ব, মহ প্রভৃতি উপরের সাতটি লোক এই চোদ্দটি লোক বা জগতের অস্তিত্ব আছে। নীচের লোকে থাকে অসুর আর উর্দ্ধ ৭টি লোকেই থাকে দেবতা, তাই সেটা দেবলোক। তাছাড়া আবার স্বর্লোকটিই দেবলোকের রাজধানী বলে কথিত। যা দেখিনি তা নিয়ে মতবাদ বিভিন্ন তো হবেই। তবে শাস্ত্রে তার ব্যাখ্যাটি অপূর্ব্ব।

শাস্ত্রেই আছে নীচের সাতটি লোক তো তমোগুণে ভরা কিন্তু উপরের সাতটির মধ্যে ভূ, ভুবঃ ও স্বর্লোকে দেবতা থাকেন বটে তবুও এ তিন লোকেই আছে ইন্দ্রিয়-সুখ। তারও উপরে চতুর্থ লোকে থাকেন সেই দেবাত্মা যাঁরা ইন্দ্রিয়-সুখ ত্যাগ করেছেন। তারও উর্দ্ধে পঞ্চম লোকের অধিকার তাঁদের—যাঁরা ইন্দ্রিয় ও মনের উপর করেছেন আধিপত্য বিস্তার। তারও উর্দ্ধে ষষ্ঠ লোকে ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির উপর আধিপত্য যাঁদের তাঁদের বাস আর তার উপর সপ্তম লোকের অধিবাসী সেই ব্রহ্মবিৎ যিনি পূর্ণ আধিপত্য করেছেন—ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির উপর তো বটেই এই প্রকৃতির উপরও। তার আর বন্ধন নেই, জন্ম নেই—জন্মান্তরহীন তিনি। অতএব ইন্দ্র চন্দ্র যদি সুরলোক বা স্বর্লোকের অধিবাসী হন তবে যোগপ্রভাবে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বা প্রকৃতির উপর যার আধিপত্য তাঁরা ব্রহ্মবিৎ—তাঁরা ইন্দ্র-চন্দ্রের চেয়েও বড়। আর বড় বলেই রামের ইষ্টদেব বশিষ্ঠ। ইন্দ্রের মত রাজা—ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কাছে তাঁকেও নিতে হয় জ্ঞানের উপদেশ।

এখন সত্য এই দেবলোক আছে কিনা এবং ইন্দ্র-চন্দ্র প্রভৃতি সত্যই দেবলোকবাসী দেবোপাধিধারী কিনা এ নিয়েই যত গোল। তবে এটা যে শুধু ভারতে বা হিন্দু ধর্ম্মেই আছে তা নয়— এ রকম দেব-ধারণা আছে প্রায় সব ধর্ম্মে—সর্ব দেশে।

আমরা বলি—ইন্দ্র স্বর্গের রাজা বটে, তবে যম ধর্ম্মরাজ ; তিনি পাঠান পাপীকে নরকে, পুণ্যাত্মাকে স্বর্গে। তাঁর দুই মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত ও বিচিত্রগুপ্ত। চিত্রগুপ্ত হিসেব রাখেন পুণ্যের, বিচিত্রগুপ্ত পাপের।

এ ছাড়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তো আছেন—আছেন শঙ্করাদি দ্বাদশ রুদ্র, পাবকাদি অষ্ট বসু, বিষ্ণু প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য। তাছাড়া, ব্রহ্মা, মনু, বিশ্বকর্ম্মা, স্কন্দ, আছেন আবার দেব-লোকবাসী সপ্তর্ষি, মহর্ষি আছেন, পিতৃলোকে পিতৃ-মাতৃ আত্মীয়েরা আছেন। হিন্দুধর্ম্ম এই রূপ বিশ্বাস করে ঐতি-হাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে অথবা কল্পনার প্রেরণা নিয়ে। কল্পনা করলো পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমের রূপকে—ধরিত্রী বরুণ, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ বা ইন্দ্ররূপে। এখানেও অজ্ঞেয় ব্রহ্মের সৃষ্টি থেকে ব্রহ্ম প্রতীকের রূপ জাগলো মনে। অগ্নি—দাহ্য শক্তি তার, তাই রক্তবর্ণ অগ্নি দেবতার হুতাশন-দীপ্তি, উগ্ররূপ, লেলিহান ভঙ্গিমা। আবার সূর্য্যদেব জবাকুসুম সঙ্কাশ মূর্ত্তি, সপ্তাশ্ব রথারূঢ়,— অরুণ তার সারথী। এমনি করেই চতুর্দ্দিকে সৃষ্টিকর্ত্তার দৃষ্টি, কল্পনা তাই ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ। সেনাপতির দৃষ্টি চতুর্দ্দিকেই শুধু নয়—উপরে ও নীচে তাই কার্ত্তিক ষড়ানন। জ্ঞানের উজ্জ্বল শুভ্ররূপে সরস্বতী শুক্লা —গানের সুরে শব্দ-ব্রহ্মের রূপে তিনি বাগ্‌দেবী বীণা-ধারিণী, ব্রহ্মাণী। এমনি করেই হয়তো না-দেখা দেবতা নানারূপ ধরেছেন।

তবে সে কি শুধু ভারতে ? খৃষ্টধর্ম্মে স্বর্গলোক ও নরকলোকের বর্ণনা দেখি, দেখি দেবতা-সহায়ে কুমারী মেরীর গর্ভে যীশুর জন্ম— এমন কি স্বর্গের চাবি যীশু দিয়ে গেলেন প্রধান শিষ্যের হাতে। মৃত্যুর পর স্বর্গে যীশুর সঙ্গে শিষ্য-সাধকদের সালোক্য ও সামীপ্যে মুক্তি-

লাভের কথা, আবার পাপীদের নরকভোগের কথা—এমন কি স্বর্গ থেকে মহাত্মাদের কাছে দৈববাণী প্রেরণ—এমন সব কথাও আছে ঐ খৃষ্টধর্ম্মে। তাঁরা গীর্জায় গিয়ে সেই সব কথাই বলেন—শোনেন—ভাবেন, আর মুসলমান ধর্ম্মেও তাই। কোরাণশরীফ গ্রন্থে জানা যায় যে মহম্মদ সাহেব প্রয়োজনে নিজেই একবার ঘুরে এসেছিলেন স্বর্গে—তাদের ফরিস্তে, আর তাদের শয়তানই আমাদের অসুর। মুসলমান বলে স্বর্গে ও নরকে সুখ দুঃখের বর্ণনা আছে—আছে জিন্নাদ বা প্রেতলোকের বর্ণনা। পার্শীধর্মেও 'দেবা' আর 'অহুর' স্বীকৃত। হিন্দু-ধর্ম্মের মতন স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ জীবের নক্ষত্র, মাস বা তিথির সঙ্গে আধিদৈবিক সম্বন্ধ ও স্বর্গলোক প্রাপ্তির ইঙ্গিত আছে ঐ পার্শীধর্ম্মে—আগুন ও জল তাদেরও দেবোপাধিধারী। আমাদের বুদ্ধধর্ম্ম বা জৈনধর্ম্ম এ সত্যের স্বীকৃতি আছে কথা ও কাহিনীতে। দৈবী-জগতে বিশ্বাস আছে প্রায় সর্বত্র, সর্বদা ও সর্ব্ব-মানবের মধ্যে।

কর্ম্ম ও সংস্কার—এ নিয়ে আমরা শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্রে আলোচনা করছি। এইখানেই হিন্দু বৈদিক 'একমেবং' তত্ত্ব ছেড়ে ধীরে ধীরে যেন এগিয়ে এসেছে প্রতীক ও প্রতিমা পূজার দিকে।

তবে কর্ম্মজগতে আমরা দেখি সাধারণত তিনটি স্তর—সহজকর্ম্ম, ঐশীকর্ম্ম আর জৈবীকর্ম্ম।

সত্ত্ব, রজঃ আর তম এই তিনটি গুণের আশ্রয়ে পঞ্চভূতের প্রকাশই হ'ল সহজ কর্ম্ম—আহার, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা এইসব এর অন্তর্গত। পূজাপাঠ সেখানে নেই—তা আছে ঐশী কর্ম্মে—দেবদেবীর পূজা-পার্ব্বণে। আর জৈবী কর্ম্ম হচ্ছে বিবাহ, সহবাস, ভোগ, ত্যাগ, সংসার এইসব। আবার এই যে কর্ম্মের প্রেরণা তার জন্য দর্শন বলে যে কর্ম্মীর মনে সংস্কার, অহঙ্কার বা পূর্ব্ব জন্মের ধারণা আসে তার চিত্তাকাশ, চিদাকাশ আর মহাকাশে।

চিত্তাকাশে আঁকা থাকে স্মৃতি—স্মরণ, কল্পনা। চিদাকাশে থাকে শরীররূপী ঘট বা মঠের কথা। যেমন ঘরে বসে মানুষ দেখে

ঘরের আকাশ—তেমনই শরীর রূপ ব্রহ্মাণ্ডের স্মরণে আসে যে সংস্কার আর মহাকাশ, মানে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কথা ব্রহ্মের কথা তখন আসে মনে, কর্ম্ম দ্বারা ক্রমিক গতি-পথেই মানুষ মহাকাশে উন্নীত হয়। আর তারই—সাধন-পথ সহজ করতে আমাদের নানা অনুষ্ঠান, দশবিধ সংস্কার ও কর্ম্মকাণ্ড।

৪। **শ্রাদ্ধ ও জন্মান্তরবাদ**—বিগত আত্মার প্রতি বা পরলোক-গত পিতৃকুল বা আত্মীয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনই শ্রাদ্ধের মূল—এ নিয়ে আমরা অনেক কথাই বলেছি ধর্ম্মসূত্রের সংস্কার-প্রসঙ্গে। তাই এখানে আলোচ্য হচ্ছে শুধু জন্মান্তরবাদ। তবে আত্মার শেষ নেই এ যখন সকলে মেনে নিয়েছেন—তখন সে আত্মাকে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের মধ্যে যেমন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় তেমনই সেই আত্মার কোন আধারে থাকাও মেনে নিতে হয়। আত্মা অমর—কিন্তু আধার তার অটুট নয়—একঘট বদলে অন্যঘটে তিনি বিরাজ করেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

মানুষ যেমন পুরোনো কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরে তেমনি দেহী জীর্ণ বা পুরোনো দেহ ছেড়ে নতুন দেহ প্রাপ্ত হয়।
গীতায় ভগবান বলেছেন—আত্মার শেষ নেই—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

আত্মা জন্মে না—মরে না—আত্মা অজ নিত্য ও শাশ্বত। অতএব আত্মার যে শেষ নেই—আত্মা যে নতুন দেহে এসে বসে

একথা আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে জন্মান্তরবাদকেই সমর্থন করে। তাছাড়া বেদ-পুরাণে জন্মান্তরের কাহিনীও আছে প্রচুর।

এযুগেও স্বয়ং বুদ্ধদেব নিজেরই পূর্ব্বজন্মের নানাকথা বলেছেন জাতকে—। জৈনধর্ম্মেও জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত।

তবে এক সম্প্রদায় আছে তারা জন্মান্তর মানেন না বটে তবে— নিঃশ্রেয়স-কারিণী আর অভ্যুদয়-কারিণী শক্তি—কর্ম্মফলে সুখ-দুঃখ ভোগ, পাপপুণ্যের দ্বারা জীবনাবসানে জীবের পরিণতি—পুণ্যকার্য্যের ফলে ভগবৎরাজ্যে গমন—এসব স্বীকার করেন আর তা একরকম একজন্মের পর অন্য অবস্থা বা জন্মেরই কথামাত্র।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও—উদ্ভিজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ যোনী থেকে চুরাশী লক্ষ যোনী ভ্রমণের সিদ্ধান্ত ও জন্মান্তরবাদকে সমর্থন করে।

বিশ্বের প্রায় সর্ব্বত্র ও সর্ব্বজাতির মধ্যে এ জন্মান্তরবাদকে মেনে নেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে পাশ্চাত্ত্য জগত পর্য্যন্ত Spiritualism বা পরলোক-বিদ্যার অনুশীলনে তৎপর। পরলোক-গত আত্মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত তাঁরা বলতে চেষ্টা করছেন।

এ দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব, গতি ও অন্যত্র থাকার কথা যখন আমরা স্বীকার করি, তখন প্রেতলোক থেকে তাকে দেবলোকের অধি-বাসী হবার কামনায় তর্পণ এবং শ্রাদ্ধই বা অবিশ্বাস করবো কেন?

৫। অবতারবাদ বা বিভূতি-তত্ত্ব

অবতার কি সত্য? সত্যই কি ভগবান অবতার-রূপে দেখা দেন?

আমাদের হিন্দুশাস্ত্র তো বেদে-পুরাণে পদে পদে বারে বারে একথা স্বীকার করে গেছেন। শুধু বৌদ্ধগণই বুদ্ধকে অবতাররূপে বর্ণনা করেননি, জৈন-ধর্ম্মীরাও ঋষভদেবকে অবতার বলে মেনেছেন। মুসলমান বলেছে তাঁদের মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত মানব আর যীশু তো ভগবানেরই ছেলে। শুধু মানেনি দুটি দল—এক নাস্তিক দল, তারা ভগবানই মানে না। মানবে আবার তাঁর অবতার? আর

মানেন না যাঁরা আস্তিকের উর্দ্ধে পৌঁছেছেন—সেই পরমহংস বা ব্রহ্মজ্ঞরা—কারণ তাঁরা ব্রহ্ম ছাড়া প্রতীক, প্রতিমা বা মনুষ্যরূপী ঈশ্বর-ধারণায় আবদ্ধ নন। তবে তারা নিজেরা না মানলেও তাদের উপদেশে—এমন কি স্বয়ং ভগবানের অমৃতময় উপদেশ—গীতাতে কিংবা চণ্ডীতেও পাই অবতারতত্ত্বের স্বীকৃতি।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সাধুদের পরিত্রাণের জন্য দুষ্কৃতদের বিনাশ কারণ আর ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই।

অতএব ভগবান প্রয়োজনে অবতাররূপে আসেন। এ ভগবদ্বাণী—বেদবাণী। কিন্তু অবতীর্ণ হন তিনি কি রূপে? শুধু কি মনুষ্যরূপে? তবে ঐ মৎস্য, কূর্ম্ম অবতার কি? আবার যুধিষ্ঠির হলেন যমের অংশ—ভীম হলেন বায়ুর অংশ, এই বা কি? অবতারতত্ত্বের আলোচনা করতে এসবও তো জানতে হবে—শুধু ভগবান এলেন রাম আর কৃষ্ণরূপে—এ বললে আজকের মানুষ তৃপ্ত হয় না।

অবতারের মাধ্যমে আমরা দৈবী জগত ও এই বাস্তব কর্ম্মজগতের বেশ একটা সংযোগ দেখতে পাই। পরমাত্মা এলেন অযোধ্যায় রাজার ঘরে, আবার বৃন্দাবনের লীলা-কুঞ্জে। ভক্তের এক পরম আশ্রয় এই অবতার। কিন্তু বিজ্ঞান বা দর্শনের দিক দিয়েও এর একটা বিচার আছে।

কলা ও আবেশ-অবতার

এ সংসারের সর্ব্বজীবে পরমাত্মার অংশ এ আমরা পেয়েছি দৈবী জগত আলোচনায়। কিন্তু সব জীব তো এক রকম হয় না—বুদ্ধি বা জ্ঞানে, কর্ম্মে বা ধর্ম্মে, ধী বা শ্রীতে সব কি এক কোঠার পাত্র? কেউ বড়, কেউ ছোট। ছোট বড় সবার মধ্যে পরমাত্মার অংশ তো আছেই তার প্রভাব সর্ব্বত্র একরকম নয়—বেশী-কম। তবে যখন

কোন এক বিশেষ প্রয়োজনে, কোন এক দেহ বিশেষে সে প্রভাব পূর্ণরূপে বিস্তার করতে হয়—তখনই হয় অবতার।

গীতায় ভগবান বিভূতি যোগ বর্ণনায় 'অহমাত্মা গুঢ়াকেশো' বলে সুরু করে আদিত্য, রুদ্র, সিদ্ধ কপিল, মহর্ষি বা ভৃগু সকলের মধ্যেই নিজ বিভূতি-বিস্তারের কথা বলেছেন—এমনকি দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, অনন্ত নাগ, গন্ধর্ব্ব কিন্নর সবার মধ্যেই তাঁর বিভূতি। হিমালয় গিরি, অশ্বত্থ বৃক্ষ, সামবেদ, মন-ইন্দ্রিয়—সর্ব্বত্র তার বিভূতির প্রকাশ একথা বলেছেন প্রিয় অর্জ্জুনকে। কিন্তু সে বিভূতির স্তরভেদও তো আছে। তবে কি সে স্তরভেদ ?

ভগবানের সৃষ্ট যে মন তাকে সাধারণভাবে অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত এই তিনস্তরে ভাগ করা যায়। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি সিদ্ধযোগীরা যেমন পরমাত্মাকে জেনেছেন, অধ্যাত্মস্তরের মন যাঁদের তাঁরা ঈশ্বরকে জেনেছেন অনিমা, লঘিমা, গরিমা প্রভৃতি দৈবসিদ্ধির মাধ্যমে ; তাঁদের মন অধিদৈব স্তরের, আর যাঁরা মাত্র এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চময় জগতের মাধ্যমে তাঁকে পান, তাঁদের মন আধি-ভৌতিক স্তরের মন।

ভগবান গীতায় বলে গেলেন—এই তিন স্তরের মধ্যেই আমি আছি এ যে জানবে সেই মুক্ত। তবে এ সব স্তরে এসেছেন ভগবান মানব-পিণ্ডের মাধ্যমে—রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এঁরাই সেই মানব মূর্ত্তি। মানুষের প্রয়োজনে যাঁকে আসতে হবে—তাঁকে মানুষের সমাজের জন্য মানুষের পরিবেশের মতন হয়ে মানুষরূপেই তো আসতে হবে ! তবে তিনি দেবপিণ্ডের মাধ্যমেও আসেন আর তারই নিদর্শন ঐ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ। দেবতারূপে এলেন না—এলেন দেবত্বের প্রভাবে অলৌকিকরূপে। তাই মৎস্য-কূর্ম্মরূপে সে অবতার।

সাধারণ ভাবে আমরা কিন্তু অবতারের প্রায় সব অবতারেই দেখি বিষ্ণুর অবতার। শিবের অবতার বা ব্রহ্মার অবতার তেমন দেখি না—এরও কারণ আছে। সৃষ্টি করে ব্রহ্মা খালাস, আর লয়ের বেলায় শিবের প্রলয় নাচন। কিন্তু রক্ষা করা,—সমাজ-শৃঙ্খলার

জন্য নীতির প্রচার এবং অবশেষে শাসন ও ধর্ম্মের ধারণ এ সবই তো রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণুর কাজ! বিষ্ণুর সেই দশাবতার সাধারণের জন্যে থাকলেও—কেউ কেউ বলেন অবতার তার চেয়েও বেশী—অসংখ্য।

এরও কারণ আছে। ভগবান সর্ব্বজ্ঞ—অবতারে তাঁর বিভূতি পূর্ণ, তাই তাঁরাও সর্ব্বজ্ঞ। তবে তার মধ্যে আবার দুই ভাগ। এক কলা-অবতার, অন্য আবেশ-অবতার। ষোড়শ কলা পূর্ণ হলে যেমন পূর্ণচন্দ্র—তেমনই পূর্ণ কলায় ভগবান রামচন্দ্র পূর্ণাবতার, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার; কিন্তু ভৃগু, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধদেব এরা হয়ত আবেশ-অবতার অর্থাৎ ভগবানের পূর্ণ অংশের এক বিরাট অংশে অপরূপ ভাবে তাঁদের আবির্ভাব।

পূর্ণ ষোড়শ কলায় আবির্ভূত নন অথচ ভগবানের এই সব দেবাংশের প্রভাব থাকে কারও কারও উপর! যেমন যমরাজের—তিনি পূর্ণাবতার নন, কলাবতার আবার যমরাজের কলার অংশে জন্ম যুধিষ্ঠিরের, আর তাঁর আবেশে আবির্ভাব বিদুরের।

আবার কোন কোন অবতারে দেখি দুটি দেবের কলা বা অংশ। হনুমানে তাই বায়ু ও রুদ্রের বিভূতি।

আবার শুধু কি দেবতার অংশই দেখা দেয় কলায় বা আবেশে। অসুরের অংশে বা কলায় আবির্ভূত হন কেউ কেউ—যেমন দুর্যোধন বা রাবণ।

আবার দেবতা বা অসুরই নয়—দেবলোকস্থ মহর্ষিদের অংশ বা কলা অথবা আবেশেও আবির্ভূত হন অবতাররূপী মহামানব। যেমন ছিল বেদব্যাসে মহর্ষির আবেশ ও বিষ্ণুর কলা, কপিলের আবির্ভাবে দেখি ঋষি ও ভগবানের বিভূতি যোগ। একথা আমাদের নয়—মহাভারতে স্বয়ং ভীষ্মদেব বলে গেছেন যে আমার মধ্যে আর আচার্য্য দ্রোণের মধ্যে অসুরের আবেশ আবির্ভূত হয়েছে।

জগতের মহামানব মাত্রই অবতার, ভগবানের বিভূতি বা কলায় তার পুষ্টি। তাই কোটিপতি থাকে নিখিল জগতের শ্রদ্ধার বাইরে—

আর ভিক্ষু বুদ্ধদেব, সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর, প্রেমাকাঙ্খী চৈতন্য—দীন দরিদ্র রামকৃষ্ণ সারাজগতে অবতারের পূজা পান। এঁরা অবতার—আর ঐ যে বিজ্ঞানে জ্ঞানে সহসা চমক লাগিয়ে এক একজন জাগেন চিরস্মরণীয় হয়ে, তাঁরাও বুঝি তাঁরই কলায় পূর্ণ—তাঁরাই বুঝি আমাদের রামানুজ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ—গান্ধী। ভগবানই বলেছেন—আমার বিভূতি পেয়েই সর্ব্বজগতে সর্ব্বজীব শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হন—আমরা তাঁকে যাই বলি, তাঁরাও অবতার। তবে প্রতিমা গড়াই আজ আমরা দশাবতারের—কৃষ্ণ, বিষ্ণু, কালী, শিবেরই বটে কিন্তু হয়ত আগামীকাল গড়বো রবীন্দ্র—বিবেকানন্দ—গান্ধী—সুভাষের পবিত্র প্রতিমা—হয়তো নূতনতম গ্রন্থে তাঁরাই হবেন নূতনতর অবতার।

৬। যোগ ও উপাসনা

যোগ অর্থে বিয়োগ নয়—যাকে পাবার জন্য সাধকের সাধনা তার সঙ্গে যোগ হয়ে যাবার যে পথ তাকেই বলে 'যোগ'। আর সেই পথ হচ্ছে নিরন্তর তাকে স্মরণ—এই নিরন্তর স্মরণ হলো উপাসনা।

পাতঞ্জল-সূত্রই যোগ-দর্শনের মূল গ্রন্থ। পাতঞ্জল যোগ-সূত্রে বলেছে—"যোগশ্চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধঃ"। চিত্তবৃত্তি নিরোধ বা সংযমই যোগ অর্থাৎ কর্ম্মময় জগতে কর্ম্মের ফাঁসে বাঁধা পড়লে—টানাটানিতে সে-ফাঁস যদি জড়িয়েই যায়, জট পাকাবে—বন্ধন হবে আরো দৃঢ়—আর সুকৌশলে জড়ান ফাঁস যদি খোলা যায় মুক্তি আসবেই। এই ফাঁস খোলাটাই হবে চিত্তবৃত্তি নিরোধের ব্যবস্থা। যোগ-সাধকের কতকগুলি নিয়ম গুরুর নিকট জেনে, যদি কামিত পরমাত্মার নৈকট্য বা সামীপ্য লাভ হয়—যোগে যদি তার মন উপ+আস মানে সমীপস্থ হয়—তবেই উপাসনা সার্থক।

কিন্তু উপাসনা রীতি ও নীতির উপর তো আমাদের বিশ্বাস হওয়া চাই। আজকাল বিজ্ঞানবিদ্ বলবেন—যা দেখি না, তা বুঝি না,

বিশ্বাস করি না। নিশ্চিত বিজ্ঞান (Exact Science) চাই আমাদের। তবে বিজ্ঞানাগারে রসায়নশাস্ত্রে যে ভাবে একের সঙ্গে অন্য জিনিস মিলিয়ে প্রমাণিত হয় তার অনুসন্ধানের বস্তু—ধর্ম্মে কি তা সম্ভব! হয়তো তাও হয়—তবে সে তো অনেক উঁচুতে উঠলে—নীচের আমরা সেই উঁচুতে পৌঁছুনো লোকের কথাই বিশ্বাস করি।

আমরা করি ব্যাস, বাল্মীকি, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, কপিল, কণাদের কথা বিশ্বাস—বিশ্বাস করি শ্রীকৃষ্ণের গীতা। অন্য ধর্ম্মও তো তাই। যীশু বলেছিলেন—"আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি"—তাঁর সেই কথার বিশ্বাসে গোটা ধর্ম্ম চলেছে—গোটা সম্প্রদায় অনুসরণ করেছে। প্রধান শিষ্যরা শুধু বলতে পেরেছে—"আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করেছি।"

আমাদের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরাও বলেছেন—"আমরা কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছি।" সবাই কি আর প্রত্যক্ষ দেখেছেন। বিশ্বাস, ভক্তি, আনন্দ, প্রেম নিয়েই এ বিশ্বাস—তাতেই পাই সান্ত্বনা আর শান্তি।

কিন্তু এই যোগ-বিদ্যা অনেকটা প্রত্যক্ষ লিখিত বিজ্ঞান। আসনে বসো—প্রাণায়াম কর—দেহ ও মনকে বিন্দুস্থ কর—দেখবে তুমি সব পার। আকর্ষণ বিকর্ষণের শক্তি এসেছে, দাহ্য শক্তি তোমার কাছে নত হয়েছে—আর দেহ থেকে দেহান্তরে ঘুরে আসবার ক্ষমতা পেয়েছে তোমার আত্মা। আরও উর্দ্ধে যাও—দেখবে মিশে গেছো তাঁতে—যোগ হয়েছো তোমার সেই অদ্বৈত ও অসীমের সঙ্গে।

অবশ্য খুব কঠিন হলেও অসম্ভব তা নয়—শুধু অভ্যাস, শুধু সংযম, শুধু চিত্তবৃত্তি নিরোধে মনের স্থিরতা বা বিন্দু-ধ্যান। অভয় দিতেই যেন শ্রীভগবান গীতায় বললেন—অতি-ভোজনকারী, আবার অধিক উপবাসশীল, অধিক জাগরণশীল, আবার অধিক নিদ্রালু, অতিরিক্ত কর্ম্মী, অথবা নিষ্কর্ম্মা তাদের কেহই যোগী হইতে পারে না।

কোনটারই বাড়াবাড়ির দরকার নেই নিয়ম করে—অভ্যাসে আয়ত্ত কর, কতকগুলি আসন প্রাণায়াম কর—মনকে নিজের বশে আন—হেসে-খেলে তাঁর দেখা পাবে।

প্রাণায়াম ও নাড়ীশুদ্ধি—এখন এই আসন-প্রাণায়ামের মাঝে আছে নাড়ীশুদ্ধির কথা—আমরা তার উল্লেখ ক'রে ন্যাস প্রাণায়ামের একটা ধারণা ক'রে নিতে পারি। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যে দেখতে পাই এই ক্রিয়ার একটা ইঙ্গিত। যার মর্ম্মানুবাদ করলে অনেকটা দাঁড়ায়—"প্রাণায়াম দ্বারা যে মনের মল বিধৌত হইয়াছে, সেই মনই ব্রহ্মে স্থির হয়।" এইজন্যই শাস্ত্রে প্রাণায়ামের বিষয় কথিত হয়েছে। প্রথমে নাড়ীশুদ্ধি করতে হয়, তবেই প্রাণায়াম করবার শক্তি আসে। নিয়মটি এমনই ভাবের—

"বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ নাসা ধারণ করিয়া বাম নাসিকার দ্বারা যথাশক্তি বায়ু গ্রহণ করিতে হইবে, মধ্যে বিন্দুমাত্র সময় বিশ্রাম না করিয়া বাম নাসিকা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু রেচন অর্থাৎ বাহিরে করিতে হইবে। পুনরায় দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া যথাশক্তি বাম নাসিকা দ্বারা বায়ু রেচন। আহোরাত্রে চারিবার অর্থাৎ উষা, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও নিশায় এইরূপ পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া তিনবার অথবা পাঁচবার অভ্যাস করিবে। এক পক্ষ অথবা এক মাসের মধ্যে নাড়ী শুদ্ধি হইলে প্রাণায়ামের অধিকার হইবে।

এর বেশী আর প্রত্যক্ষ কাজের ধারায় আমরা এগুবো না। কারণ গুরুমুখী বিদ্যা বা গুরুর কাছে হাতে নাতে না শিখে, এসব বই পড়ে করতে গেলে দেহের আভ্যন্তরিক বিঘ্ন ঘটতে পারে। তবে এমনই করে সুরু হয় যোগশাস্ত্রের অনুষ্ঠান বা কর্ম্ম।

যোগদর্শন—উপাসনা বা যোগকে কতকগুলি সাধন-ক্রিয়ার শৃঙ্খলাবদ্ধ অভ্যাস বলেছে—যেমন সংযম, প্রাণায়াম বা ধ্যান। যোগী হবার জন্য উন্মুখ যাঁরা, তাঁরা মোটামুটি চার পথে এগিয়ে গেছেন। এই

চার পথ হলো হঠযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ, আর মন্ত্রযোগ। এর পরও আবার আছে জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ।

হঠযোগ—হঠযোগ হলো শরীর থেকে আত্মাকে পৃথক করে পরমাত্মায় লীন করার সাধনা। জন্ম থেকেই দেহীর দেহ ও আত্মা থাকে জড়িয়ে আর মৃত্যুর পর দেহ থাকে পড়ে আর আত্মা যায় দূরে —উর্দ্ধে বা অধোদেশে। এখন হঠযোগী নিজের চেষ্টায় জীবিত অবস্থাতেই—প্রাণায়াম, ব্রহ্মচর্য্য বা আসনাদি দ্বারা আত্মাকে দেহ থেকে বের করে যে কোন স্থানে যেতে, যে কোন কাজ করতে বা যে কোন জিনিস দেখতে পারেন। দেহ ও দেহাতীত মনের গতি নিয়েই তাঁদের কারবার। অনেকে এও বলেন যে হঠযোগ কেবল স্থূল দেহ নিয়েই ব্যস্ত—এর উদ্দেশ্য শুধু দেহকে সবল করা—দীর্ঘ আয়ু, নীরোগ শরীর তাঁদের কাম্য। হঠযোগ শরীরের যে কোন পেশী নিজ বশে আনতে পারেন—হৃদয়ের গতি স্তব্ধ রাখতে পারেন—শরীরের সব অংশে স্বেচ্ছায় যে কোন ভাবে চালাতে পারেন—আগুন, পাহাড়, বেগ, বা ওজন তার আত্মাকে পোঁছে দেন ভগবৎ সমীপে। পাশ্চাত্ত্য জগতে অনেকে ভাবেন হঠযোগীর অদ্ভুত শারীরিক ক্রিয়া-কলাপই বুঝি ভারতীয় যোগ-সাধনার চরম উৎকর্ষ। বিজ্ঞানীরা অবশ্য নিশ্চিত বিজ্ঞানের খানিকটা রূপ দেখে অভিভূত হবেন কিন্তু উর্দ্ধগামী ব্রহ্মবিদ্ বা জ্ঞানযোগী তাই হঠযোগের শক্তিকে তুচ্ছই মনে করেন।

তবে মনে হয় হঠযোগ বৈদিক যুগ থেকেই প্রচলিত ও ঋষি মহর্ষি কর্তৃক অনুসৃত। হঠযোগে যে সমাধি হয় তার নাম মহাবোধ সমাধি। হঠযোগের সাতটি অঙ্গ এবং তার ধ্যানের বস্তু হলো 'জ্যোতি'—জ্যোতির কল্পনা যেখানে, সেখানে দেবতা বা বিগ্রহ, প্রতীক বা প্রতিমার কোনই স্থান নেই।

মন্ত্রযোগ—তারপর পাই মন্ত্রযোগ—নাদ-ব্রহ্মের উপাসনা এই মন্ত্রযোগ। জীব-জগতে মানুষ বুদ্ধিমান হয়েও, রূপের মোহে আর নামের মোহে বদ্ধ হয়। এই রূপ ও নামের উপাসনা করেই

মানুষ তার প্রতিক্রিয়ায় রূপ ও নামের মোহকে জয় করে। তবে তোমার আরাধ্যের রূপ চিন্তা কর—প্রিয়তমের নাম নাও, দেখবে তোমার আমার আধিভৌতিক রূপ ও নাম কোথায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

এই জন্যই বিশেষ বিশেষ রূপ ও নাম বা ধ্যান ও মন্ত্র অথবা দেব-প্রতিমা ও স্তুতি বা কীর্ত্তন মানুষ যোগ করে দেয় পরমাত্মার সঙ্গে। এই থেকেই কিন্তু অদ্বৈতভাবের সঙ্গে ধীরে ধীরে দ্বৈতভাবের প্রকাশ। যোগের মধ্যে প্রিয় দেবতার সঙ্গে মধু-মিলনের সাড়া।

জপ এই মন্ত্রযোগেরই এক অঙ্গ—জপ এক মহাযজ্ঞ। "যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোঽস্মি"—বলেছেন ভগবান।

লয়যোগ—এর পর লয় যোগে আমরা পাই হঠযোগের জ্যোতি সাধন ও মন্ত্রযোগের নাদ-সাধনের মিলনে জাত বিন্দু-সাধন।

হিন্দু দর্শন বলে এই ব্রহ্মাণ্ড আছে দেহ-ভাণ্ডে। তাই পরম যোগী যাঁরা তাঁরা দেহ পিণ্ডের মধ্যেই তাদের তীর্থ-পীঠ বা ইপ্সিত স্থান খুঁজে নেন—সব পান তাঁরা এই দেহ-ব্রহ্মাণ্ডে। এমন কি সৃষ্টির মূল যে পুরুষ ও প্রকৃতি এরও অস্তিত্ব দেহে। তবে তারা যাবৎ মিলিত না হয় দেহ থাকে কামনায় চঞ্চল—কাছে আছে তবু মিলন হয় না। তাই সুরু হয় যোগের চেষ্টা। লয় যোগের আট অঙ্গে চলে সাধনা—ধ্যানে তখন তাঁর বিন্দু। দুটি বস্তুর মিলনে যে বিন্দুর উৎপত্তি সেই বিন্দুতে চিত্ত লয় হলেই ব্রহ্মবিন্দুর সাক্ষাৎ হয়। এই হ'লো লয় যোগ। মনে হয় পুরুষ প্রকৃতির এই মিলন ও বিন্দু স্থাপন নিয়েই পরবর্ত্তী তন্ত্রের বহু সাধনার আভাস ও ইঙ্গিত।

রাজযোগ—তারপর হলো রাজযোগ। রাজযোগে বাহিরের ধ্যান ধারণা, মন্ত্র বা কর্ম্ম থেকে—এমন কি দেহ বা আত্মার সংযম থেকেও অন্তঃকরণের বৈশিষ্ট্যের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। অন্তঃকরণই জীবকে বন্ধনে ফেলে—আবার সেই অন্তঃকরণই সাধন-ফলে জীবনে মুক্তি দান করতে পারে।

অতএব অন্তঃকরণের মুক্তি তো সর্ব্বপ্রকার যোগীর পক্ষে কাম্য। হঠযোগী, লয়যোগী, মন্ত্রযোগীর শেষ কামনা তো অন্তঃকরণের চির মুক্তি। অন্তরের অন্তরে অন্তরতমকে ধরবার চেষ্টাই হ'লো রাজ-যোগ। অরণ্যে নয়, প্রাণায়াম আর আসনে নয়—চিৎকার করে মন্ত্র পাঠেও নয়—রাজার মতন রাজযোগী অন্তরে তাঁর ইষ্টের আসন বিছিয়ে দেন।

এই অন্তরের চারটি লাগাম—মন, বুদ্ধি, চিত্ত আর অহংকার।

অন্তর থেকে বেরিয়ে অন্তঃকরণ যখন বাহির পানে ছোটে তখনই তার নাম মন। আবার মন যখন বাহিরে এসে এটা, ওটা, ভাল, মন্দ দেখে বিচার স্বুরু করে তার নাম পাল্টে হয় বুদ্ধি। আর মনের যে অংশটা কর্ম্মজগতে কাজের জন্য ছট্‌ফট করে সেটা হল চিত্ত। এই চিত্তের মাঝেই আঁকা থাকে স্মৃতি আর সে স্মৃতি বা বুদ্ধি বা চিত্ত যখন সজাগ হয়ে 'আমিত্বে' পাগল হয়—তখন তা হ'য়ে ওঠে অহঙ্কার। এই চারটি দেওয়ালের মধ্যে মন আর চিত্ত পাশাপাশি যুক্ত হয়ে থাকে আর বুদ্ধি ও অহঙ্কার থাকে আর একদিকে দল বেঁধে। চিত্তের কথায় মন ওঠে বসে আর অহঙ্কারের হাতে বুদ্ধির নাকে দড়ি।

অতএব অন্তঃকরণ সংযত করে বুদ্ধির সহায়তায় অহঙ্কার ভুলে শান্ত করে পরম পদার্থের সঙ্গে যোগ করে জুড়ে দিতে পারলেই আসে মুক্তি। রাজযোগে ধ্যেয় হল নির্গুণ ব্রহ্ম। এই সমাধির নাম নির্বিকল্প। সব যোগের শ্রেষ্ঠ এই রাজযোগ।

প্রাণায়াম, ধ্যান ও সমাধি

মোট যে চারটি যোগের কথা বলা হলো তার মধ্যে ধ্যান ও সমাধি—প্রাণায়াম ও ন্যাসের ফল প্রত্যক্ষ ভাবে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। জ্ঞান, কর্ম্ম বা ভক্তি যোগে অবশ্য সেটার প্রয়োজন তেমন আসে না, যেমন আসে হঠযোগে বা রাজযোগে। ন্যাস বা প্রাণায়াম যোগের একটি বিশেষ অঙ্গ—তবে তার প্রক্রিয়ার রীতি বা নীতি

জানতে বর্ত্তমান জগত উন্মুখ—কিন্তু সে গুরুর কাছেই শিখতে হয়—তবু তার একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

এখানে যোগের অঙ্গ—কথাটাকে একটু পরিষ্কার করে বোঝা যাক, নইলে এক এক যোগে কতকগুলি অঙ্গের মানে নিয়ে জট পাকাবে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ধরতে পারি এই রাজযোগকে। এই রাজযোগ অষ্টাঙ্গ যুক্ত। এই অষ্টাঙ্গ মানে আটটা খুঁটি।
১। যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ।

২। নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (শাস্ত্রপাঠ), ঈশ্বর-প্রণিধান (আত্মসমর্পণ)

৩। আসন—উপবেশনের প্রণালী।

৪। প্রাণায়াম—

৫। প্রত্যাহার—মনকে অন্তর্মুখী করা।

৬। ধারণা বা একাগ্রতা

৭। ধ্যান

৮। সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থা

যম আর নিয়ম তো নিজের অভ্যাসে আসবেই কিন্তু আসনের জন্য কসরৎ করতে হয় প্রত্যহ নিয়মিতভাবে; শারীরিক ও মানসিক কতক-গুলি প্রক্রিয়া করতে হবে—যাতে একভাবে বসে থাকতে পারা যায় দীর্ঘকাল। তবে এই আসন যার যেভাবে সুবিধা সেই ভাবেই বেছে নিতে পারেন। তবে মেরুদণ্ড সোজা রাখতেই হবে, বুক ঝুঁকিয়ে কোন কাজই হয় না। সব কাজের জন্যই চাই উন্নতশীর।

প্রকৃত প্রাণায়াম করতে কর্ম্মীর অনেককিছু করতে হয়—তার মধ্যে ঐ শ্বাস-প্রশ্বাসে নাড়ী-শুদ্ধি একটা দিক। প্রাণায়ামের প্রকৃত মানে হচ্ছে প্রাণের সংযম।

শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াকেই অনেকে প্রাণায়াম বলেন বটে কিন্তু তার চেয়ে বরং ফুসফুসের সঙ্গে সম্বন্ধটাই প্রাণায়ামের মুখ্য লক্ষ্য। ফুসফুসের গতিই তো সাধারণভাবে প্রাণ-বস্তু। সেটা থেমে গেলেই

মৃত্যু, অথচ শরীরের সব যন্ত্র ও পেশীর কাজ ঐ ফুসফুসের জন্য—তাকে কেন্দ্র করেই প্রাণ। সেই কেন্দ্রে একটা ধাক্কা—একটা শোক বা Shock মুহূর্ত্তের জন্য ফুসফুসের গতি বন্ধ ক'রে দেয়। শরীরের অনেক অংশ ইচ্ছামত আমরা বন্ধ করতে বা চালাতে পারি যদি তবে প্রাণকেই বা পারবো না কেন? একটা ধাক্কা, শোক বা Shock যদি প্রাণের বেগ রুদ্ধ করে, তবে প্রাণায়াম, সংযম, শক্তি তা বাড়তেও পারে। প্রাণের শক্তি বাড়লেই প্রাণারামকে পাবার ব্যবস্থা হয়।

একজন প্রাণ-শক্তি সম্পন্ন লোক—নিজের প্রাণকে কেন্দ্র থেকে ঈথারের বায়ুস্তরের মতন শক্তি-স্তরকে বর্দ্ধিত করে শরীরের অন্য অংশে, আবার শরীরের বাইরে—অন্যের শরীরে, অন্যের মনে নিশ্চয়ই ছড়িয়ে দিতে পারে। শুনলে তোমার প্রিয়তম কেউ মারা গেছে—প্রাণ শোকার্ত্ত হলো, শুনলে তোমার বহু ক্ষতি হয়েছে—ধন, জন, সব বিসর্জিত, প্রাণ-শক্তি মুষড়ে পড়লো। আবার এল প্রাণে নূতন চিন্তা, নূতন উত্তেজনা—দিলে বক্তৃতা, করলে ভগবৎ সঙ্গীত—প্রাণ মেতে উঠলো—অপরেও মাতলো, মহাপুরুষের মহাবাণীতে বিমুগ্ধ জনগণ—একের প্রাণ অপরের প্রাণ-শক্তিতে হলো পূর্ণ!

এই যে প্রাণের শক্তি—এই তো প্রণায়াম। ডাক্তারি শাস্ত্রেও আছে যে স্নায়ুকেন্দ্র শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রগুলিকে নিয়মিত করে, তার প্রভাব স্নায়ুপ্রবাহগুলির ওপরও আছে আর সে স্নায়ুকেন্দ্র বুকের ঠিক উল্টোদিকে—মেরুদণ্ডে।

অতএব মেরুদণ্ডকে ঠিক করে—শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিজ ইচ্ছায় অভ্যাসে নিয়মিত ক'রে স্নায়ুচক্রের উপর প্রভাব বিস্তার করা চলে।

এখন কেউ যদি এই স্নায়ু-শক্তিকে একই কেন্দ্রে নিয়ে যেতে পারে তবে সে অদ্ভুত শক্তির অধিকারী হতে পারে। এই স্নায়ু-কেন্দ্র হলো ব্যাটারি বা বিদ্যুৎ-শক্তির আধার। বোতাম টিপলেই সে ছুটবে—যেদিকে তার পাবে। বেটারিটাই তখন কুণ্ডলিনী-শক্তি, তাকেই জাগরিত করবার জন্যে দরকার এই প্রণায়ামের।

প্রাণকেন্দ্র বা স্নায়ুকেন্দ্র থেকে যে তড়িৎশক্তি ছুটবে সে বিভিন্ন লাইন ধরে ভিন্ন ভিন্ন ঘর বা আধার আলোকিত বা শক্তিময় করতে পারে। একটা "তার" হয়ত যাবে জ্ঞানের কোঠায়, অন্য "তার" কর্ম্মের কোঠায়, অন্য ভক্তির কোঠায়। কিন্তু প্রাণ-কেন্দ্র বা স্নায়ুশক্তির আধারটি আগে মশলা দিয়ে পূর্ণশক্তি করে নিতেই হবে।

এখন এই জ্ঞান আর কর্ম্মের যে "তার" তাকেই বলেছেন যোগীগণ ইড়া আর পিঙ্গলা। ইড়া দিয়ে জ্ঞানের পথে শক্তি অন্তর্মুখী হয়, পিঙ্গলা দিয়ে হয় কর্ম্মের পথে সে বহির্মুখী।

আবার ব্যাটারী আর তার ছাড়া, বেতারেও যে শক্তি চলাচল হচ্ছে। প্রাণ বা মনের কোঠায় জ্ঞান বা কর্ম্মের তার বাঁধা থাকলেও বোধের যেখানে উদ্ভব সেই মস্তিষ্কের শক্তি কোন তারের অপেক্ষা রাখে না—সে বে-তার। তবে তাতেও শক্তি সঞ্চার করতে হয়—অন্যভাবে, অন্যযন্ত্রে। সেটাই হলো সুষুম্না। সাধারণের হাতে সুষুম্নার শক্তি থাকে অজ্ঞতার নীচে পড়ে—অসাধারণের হাতে তাই আসে ঊর্দ্ধে। স্মৃতি, স্বপ্ন এসব আসে মায়ায়—কোন যোগ নেই—প্রত্যক্ষ গতি নেই, স্পর্শ নেই—মনে হয় প্রায় বে-তারের কাণ্ড। এরও শক্তি হয়তো প্রথমে মূলাধারে থাকে সঞ্চিত—কুণ্ডলিত। ক্রমে যোগ-ক্রিয়া বলে কুণ্ডলিত সে শক্তি কুণ্ডলিনীরূপে যখন মূলাধার থেকে বেরিয়ে বিনা তারে সুষুম্নার পথ ধরে এগিয়ে যায় তখন চৈতন্যময় কেন্দ্রে তার অনুভব হয়।

এই কুণ্ডলিনীকে চৈতন্য করাই তত্ত্বজ্ঞান। জ্ঞানাতীত পরমশক্তি সে। কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধার থেকে সুষুম্নার পথে প্রবাহিত হয়ে একই লক্ষ্যে—সেই চৈতন্যে স্ফুরিত হয়।

রাজযোগ এই পথেরই ইঙ্গিত দেয়। মন—চিত্ত, বুদ্ধি, অহং-কারকে অন্তর্মুখী করে অন্তঃকরণের শক্তিতে ও প্রাণায়ামজাত স্নায়বিক-প্রভাব ঐ কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত ক'রে—চৈতন্য উপলব্ধি করে।

তখন সে প্রত্যাহার ও ধারণার মাঝে ধ্যানের মাধ্যমে সমাধিস্থ হয়। অভ্যাস দ্বারা মনকে দৃঢ় ও সংযত করে ধ্যানে নিযুক্ত হতে হয়। প্রথমে স্থূলবস্তুর ধ্যান, তারপর ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বস্তুতে ধ্যান—চরম অবস্থায় অর্থাৎ সর্ব্বশেষ নির্ব্বিকল্প ধ্যানে সে তখন হয় কৃতকার্য্য।

এই ধ্যান-লব্ধ সমাধির পথে সাধারণে তো আসতেই পারে না—যোগীরাও নিজ নিজ অলৌকিক শক্তিতে মোহিত হয়ে তাই আঁকড়েই পড়ে থাকেন। সেই সব মোহ ত্যাগ করে মন-সমুদ্রের সকল বৃত্তি-তরঙ্গ রোধ করে তাকে আসতে হয় সেই চরম সমাধির অবস্থায়। আর তা সম্ভব এই রাজ-যোগে।

স্বামী বিবেকানন্দ এই রাজ-যোগের প্রাধান্য দিতে গিয়ে বর্ণনা-প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে বলেছেন—

"হৃদ-পদ্মে, মস্তকের ঠিক মধ্যদেশে বা দেহের অন্যস্থানে মনকে ধারণ করার নাম ধারণা। মনকে এক স্থানে সংলগ্ন করিয়া, সেই একমাত্র স্থানটিকে অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া কতকগুলি বৃত্তিপ্রবাহ উত্থাপিত করা হইল; অন্যবিধ বৃত্তি-প্রবাহ উঠিয়া যাহাতে ঐগুলি নষ্ট না করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে করিতে প্রথমোক্ত বৃত্তি-প্রবাহ-গুলিই ক্রমে প্রবলাকার ধারণ করিল এবং শোষোক্তগুলিই কমিয়া কমিয়া শেষে একবারে চলিয়া গেল; অবশেষে এই বহুবৃত্তিরও নাশ হইয়া একটি বৃত্তিমাত্র অবশিষ্ট রহিল; ইহাকে ধ্যান বলে। যখন এই অবলম্বনের কিছু প্রয়োজন থাকে না—সমুদয় মনটিই যখন একটি তরঙ্গ-রূপে পরিণত হয়, মনের এই একরূপতার নাম সমাধি। তখন কোন বিশেষ প্রদেশ অথবা চক্র বিশেষকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান-প্রবাহ উত্থাপিত হয় না, কেবল ধ্যেয় বস্তুর ভাব মাত্র অবশিষ্ট থাকে। যদি মনকে কোন স্থানে ১২ সেকেণ্ড ধারণ করা যায়, তাহাতে একটি ধারণা হইবে; এই ধারণা দ্বাদশ গুণিতে হইলে একটি ধ্যান এবং এই ধ্যান দ্বাদশ গুণ হইলে এক সমাধি হইবে।"

বর্ত্তমানে খুব বেশী আগ্রহ দেখা যায় এই প্রাণায়াম, ধ্যান ও সমাধির অবস্থা জানতে। অথচ সত্যই এ গুরুমুখী বিদ্যা—গ্রন্থের বিষয় নয়। আবার গ্রন্থ না থাকলেও সাধারণকে বোঝাবার কোন উপায়ও থাকে না। তাই গুরুকল্প স্বামিজীর ভাষাতেই বললাম ধ্যান ও সমাধির কথা।

আমরা শাস্ত্রীয় যে ক'টি যোগের কথা বললাম, তারপর অন্য যোগের উল্লেখ দেখি গীতায়। তন্মধ্যে জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগের কথাই সাধারণে প্রচলিত বেশী। অন্যান্য সব যোগের কথা গীতাতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে—আমরাও এসম্বন্ধে খানিকটা বলেছি, তবু এখানে আমরা জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিযোগের সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে নিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করবো।

জ্ঞানযোগ মূলতঃ সাংখ্যযোগ, উপনিষদ ও বেদান্তের যুক্তি ও মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের উপদেশে রাজযোগ হঠযোগ মন্ত্রযোগ ও লয়যোগের মাধ্যমে বাস্তব জগতে ও স্বকীয় জীবনে মায়ার কথা যখন বুঝে নিতে পারে, চেতনায় আসে মানুষের স্বরূপের কথা, ঈশ্বর ধারণায় ক্রমবিকাশে তার বোধশক্তি যখন আকৃষ্ট হয়, যখন বেদান্তের পথে উপনিষদের মতে সাধক মায়া ও মুক্তি, ব্রহ্ম ও জগত, মৃত ও অমৃত, ক্ষয় ও অক্ষয়, বহুত্ব ও একত্বের কথা জানে, নিজের বোধ-বশে যখন সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন করে, তখনই সে জ্ঞানযোগের সাধক হয়। যার অপরোক্ষানুভূতি এসেছে অর্থাৎ "কোন ধর্ম্ম বিশেষে, স্থান বিশেষে, ধর্ম্ম বিশেষে ঈশ্বর আবদ্ধ ন'ন" এই জ্ঞান এসেছে—সে যখন জেনেছে আত্ম-নিত্য, মুক্ত-স্বভাবের রূপ—বেদান্তের কথা তার কর্ম্মে প্রতিফলিত করতে পেরেছে, জ্ঞান-বলে বোধ-লাভে উন্নীত হয়েছে, তখনই সে জ্ঞানযোগের সাধক।

কর্ম্মযোগের কথাতেও মানুষ কৌতূহলী! বেদান্তের মতে মানুষ যদি বোঝে বাস্তব সংসার সবই অসার—নশ্বর এই দেহ, জীব ও জীবন তবে সেই জীব-জীবনে, কোন কর্ম্মের মধ্যেই যোগের পবিত্রতা

অনুভব করতে পারে না। সত্যই এ কেমন করে সম্ভব? যোগ ব্যাপারটাই অরণ্যের মধ্যে সাধিত হয়েছে যা পরবর্ত্তী কালে উপনিষদে স্থান পেয়েছে। অনেকের ধারণা উপনিষদে শুধু অরণ্যবাসী ঋষির কথাই আছে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। সমগ্র উপনিষদটাই সংসারস্থ কর্ম্মীর উপদেশ। সংসারত্যাগী বনবাসী ঋষি সেই উপদেশের শ্রোতা। সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজনৈতিক কর্ম্মের মধ্যে অভিনিবিষ্ট রাজা প্রবাহণ বা জনকাদি রাজর্ষিগণই দিয়েছেন, শ্বেতকেতু বা আরুণি প্রভৃতি ঋষিদের উপনিষদের উপদেশ।

অতএব কর্ম্মী দিয়েছে যোগধর্ম্মীকে উপদেশ। কর্ম্ম দেখিয়েছে ধর্ম্মের পথ,—কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগের কথা ঘোষণা করেছে।

সে কর্ম্মযোগকে কি ছোট বলা যায়। প্রতি ধর্ম্ম গ্রন্থই বলেছে গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম—প্রকৃত কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তবে সে কর্ম্ম হবে আদর্শ পথে, নিষ্কাম মতে, জীব ও সংসারের কল্যাণ-কল্পে অনুষ্ঠিত, স্বার্থের মোহ থাকবে না—অসূয়া বা দ্বেষের পঙ্কিলতা থাকবে না, থাকবে না বঞ্চনা, আর থাকবে না অহমিকার গ্লানি। নচিকেতার পিতা বিরাট যজ্ঞে করেন পশুদান, গোদান। কিন্তু গরুগুলো জরা-জীর্ণ, অর্দ্ধ-মৃত, এক চক্ষুহীন বা খঞ্জ। ছেলে নচিকেতা দেখলে, বাবা 'দান' করছেন বটে কিন্তু মরা গরু ব্রাহ্মণকে দিচ্ছেন। কি করেন, পিতা তিনি, তবু তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্যে বললেন, বাবা, আমাকে কার হাতে দান করবেন। পিতা বললেন, তুমি আমার পুত্র, তোমাকে কেন দান করবো। পুত্র বললেন, প্রিয় দ্রব্য দান করাই তো ধর্ম্ম, বলুন আমাকে কার হাতে দান করবেন। পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'যমের হাতে'।

হ'লও তাই। নচিকেতা গেলেন যমের বাড়ী। যম বাড়ী ছিলেন না, এসে দেখলেন নচিকেতা। ক্ষমা চাইলেন যম,—অতিথি আপনি, তিন দিন অপেক্ষা ক'রে আছেন, আপনাকে আমি তিনটি বর দেবো। নচিকেতা ইচ্ছামত বর চাইলেন—প্রথম বরে চাইলেন পিতার সন্তোষ, দ্বিতীয় বরে জানতে চাইলেন স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত যজ্ঞ-প্রণালী

জানতে, আর তৃতীয় বরে জানতে চইলেন মৃত্যুর স্বরূপ কি ? মৃত্যুকে অমৃত্যু বা অমৃত দিয়ে বাধা দেওয়া যায় কিনা ?

স্বয়ং যমরাজ মৃত্যুলোকের রাজা—তিনিই দেখিয়ে দিলেন মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়ার পথ। এই উপদেশই উপনিষদের মহাবাণী।

মরা গরুর গল্প বলতে এই কথাই বলা হ'ল, ফাঁকির ভিতে কর্ম্ম হয় না। রামচন্দ্র যখন বনে নিঃসহায়, বালির পিণ্ড দিয়েছিলেন পিতৃশ্রাদ্ধে, তাও সার্থক হয়েছিল।

এই নিষ্কাম কর্ম্ম সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়েছেন ভগবান তার সখাকে। কর্ম্ম হবে নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, সত্য ও কল্যাণময়—কর্ম্মে চরিত্রের প্রভাবই প্রথম ও প্রধান। তার পর মনে করতে হবে নিজের কাজে, নিজের পথে কেউ ছোট নয়—কর্ত্তব্যই তার মূল। জজ সাহেব তাঁর কাজে ত্রুটি না করলে যেমন আদর্শনীয়, দারোয়ান দোর আগলে রাখতে যদি দৃঢ় হয়, সেও তেমনি আদর্শস্থল।

কর্ম্ম তো আমরা সব সময় করি। সব কাজই তো কর্ম্ম। কিন্তু কর্ম্মযোগে প্রকৃত কর্ম্মই করণীয়। কাজ দিয়ে মানুষের বিচার হয় বটে, কিন্তু তার মনের গতি দিয়েই সে বিচার নিষ্পন্ন হয়। হয়তো জেদের বশে কেউ একটা দান ক'রে পস্তালো বা উত্তেজনায় একটা ডাকাত বা চোর দেশের স্বাধীনতাকামী যুবকদের সঙ্গে হঠাৎ মিলে গিয়ে গণ্ডগোলে শত্রুকে মেরে বসলো, তাতে কি তার কর্ম্মের বিচারহয় ? হয় না। দেখতে হবে, চরিত্রের কোন প্রভাবে সে তা করলো, কর্ম্মযোগ এই প্রভাবকে নিয়ন্ত্রিত ও মহান করে। কর্ম্মের মধ্যে আত্মার জাগরণ হবে, পরের জন্য প্রাণ কাঁদবে, আত্মসুখের থেকে পরের সুখ হবে শ্রেষ্ঠ—কর্ম্মের ফলাফল সব ভগবানে অর্পিত হবে, তবে না সেই কর্ম্ম কর্ম্মযোগের গৌরবে গৌরবান্বিত হবে। বার বার শাস্ত্র তাই বলেছে—

ন মিথ্যা ভাষণং কুর্য্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ
দেবতাতিথি পূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ ॥

এই কর্ম্মের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ ও অধম আছে। ভগবান গীতায়

বলেছেন যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করে মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সমূহ স্মরণ করেন, সে কপটাচারী মূঢ়চেতা। অর্থাৎ মন আছে পুঁটুলিতে—ইন্দ্রিয় সংযম ক'রে তিনি পূজোয় বসলেন সে অধম।

আর যে ব্যক্তি মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে অনাসক্ত ভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ মনকে করবে সংযত—ইন্দ্রিয় হবে কর্ম্মী। তার মানে ধর্ম্ম হবে নিষ্কাম—ভাবতে হবে আমি কিছু করছিনা। কর্ত্তা কর্ত্তা ভাব যেন না আসে। গীতার কথা—প্রকৃতির গুণে ইন্দ্রিয় দ্বারা কাজ হয়ে যাচ্ছে—আমি করছি এ অহঙ্কার কেন?

প্রকৃতে! ক্রিয়মানানি গুণেঃ কর্ম্মানি সর্ব্বশঃ
অহঙ্কারা বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।

সব সময় মনে রাখতে হবে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন—কর্ম্মে আমার চির অধিকার কিন্তু ফলে আমি নিষ্কাম—এই তো কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মের প্রকৃত অনুষ্ঠান আছে আমাদের শাস্ত্রে, আমাদের সংস্কারে যা আমরা আগে আলোচনা করেছি।

ভক্তি যোগ—এর পরই হলো ভক্তিযোগ। কর্ম্মের পথ ধরে যা এসে গিয়েছে বৈদান্তিক ভারতের বুকে—অব্যয়, অদ্বৈত, আর্য্য-ধর্ম্মে, ভক্তির পথে তাই হলো মূর্ত্ত, সুন্দর, আনন্দময়। ভক্তি-যোগী যোগ চায় না—এমন কি বুঝি স্বর্গ, মোক্ষ, মুক্তি কিছু চায় না—চায় শুধু তার প্রিয়, তার ইষ্ট, তার আরাধ্যের সঙ্গে চিরমিলন। আমাদের বৈষ্ণবগণের মধ্যে যে ভাবধারা দেখি, তারই অভিব্যক্তি দেখি গীতায়—

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রেচ তথা মানাপমানয়োঃ
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ
তুল্য নিন্দা স্তুতি-র্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।

যাঁর শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান, মান অপমান সমান, যিনি শীত ও উষ্ণতা,

বা সুখ ও দুঃখে আসক্ত হ'ন না, যাঁর কাছে নিন্দা ও স্তুতি তুল্য,—মৌনী, সদা-তুষ্ট, বাস-ভবন-হীন, স্থিরবুদ্ধি ও ভক্তিমান আমার প্রিয়।

সব যোগের মধ্যে ভক্তি যোগই বড়। যা অরণ্যের ঋষি সংসারের ও সংসারের গৃহী সকলের মনে সহজে জাগতে পারে বৈদিক যজ্ঞে আর প্রতিমা পূজোয়, ধ্যানে-নামে-মন্ত্রে সহজেই আসতে পারে—তা' ঐ ভক্তি'।

কিন্তু কি এই ভক্তি? নারদ ভক্তি সূত্র বললেন—

'সা কর্ম্মে চিৎ পরমা প্রেমরূপা'—কাহারও প্রতি পরম প্রেমই হলো ভক্তি। কিন্তু শাণ্ডিল্য সূত্র বলে—

'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'—তাহাতে পরম অনুরক্তিই ভক্তি। ধ্যান, ধারণা যাগ-যোগ না বলে, বললেন প্রেম-অনুরক্তি বা ভক্তি। এখন এই প্রেমের জন্য চাই আধার। নিরাকার অদ্বৈততে প্রেম দেওয়া বড় কঠিন—কাকে ভালবাসি তাই জানি না। সে যখন জানবো তখন তো অনেক উঁচুতে। কিন্তু যখন জানি না—তখন আধার একটা ধরতে হবেই, তাই প্রেমের আধার রচনা করতে গিয়েই এলো অবতার-তত্ত্ব এলো প্রতীক—গড়লাম প্রতিমা। অবতার রূপে এলেন, নরসিংহ, পরশুমরাম, রাম, কৃষ্ণ—প্রতীকরূপে পেলাম, সূর্য্য, চন্দ্র হনুমান—প্রতিমা হলো কৃষ্ণের, চৈতন্যের। শেষে গৌর-ভক্ত হয়ে কৃষ্ণ প্রেমে মেতে উঠলেন ভক্ত। চৈতন্য-ভক্তের এই ভক্তি, আবার দুইভাগে ছয় রূপে প্রকাশিত।

প্রথম ভাগে—হৈতুকী, গৌণী. বৈধী। আর দ্বিতীয় ভাগে অহৈতুকী, মুখ্য, রূপাত্মিকা।

মনে তখন ভাগবৎ-ভাব আসেনি—ভক্তিযোগ জাগেনি, তাই অভ্যাসযোগের জন্য বিধি সুরু করলাম। ন্যাস প্রাণায়ামের মতনই এ এক কর্ম্মের অভ্যাস—ফুল তুলি, গান গাই, মন্দির পরিষ্কার করি, শাস্ত্রপাঠ বা কীর্ত্তন করি—অঞ্জলী দিই—মন্ত্র পড়ি, প্রতিমা সাজাই। এসব করি যখন, তখন 'হেতু' আছে—আমার যেন মুক্তি হয়, যেন স্বর্গ

হয়—আমার সংসারে যেন শান্তি আসে, এই হেতুই আমার ভক্তি—আর তাই সে ভক্তি—গৌণী ভক্তি। তারই জন্য যত বৈধী ক্রিয়া।

কিন্তু যখন ঐ বিধি-বাঁধন থাকবে না—হেতু যাবে ঘুচে—গৌণ নয়, একেবারে মুখ্য হবে প্রেমের ঠাকুর—তখন হবে রাগাত্মিকা ভক্তি।

ধ্রুবের জীবনে এই দুই প্রকার ভক্তিই প্রস্ফুটিত। ধ্রুব ছিলেন উত্তানপাদ রাজার ছেলে। রাজার ছেলে সুখ চান, আদর চান কিন্তু পান না। একদিন ধ্রুব বাবার কোলে গেলেন বসতে—বিমাতা করলে তিরস্কার—মাকে করলে অপমান। দুঃখে ধ্রুব গেলেন বনে।

এই বনে তাঁর সাধনা—হেতু ঐ দুঃখের নিবারণ ক'রে ভগবান পথ ক'রে দেবেন। এ তার অটুট ভক্তি, তবে হৈতুকী ভক্তি, তাই ভগবান তার কাছে তখন গৌণ। আসল হ'লো মায়ের দুঃখ দূর এবং নিজের অধিকার-প্রাপ্তি। ধ্রুবের জীবনে প্রথম এলো তাই বৈধী ভক্তি। বিধিবৎ সাধনা করতে নারদ দিলেন দীক্ষা।

সাধনায় তুষ্ট হয়ে এলেন ঠাকুর—বললেন, বর নাও।

ধ্রুব তখন আসল জিনিস পেয়েছে, তার দীপ্তিতে মোহ গিয়েছে ঘুচে। ধ্রুব বললেন—

"স্থানাভিলাষী তপসিস্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নাপ দিব্য রত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে

—"পদের আশায় তোমায় পাবার সাধন ক'রে প্রভু,
তোমায় পেলাম—শতেক মুনি পায়নি যারে কভু
খুঁজেছিলাম কাচের ঢেলা রত্ন পেলাম আমি,
কৃতার্থ আজ, আর কোন বর চাইনা ওগো স্বামী।"

ভাব এল ধ্রুবের প্রাণে—এল পরমানন্দের জন্য অনুরাগ। হৈতুকী গৌণ ও বৈধ ভক্তি গেল ধ্রুবের মন থেকে দূরে, এল অহৈতুকী মুখ্য এবং রাগাত্মিকা ভক্তি।

ভক্তপ্রবর রামানুজও বলেছেন—বিবেক, বিমোক, (ইন্দ্রিয়ের অন্তর্মুখী গতি) অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ, (আলস্য-হীনতা) প্রভৃতি আটটি গুণেই আসে ভক্তি। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, উচ্ছৃঙ্খলতা, দুশ্চিন্তা, কৌটিল্য, বহুবালাপ প্রভৃতি হ'লো কুতর্ক আর ধর্ম্মের আড়ম্বর ভক্তি নয়। শাস্ত্র আড়ম্বরকে নানাভাবে নিন্দা করেছে। তাই ধনী ও ধন ভক্তের চিরশত্রু।

যীশু বলেছিলেন—"বরং সূচের ছিদ্রের ভিতর দিয়া উটের যাওয়া সহজ তবু ধনী ব্যক্তির স্বর্গে প্রবেশ করা সহজ না।"

এমনই গল্প আছে অন্যভাবে মহাভারতে—একদা কলি মহারাজ পরীক্ষিতের রাজ্যে গেলেন · একদিনও কাটলো না। —থাকার যো নেই। রাজা বললেন, আমার রাজ্যে আপনার থাকা চলবে না।

তখন কলি বলে—কোথায় যাব? কোনো জায়গা আমাকে দিন।

পাপ পূর্ণ হলেই কলি, তাই পরীক্ষিৎ বললেন—যাও তুমি দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান, স্ত্রীসঙ্গ ও জীবহিংসা যেখানে, সেখানে স্থানাধিকার কর।

কলি বল্লেন—চার জায়গায় একসঙ্গে থাকি কি করে—অতএব এমন একটা জায়গা বলুন যেখানে চারটে জিনিসই পাব। পরীক্ষিৎ দিলেন তখন তাকে একটি স্বুবর্ণ-পিণ্ড অর্থাৎ অর্থ। এই স্বুবর্ণ পিণ্ডের মধ্যেই রইল দ্যূতক্রীড়া, স্ত্রীসঙ্গ, মদ্যপান আর জীবহিংসা।

ধন তাই পরা ভক্তির একান্ত শত্রু। ভক্তি যেখানে সার, ভগবান সেখানে কিছু চান না—ধন জন মান কিছু নয়। তাই ব্যাধের আচরণ, ধ্রুবের বয়স, সুদামার দৈন্য, বিদুরের দারিদ্র্য, কুব্জার রূপ, চণ্ডালের জাতি, শবরীর উচ্ছিষ্ট কিছুই ভক্ত ও দেবতার মিলনে বাধা দেয়নি। পারেনি।

অবশ্য ধনী হয়েও জনক তো পরমার্থ লাভ করেছেন। স্বয়ং ব্যাস-তনয় শুকদেব আশ্চর্য্য হলেন এই ভেবে যে রাজ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে রাজা জনকের বাস—তিনি দেবেন কি ক'রে পরমাত্মার উপদেশ। জনক

বুঝলেন—বললেন, ঠাকুর এই এক বাটি তেল নিয়ে আমার রাজ্যটা দেখে আসুন—রাজ্যের বিবরণ সমস্ত শুনতে চাই আপনার মুখে।

শুকদেব ঘুরে এলেন তেলের বাটি হাতে ক'রে।

রাজা প্রশ্ন করেন, শুকদেব একটি একটি ক'রে সে প্রশ্নের উত্তর দেন। রাজা সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, বাটীর তেল পড়েনি তো?

না—ঘুরতে ঘুরতে আমি সেদিকে ঠিক নজর রেখেছিলাম।

জনক হেসে বললেন—আমিও ঘুরি অমনি ক'রে আমার রাজ্যে। ঐশ্বর্য্যের মাঝে ঘুরেও দৃষ্টি থাকে আমার অন্যত্র। তাই আজ মিথিলা পুড়ে গেলেও আমার কিছুই পুড়বে না।

ভক্তিযোগের এইটুকুই সারকথা। তারপর গৌণ ভক্তির মধ্যে- সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক ত্রি-ভেদ আর ভক্তির বিবিধ রূপ—এ নিয়েও অনেক কথা আছে। সংক্ষিপ্ত পুস্তকে তা বলা যায় না। এ জানতে হলে আচার্য্যের কাছে জানাই ভাল। তাও সকলের অধিকার থাকে না—অধিকারী হতে হবে। এই অধিকারী হতে হলে তাকে যে ব্রাহ্মণ হতে হবে, দীক্ষাযুক্ত হতে হবে, যাজ্ঞিক হতে হবে তার কোন মানে নেই। শাণ্ডিল্য সূত্রে আছে—

"আনিন্দ্যযোন্যধিক্রিয়তে।" নিন্দ্যযোনি যে, চণ্ডাল সেও ভক্তিতে অধিকারী। ভক্তি কি ক'রে আসে বলতে গিয়ে মহাভক্ত শ্রীরূপ গোস্বামী বলেছেন—

'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ।
অথাসক্তি স্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবো ভবেৎ ক্রমঃ।

প্রথম হবে ধর্ম্মে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজন—ভজনে হবে পাপ দূর—অনর্থ মনেও আসবে না—তাতেই হবে নিষ্ঠা, তাতেই হবে রুচি—এই রুচির পর আসে আসক্তি, আসক্তি থেকে ভাব, ভাব থেকেই প্রেম।

প্রেমাবতার চৈতন্য আবার ভক্তি বা প্রেমের পথ আরও সহজ ক'রে দিয়েছেন—সৎসঙ্গ, ভগবৎ সেবা, ভগবৎ নাম ও তীর্থাবাসে আসবে প্রেম। প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যায় আধুনিক মতবাদ, বল্লেন Trianguler Love. অবশ্য তারা বলে দুটি ছেলে একটি মেয়ে—একটি মেয়ে আর দুটি ছেলে এই নিয়ে ঘটনার সংঘাত সৃষ্টির কথা। কিন্তু কথাটা এসেছিল মহৎ এক দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকে। সত্যই 'প্রেম' ত্রিকোণাত্মক।

একটি কোণে তার—প্রেমিক একজনকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারেনা। যেমন চৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেম, রাধার শ্যাম প্রেম। অন্য কোণ—যেখানে কোন কেনাবেচা নেই। যখনই ভক্তির বদলে এল প্রার্থনা বা চিন্তা—ভক্তি হয়ে গেল ব্যবসার জিনিস।

এক সর্ব্বহারা সন্যাসীর কৃপালাভের জন্য রাজা রাণী তাঁকে নিয়ে এসে বসালেন সিংহাসনে। যোগী আসতেই চাননা—তবু তাঁদের প্রেম দেখে এলেন।

তারপরই এলো প্রার্থনার হিড়িক। কেউ বলে আমাকে ছেলে হবার বর দাও, কেউ চায় ঐশ্বর্য, কেউ চায় ধন জন—

যোগী রেগে বললেন—তোমরাই তো ভিক্ষুক—আমাকে এনেছ ঐশ্বর্য্য দিতে? থাকলো সিংহাসন তোমাদের। প্রেম গেল হাওয়া হয়ে উড়ে।

প্রেমের তৃতীয় কোণ হলো—নির্ভয়—লোকভয় থাকবে না একটুও, যেমন ছিলনা শ্রীরাধার।

এই ত্রিকোণাত্মক প্রেমই ভক্তের ঠাকুর দেখা দেন।

এই ভক্তিযোগে মানুষ প্রেমের কাঙাল, প্রেমে পাগল হয়—কোন জ্ঞান, কোন বুদ্ধি থাকে না। তাঁর ভগবৎ নাম কীর্ত্তনে আসে স্বেদ—কম্প—শিহরণ—পুলক। কিন্তু এই ভক্তি যোগ প্রায়শঃ নানা ভাবে, নানা মতে, নানা পথে নানা আধার জুটিয়েছে। নানা দেব দেবীকে আবাহন করে পূজা করেছে। কিন্তু তাতেই বা কি —অন্তরে শ্রীরাধা অন্তরতম তার প্রিয়তমকে বসালেও জানেন রাধামাধব

নানা রূপে নানা ঘরে যায়। তাতে তাঁর কি, তাঁর ঘরে সে বাঁশী বাজায়। সুদর্শনধারী যাক কংস সভায়, রথের সারথী হয়ে যাক অর্জ্জুনের কাছে—পাঞ্চজন্য নিয়ে বাজাক কুরুক্ষেত্রে কিন্তু আমার ব্রজকুঞ্জে সে বাঁশী বাজাবেই। হোক তাঁর বৈষ্ণবী শক্তিরূপ, হোন তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর—ঘরে তিনি ব্রজবিহারী।

ব্রজে ভক্ত চূড়ামণি তুলসীদাস তাই বলেছিলেন—

শ্রীরামে জানকিনাথে অভেদ পরমাত্মনি
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ!

বলতে পেরেছিলেন—

সবসে বসিয়ে সব্‌সে রসিয়ে সবকা লিজিয়ে নাম,
হাঁজি হাঁজি করতে রহিয়ো বৈঠিয়ে আপন ধাম।

যে যে মত বলে যে পথ দেখায় তাই স্বীকার কর, কিন্তু তোমার যে প্রিয় তাকে অন্তরে বসিয়ে তার পায়েই আশ্রয় নাও।

আর্য্য ভারত হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এই ভক্তিভাব পেল—অদ্বৈতের নানা প্রতীকে নানা প্রতিমায়। তা থেকেই এল সাকার পূজার রীতি—ক্রমে এল তন্ত্রশাস্ত্র, শক্তিমন্ত্র। বৈদিক যাগযজ্ঞ থেকে অন্য ধারা, অন্য মত। কিন্তু ভুললে চলবে না সব এক।

মূর্ত্তি পূজা ও পীঠ রহস্য

বেদান্তের ভারতে অদ্বৈতের উপাসকরা প্রতিমা গ'ড়ে নিয়ে উপাসনা সুরু করলো কবে আর কেন?

মনে পড়ে একদিন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে দাঁড়িয়ে মা কালীকে দেখে পৌঁছলাম ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে—এপাশে রাধাগোবিন্দ, ও পাশে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ—আর নিম্নে প্রবাহিতা গঙ্গা—অদূরে পঞ্চবটী। মনে হলো, ঐ যে প্রতিমা, ঐ যে প্রতীক, ঐ যে লিঙ্গ মূর্ত্তি, আবার ঐ যে প্রকৃতির দান নদী ও বটবৃক্ষ এসবের মধ্যেই তো আছেন এক। তবে ভিন্ন রূপ কেন?

সহসা মনে পড়লো, যেতে হবে ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনী দেখতে, কেউ বলে, ৩২নং বাসে যান, কেউ বললে বড্ড ঘুরে যেতে হয় ৩২সি-তেই যান, কেউ বললে ৩২এ-তে। আবার অনেকে বললে বদল করে যেতে হলে ৩২এ গিয়ে বরানগরে ৪নং ধরুন। তবে যাবে সব বাসই ধর্ম্মতলা। ধর্ম্মের তলাতে মিলতে হলেও এমনই তার বিভিন্ন পথ। যে পথেই যাও—মিশবে গিয়ে সব পথ একই জায়গায়। কোনটা ঘুরপথ কিন্তু বদল নেই, কোনটা বদল বটে তবে সহজ। ব্রহ্ম জেনে সোজা পথে যাওয়ার একটু দেরী হয়তো হয়—হয়তো কঠিন, তাই বুঝি রুটের মতন ব্রহ্মের রূপটাও একটু বদলে নেওয়া হয়।

এই যে রূপ-কল্পনা, এই হল প্রতিমা বা মূর্ত্তি। বৈদিক যুগে ঠিক প্রতিমা বা মূর্ত্তি ছিল না হয়তো, কিন্তু প্রতীক ছিল প্রচলিত। যজ্ঞে ব্রাহ্মণ-স্থাপন, বৈশ্বদেব-স্থাপন, অগ্নি-স্থাপন, মাতৃকা-স্থাপন এরই সাক্ষ্য দেয়। তাছাড়া নবগ্রহ-স্থাপন, সর্ব্বতোভদ্র, মঙ্গলঘট প্রভৃতিই হয়তো ধীরে ধীরে পট ও পীঠের সৃষ্টি করেছে—হয়তো যুগ-প্রবাহে ভক্তের ভক্তি ধারারই গতি বিভিন্ন পথে।

ভারতের বুকে বৈদিক যুগের কর্ম্মপ্রবাহ ও কলিযুগের মূর্ত্তি পূজার হল সঙ্গম। কিন্তু মূলে সেই এক কথাই রয়ে গেল। সেই এক পরমাত্মা। তারপর তারই দুই রূপ পুরুষ ও প্রকৃতি—মহাকাল ও মহাকালী। সাংখ্যের মধ্যে যদিও পুরুষই সতেজ, তার মিলনে অচল প্রকৃতি সচলা বা শক্তিমতী হয়, কিন্তু আবার দর্শনেই দেখি এক ব্রহ্মই—সেই একই পুরুষ, বহু পুরুষ বা বহুরূপে সবার সম্মুখে। তবু আমরা মোট এই কথাই জেনে নেবো, মেনে নেবো যে, সব একেরই বহুরূপ। তন্ত্রের মন্ত্রে এই কথাই বলেছে বারবার—

"মহাকালী মহাকালশ্চনকাকাররূপতঃ
মায়য়াচ্ছাদিতাত্মানং তন্মধ্যে সমভাগতঃ
মহারুদ্রঃ স এবাত্মা মহাবিষ্ণুঃ স এবহি
মহাব্রহ্মা স এবাত্মা নাম মাত্র বিভেদকঃ।

সবই এক—শুধু নামে তফাৎ। মহাকাল ও মহাকালী ঠিক যেন ছোলা—তার মধ্যে সমভাবে আছে এ দুই শক্তি মহাকাল ও মহাকালী। আর সেই মহারুদ্র, সেই মহাবিষ্ণু, সেই মহাব্রহ্ম—শুধু নামের বিভেদ। একই মূর্ত্তি তিন নাম—এটুকু না ভেবে যাঁরা বিভিন্ন ভাববেন এই ত্রিমূর্ত্তিকে, তাদের মুক্তি নেই।

মুণ্ডমালা তন্ত্রে ষষ্ঠ পটলে দেখতে পাই—পরিষ্কার ভাবে বলেছে যতদিন জগতে নানা জীব ততদিন নানা আত্মা নানা ভাবনা—ততদিন জগত রকমাবৃত। ভাব, মূর্ত্তি রকম রকম—ক্রিয়াও বিভিন্ন। ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর গণেশ, বহ্নি, বরুণ, কুবের, দিকপাল ততদিনই পৃথক—নইলে সব এক। যতদিন সে ভাবনা এক না হয়—জগতে রকমারী রূপ থাকে ততদিনই থাকে স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসকের ভেদ থাকে তুলসী পাতা আর বেলপাতার পার্থক্য। দিব্যভাব, বীরভাব, পশুভাব ততদিনই বিভাগ আনে—ততদিনই দেবতাভেদে উপাসনার বিভেদ—ততদিনই হরি ও হরে ভিন্ন জ্ঞান—কালী, তারা, ষোড়শী ভৈরবী ছিন্নমস্তা সব ভিন্ন—ভিন্ন ঐ সরস্বতী ও রাধিকা। এ জ্ঞান যতদিন না আসবে ততদিন চেষ্টা ভিন্ন, ক্রিয়া ভিন্ন, উপাসনায়ও আচার ভিন্ন।

অতএব নিষ্ঠা-কঠোর যে তন্ত্র, তাও উদার মতে উদার এক পথের কথা বলে গেল—বলে গেল বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও পথে যে পার্থক্যই থাকুক—শেষ পথও সব এক। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে মহিম্নস্তবের পংক্তি কটি—

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদ মদঃ পথ্যমিতি চ
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানা পথ-জুষাৎ
নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব।"

অর্থাৎ ত্রয়ী বেদ, সাংখ্য, যোগ, পশুপতি মত (তন্ত্রশাস্ত্র বৈষ্ণবশাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন পথে গিয়ে এটি ভাল ওটি ভাল বলেছে মাত্র। নইলে প্রভেদ—নদ ও নদীর জল সরল ও কুটিল পথ নানাপথ ধরে যেমন

শেষ পর্য্যন্ত মহাসমুদ্রে গিয়ে মিশে যায় তেমনই সাধকগণ—যিনি যে যে পথেই যান না কেন, পরিণামে এক মাত্র অদ্বৈত-সমুদ্ররূপ তোমাতেই গিয়ে মিলিত হবে।

সত্যই সব মত ও সব পথের শেষ পরিণতি তো সেই এক।

এর স্বীকৃতিও আছে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বজাতির মধ্যে। সভ্য ও অসভ্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সর্ব্বত্র এই প্রতীক বা প্রতিমা পূজার রীতি।

লিঙ্গ পূজার সুরু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের অনার্য্য-অধ্যুষিত অঞ্চল থেকেই। আবার কালী পূজার কল্পনাও আমাদেরই অরণ্যাঞ্চলে।

তাছাড়া দেবদূত যীশুর মাতা মেরীর মূর্ত্তি আছে পাশ্চাত্ত্যের প্রতি ঘরে ঘরে। যীশু মূর্ত্তির প্রতি আসক্তি তাদের প্রতিজনের অন্তরে, আবার কোন ধর্ম্মে বা মৃতদেহ শবাধারে যেখানে প্রোথিত—সেই কবর স্থানেরই হয় পূজা, কেউ বা অগ্নি-শিখার আরাধনায় ব্যস্ত।

তাহলেই মোটমাট মূর্ত্তি বা পট, স্থান বা পীঠ-পূজা আছে সর্ব্বত্রই বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন প্রেরণায়। ভারত সেই ভাব বা প্রেরণাকেই বিজ্ঞান-সম্মতভাবে অভিনন্দিত করেছে।

ভারতীয় মূর্ত্তি ও পীঠ পূজাকে যারা পৌত্তলিক বা অবৈজ্ঞানিক ব'লে হাসে, তাদের একটুখানি বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হবে।

'প্ল্যানচেট্' বা 'টেবিল-রেপিং' বলে একটা ভৌতিক অনুষ্ঠানের কথা অনেকেই শুনেছেন। তেপায়া এক টেবিলের পাশে দুই বা ততোধিক লোক বসে—টেবিলের উপর হাত রাখতে হয়—এমন ভাবে যাতে প্রত্যেকের হাত প্রত্যেকের হাতকে স্পর্শ করে থাকে। তারপর সবাই মিলে ভিন্নলোকবাসী নির্দ্দিষ্ট পরিচিত এক মৃত ব্যক্তিকে চিন্তা করতে হয় এক মনে তদ্‌গত হয়ে। সমাধি অবস্থা আর কি! সেই অবস্থায় উপনীত হলে টেবিলটি নড়তে থাকে এবং অনুষ্ঠানের কর্ত্তারা যে প্রশ্ন করবেন ইঙ্গিতে তার উত্তর পাওয়া যায়।

আমাদের শাস্ত্র এ কথা স্বীকার করে বটে কিন্তু এইটিকে বলে 'অগর্ব পীঠ' অর্থাৎ গর্ব্ব নেই এতে কিছু। প্রেতলোকের সান্নিধ্যে যেমন এ

জিনিস বা অনুষ্ঠান অপবিত্র, তেমনই প্রেতলোকের দেওয়া সে সব উত্তর অসত্য হওয়া বিচিত্র নয় বলেই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

তবে এদ্বারা এটা বেশ বৈজ্ঞানিক ভাবেই সিদ্ধ হয়, যেমন অবচেতন মন জাগরিত হ'য়ে সমাধিকল্পে লোকান্তরের সামীপ্যে উপনীত হয়—সেই মন, প্রেতলোকে না গিয়ে যদি কোন ঊর্দ্ধলোকের সন্ধানে যায় তবে নিশ্চয় সেই লোকবাসী বা দেবলোকবাসীর সামীপ্য বা সাযুজ্য লাভ করতে পারে।

আর সেটা পারে বলেই হিন্দুশাস্ত্র প্রতি মূর্ত্তি পূজার আগে 'মানস পূজা'র বিধি দিয়েছে।

মনকে আগে মনে স্থাপিত করতে হবে। মনের মধ্যে আছেন সেই পরমাত্মা এই বিশ্বাসে, তাকে উপলব্ধি করে সেই মনে শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করে—তারপর সম্মুখস্থ ঘট পট বা প্রতিমায় সেই শক্তি সন্নিবেশিত করতে হবে। এ কি সম্ভব?

হিন্দু শাস্ত্র বলে সম্ভব। চিত্ত বা মন যদি কোন সে দূরস্থ প্রেত-লোকের মত মনুষ্যের সঙ্গলাভ করতে পারে, তার সঙ্গে মিলতে পারে, তবে চিত্তস্থ অমৃতরূপী পরমাত্মার সঙ্গে অদূরস্থ প্রতিমার যোগ করতে পারবে না কেন। এটা সম্পূর্ণভাবেই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ব্যাপার।

ধরা যাক, দুটি মেয়ে দুজনের হাত ধরে বোঁ বোঁ করে ঘুরছে—যে বেগে একলা ঘুরলে মাথা ঘুরে পড়ে যেত, সেই বেগে বা তার চেয়েও ক্ষিপ্রতর বেগে ঘুরছে তারা কি ক'রে? ভরসা বা আশ্রয় কি? এক জন আর এক জনকে টানছে—একের বিকর্ষিত শক্তি আকর্ষিত হচ্ছে অন্যের দ্বারা। ঠিক যেমন পজেটিভ ও নেগেটিভ শক্তিতেই বিদ্যুৎ-শক্তির প্রতিষ্ঠা। এখন নেগেটিভ বা পজেটিভ তার যদি ছিন্ন হয়—ঐ মেয়ে দুটির হাত যদি বিচ্ছিন্ন হয়, তৎক্ষণাৎ আলো নিভবে বা ঐ মেয়েরা পড়ে যাবে।

আমার অন্তরাত্মার ভাবশক্তি, ইচ্ছাশক্তি বা আকর্ষণশক্তি যখন ঐ

সম্মুখস্থ মূর্ত্তির মধ্যে আরোপিত হবে তখনই সেখানে মহাশক্তির হবে প্রতিষ্ঠা। তবে অন্তরাত্মার জাগরণ আগে প্রয়োজন। মানস পূজায় দেবতার আবাহন বা অর্চ্চনা করে তবে প্রতিমা প্রতিষ্ঠার তাই আয়োজন।

ঠিক এই ভাবেই সাধকরা যখন সাধনায় সিদ্ধ হয়, তখন সিদ্ধস্থানকে পীঠস্থান করে রেখে যায়, ভক্তরা যেখানে ভগবানের মন্দির করে, সেস্থান পীঠস্থান হয়ে থাকে—আবার যুগযুগান্তের মুছে যাওয়া ইতিবৃত্ত, চরিত্র বা ঘটনা সাধকের মনে যে পরিবেশ বা ভূভাগ আশ্রয় ক'রে—সমাজে আবার প্রচারিত হয় তাকেও পীঠস্থান রূপে সকলে শ্রদ্ধা জানায়। তাই সাধক বা ভক্তের প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি, মন্দির বা তীর্থ হিন্দুধর্ম্মের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও তন্ময় অনুভূতি আকর্ষণ করে চিরদিন।

এখন যে মূর্ত্তিতে বা পীঠস্থানে দেবতার সমাবেশ হয়—তাকেই বলা হয় 'দিব্যদেশ'। এই দিব্যদেশে সর্ব্বব্যাপক, অধিদৈব সত্তাকে কেন্দ্রীভূত করে, ভক্ত তাঁর কামিত, কল্পিত প্রিয় মূর্ত্তির মাধ্যমে ইষ্টের উপাসনা করে। মাতা বা গাভীর সর্ব্বদেহে দুগ্ধ থাকে ছড়িয়ে, স্তনাধারে তা আসে আর সন্তানের চেষ্টায় তা নির্গত হয়। ঐ মূর্ত্তি সেই সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরের স্তন মাত্র। তা থেকেই অমৃত হবে নির্গত।

আকাশের বিভিন্ন বায়ু-তরঙ্গে শব্দ-তরঙ্গ খেলা করে – আবার তাকেই ধরে টেনে আনি রেডিওর বা বেতারের মধ্যে। তেমনই নানালোকে—দেব-জন-মহ- তপ-লোকে বায়ুস্তরে যে আত্মা সঞ্চারিত তাকেই আকর্ষণ করতে পারি আমরা মন্ত্র বা শব্দ-তরঙ্গের মাধ্যমে ঐ প্রতিষ্ঠিত দিব্য-দেশে।

এই দিব্যদেশ শাস্ত্রমতে ষোল রকমের। শিলাময়ী বা ধাতুময়ী, মূর্ত্তি বা চিত্র, স্থণ্ডিল অর্থাৎ নবগ্রহ স্থাপনের বেদী, শালগ্রাম শিলা, নর্ম্মদেশ্বর, লিঙ্গ বা কমল, অপরাজিতা পুষ্প প্রভৃতি নিত্যযন্ত্র, ভাবযন্ত্র অর্থাৎ রেখাদি দ্বারা অঙ্কিত যন্ত্র, চিদম্বর, শ্রীগণপতি বা গায়ত্রী যন্ত্র, ঘটস্থাপন, অগ্নিস্থাপন প্রভৃতি বাইরে এই ১৩টি দিব্যদেশ আর অন্তরে

মূর্দ্ধা, হৃদয় ও নাভি এই তিনটি দিব্যদেশ। এই ষোলটি দিব্যদেশ প্রতিষ্ঠা করে তবেই হয় দেব-প্রতিষ্ঠা।

তবে সে প্রতিষ্ঠার জন্য চাই মন্ত্রশক্তির মাধ্যমে দ্রব্যশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও মানসিক শক্তির বিকাশ।

সাধক প্রথম নিজের শরীরে পঞ্চভূতের শুদ্ধি করে, দেহস্থ মূর্দ্ধা, হৃদয় ও নাভিকে শুদ্ধ করে, শরীরকেই দিব্যদেশ তৈরী করে নিয়ে বাইরের দিব্যদেশে দেব-শক্তিকে আবাহন ক'রে, মন্ত্রাদি দ্বারা প্রাণ-মনে শক্তিতেই দৈবী সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এরই নানা বিধি, নানা মত আছে নানা তন্ত্রে, নানা পূজা ও অনুষ্ঠানে। তাছাড়া শরীরকেই ত মহাতীর্থ বলে গেছেন সাধক সম্প্রদায়। উপনিষদেই আছে—

"দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ"

দেহকেই দেবালয় ভেবে নাও—জীবকেই ভাব শিব।

ঠিক এমনই কথা ওদের দেশেও দেখি। বাইবেলেও বলে—Ye are temple of god and the spirit of god dwelth in you.

সেই শরীরস্থ ইষ্ট মানস পূজায় জাগরিত হ'লে তাঁর আকর্ষণ-শক্তিতে দেবতা আসেন সন্মুখস্থ দিব্য দেশে বা মূর্ত্তি পীঠে।

সাধকরা নিজ আকর্ষণী শক্তিতে, যে মন-প্রাণহীন জড় বা পাথরে দেব আত্মা আনেন একি সহজে কেউ মানতে চায়।

যে অবিশ্বাস করবে সে তো তপ-প্রভাব বা যৌগিক শক্তির উপরও করবে, আবার পাথরের বা মাটির মূর্ত্তির উপরও করবে। তার উপায় কি? উপায় বলেছে আমাদেরই ধর্ম্মশাস্ত্র। কোন জিনিস থাকলেই বুঝতে হবে, তাকে কেউ ধরে আছে। নইলে আঘূর্ণিত পৃথ্বী-গ্রহে সে থাকবে কি করে? সে থাকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তিতে। এ ব্যবস্থাও বেশ রহস্য পূর্ণ! যে কোন জিনিসই তমোগুণে পড়বে ঘুমিয়ে, রজ গুণে হবে মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল, আর সত্বগুণে সে হবে শৃঙ্খলা-বদ্ধ, নিয়মানুবর্ত্তী। এখন এই যে পৃথ্বী বা অপর গ্রহ, এরাও সত্ব,

রজ, তম এই ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্বকে আশ্রয় করতে বাধ্য—নইলে তমোতে সে নিদ্রালু হয়ে অন্য গ্রহের আঘাতে যাবে খসে, রজতে সে পাগলা হাতির মতো ছুটবে !

অতএব সারা ত্বনিয়া ত্রিগুণের অধিকারী হলে প্রকৃতির সব কিছুকেই সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করতে শেখায়। এই যে সত্ত্বগুণকে ধারণ করে চলা এই ধর্ম্ম।

ভারতের দর্শনশাস্ত্র বলেছে—প্রতি জীবের প্রথমরূপ উদ্ভিজ, তার পর স্বেদজ, তারপর অণ্ডজ, তারপর জরায়ুজ। মানুষ এই জরায়ুজ।

তমোর মোহ বা আলস্যে নয়, রজের উন্মত্ততায় নয়, প্রকৃতি সত্ত্বের শৃঙ্খলা দিয়েই মনুষ্য যোনীর উদ্ভব করে, আর তারপরে রাখে পূর্ণ প্রাণ-শক্তি, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ধর্ম্ম পরমাণুর মাধ্যমে।

সে পরমাণু গাছেও আছে, মাটিতেও আছে এবং পাথরেও আছে। সত্ত্বগুণে শক্তি লাভ করে এবং আকর্ষণ ও বিকর্ষণের যোগ্য সমন্বয়ে তারা নিজেকে টিকিয়ে রাখে তবে, পাথর পাথর—শোলা শোলা। ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে তার আকর্ষণ বিকর্ষণের সম্বন্ধ নিয়েই পাথর ভারি— শোলা হাল্কা।

যোগী নিজ শক্তিতে আকর্ষণের ক্ষমতা যদি বাড়াতে পারে তবে সন্মুখস্থ পাথর শোলার মতনই আকর্ষিত হওয়া সম্ভব। আবার দূরে আছেন যিনি, তাঁদেরও কাছে—অতি কাছে—অন্তরের মাঝে আসা সম্ভব। যে রসগোল্লা খায়নি তাকে গুড় চিনি মধু কিংবা ছানার উদাহরণ দিয়েও বোঝান যাবে না রসগোল্লা কি, যোগীর যোগ শক্তির কথা যাদের জানার অধিকারের বাইরে, তাদের সান্ত্বনা—বিশ্বাস ও ভক্তি। হয় তো তাতে সে একদিন'রসগোল্লা' ঠিক পাবে—নইলে সে তর্কই করবে, পাবে না কিছু।

সাকার ও নিরাকার নিয়ে এতক্ষণ যা বললাম, তা স্পষ্ট হলেও জটিল তো বটেই, তাই রোজ যে সব ছবি আমাদের চোখের সামনে ফোটে তার দিকে তাকিয়ে দেখলেও জিনিসটা সহজ হয়ে ওঠে।

কবিগুরু একদিন বলে গেছেন একটি রূপক।

প্রকাণ্ড এক মেলা—না হয় ধর একজিবিসন, অসংখ্য লোক দেখছে এটা, ওটা, সেটা—কিন্তু হেড অফিসে বসে মেলা বা প্রদর্শনী যিনি বা যাঁরা গড়েছেন, সব সাজাবার গড়বার আর দেখাবার ভার নিয়েছেন তিনি। নানা দিকে বসিয়েছেন মায়ার খেলা।

একটি ছোট ছেলে ঘুরছে, দেখছে আর হাসছে আনন্দে, হাতখানি কিন্তু ধরে আছে তার মা। যেদিকে ইচ্ছে ছেলে ঘুরুক, দেখুক কিন্তু সময় মত তিনি টেনে নিয়ে নিজের পথে চলে যাবেন, এই তাঁর মতলব।

এমন সময় হঠাৎ ছেলেটা নকল বাঁদর বা আসল ভালুক দেখে অবাক হয়ে গেছে—মাও হয় তো একটু আনমনা - তাঁর হাত গেছে ছেড়ে, ছাড়িয়ে নিয়ে ছেলে গেছে এপথে—ওপথে - সে পথে।

মা আর ছেলেতে দেখা নেই— দেখা হতে পারতো যদি ঐ হেড অফিসে দুজনে পৌঁছতো বা কেউ ছেলেটাকে নিয়ে যেতো। তাই হলো, সবাই মাকে বলে, যাও, হেড অফিসে—ছেলেটাকেও নিয়ে গেল তাঁর কাছে যিনি বা যাঁরা গড়েছে—এই মায়ার মেলা।

ঠিক এই হলো ব্যাপার। যিনি গড়েছেন খেলায় এই সংসার মেলা দেখতে দেখতে আনমনা হলেও, হারিয়ে গেলেও শেষ পর্য্যন্ত সেই জায়গায় এলেই সব পাওয়া যায়। আর সেটা হচ্ছে, যিনি সংসার মেলা গড়ছেন তাঁর অফিস। যে যেভাবেই সাজাক তার ঘর বাড়ী, মন্দির দেউল—সব মায়া। কেন্দ্র সেই এক দিকে। ছেলেটা যতক্ষণ মার হাত ধরে ছিল—হারায়নি, যেমনি অন্য মায়া, মার চেয়ে প্রিয় হ'ল তার কাছে—সে গেল হারিয়ে।

আমাদেরও হয়েছে তাই—যিনি সব গড়ছেন, সাজাচ্ছেন, আমরা তাকেই—ফেলি হারিয়ে। এমন কি খেয়ালের মাথায় পূজার আড়ম্বরকে এত বড় করি—যে বাহ্যিকতার সমারোহে, মেলার রঙচঙে আনমনা হয়ে—ভগবৎ-সাধনার হাত দি ছেড়ে—হারিয়ে যায় পথ। তখন বুঝি বা মনে হয়—যে পথে চলেছি সেটাই সত্য। যে মূর্ত্তি আমি পূজা করছি তাই জাগ্রত দেবতা।

তবে মন্দিরের সে মূর্ত্তি বা প্রতিমার কল্পনা আমরা 'দর্শনের' মধ্যেও পেয়েছি তো ! সৃষ্টির অনিবার্য্য যে শক্তি পুরুষ ও প্রকৃতি—তাই নিয়েই তো আমাদের দেবতার প্রতীক বা প্রতিমা।

পুরুষকে আমরা কোথাও স্রষ্টা, কোথাও ধারক, কোথাও নাশক ভেবেছি তাই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু—ও সংহার কর্ত্তা শিবরূপে চিন্তা করেছি। আবার যে প্রকৃতি আসে প্রসবে, পালনে বা মরণে তাকেই রূপায়িত করেছি শক্তির নানা অপরূপ রূপে। পেয়েছি দেবীমূর্ত্তি—দশমহাবিদ্যা, বিদ্যা, অবিদ্যার নানা রূপারোপে।

যুগপ্রবাহে সাধনার বিভিন্ন ভঙ্গীতে ভক্তের নানা অপরূপ কল্পনা ও বিশ্বাসে যেমন শক্তি হলেন দুর্গা, চণ্ডী, কালী জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা তেমনই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপেই পরমাত্মার রূপ ব্যঞ্জনার শেষ হলো না—ভক্ত-হৃদয়ে রাম, কৃষ্ণ, গণপতি, ষড়ানন—নানারূপে তিনি দিলেন ধরা। পথ হল নানা, মত হল বিভিন্ন। কিন্তু সব ঐ একইরূপের ছায়া নিয়ে—একথা অবিশ্বাস করেনি কেউ। এমন কি—তন্ত্রাদিতে একথা স্বীকারও করে গেছে।

৮। শুদ্ধাশুদ্ধ ও স্পর্শাস্পর্শ বিচার

ব্যাপারটা নিছক ছুঁৎমার্গ নিয়ে বিচার এই কথাই সবাই ভাবেন। বলেনও যে এই ছোঁয়াছুঁয়ি ব্যাপারই জাতটাকে শেষ করলো। অনেকটা সত্যও বটে, তবে ছুঁৎমার্গের বাড়াবাড়িটাই বর্ত্তমান হিন্দুদের সর্ব্বনাশী প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, নইলে আর্য্যঋষিরা যা বলেছেন তা সত্যই অপূর্ব। আজ বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে জার্ম-থিওরী বা জীবাণুতত্ত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

জীবাণু সর্বত্র ছড়িয়ে আছে—আছে ময়লা দ্রব্যে, ময়লা আধারে, আছে মানুষের মুখের থুতুতে বা তার চুমুক দেওয়া পাত্রে। রোগ হলেই মানুষের দেহে ক্ষতিকর জীবাণুর আবির্ভাব হয়—সে জন্যই স্পর্শাস্পর্শের বিচার করতে হয়। নইলে একের দেহের 'রোগ অন্য দেহে সংক্রামিত হতে পারে। আমাদের সে বিষয়ে সাবধান হওয়া

দরকার। তবে আমরা ভেবেছি শুধু শরীর নিয়ে আর্য ঋষিরা ভেবেছেন, দেহের সঙ্গে মনের কথা, আচার থেকে বিবেক বিচারের কথা। তাই মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁর মীমাংসা শাস্ত্রে দার্শনিক যুক্তি দিয়েই এই বিচার সিদ্ধ করেছেন।

খোসা দিয়ে ঢাকা পেঁয়াজের মতন আমাদের অন্তরস্থ আত্মা পাঁচটি খোসায় ঢাকা—আর তা সকলের অলক্ষ্য, অজ্ঞেয়। সে আত্মার এই পাঁচটি খোসা হচ্ছে যথাক্রমে—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আর আনন্দময় কোষ।

এই পাঁচটি খোসায় ঢাকা থাকে যেমন আমাদের আত্মা, তেমনি ঐ মৃত্যুলোকের আত্মা, দেবলোকের আত্মা। তবে মৃত্যুলোকবাসী বা দেবলোকবাসীরা যেমন ঐ পাঁচটি খোসায় ঢাকা আত্মার স্বরূপ জানতে পারেন নিজ শক্তি বলে, আমরা তা পারিনা—আর পারি না বলেই আমাদের এই পাঁচটি কোষ পচলে বা মলযুক্ত হলে, কোষাবৃত সেই আত্মাও মলিন হয়।

অন্নময় কোষ—পরের অশুচি জীবাণু-স্পর্শে অন্নময় কোষ পচলে ভিতরের জিনিস কি থাকবে শুদ্ধ? কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রোগীর অন্নময় কোষ কি পবিত্র থাকতে পারে? জীবাণু প্রবেশ, ছুঁৎরোগের স্পর্শে তা মলিন হবেই। শাস্ত্র এই মালিন্যকে বলেছে মল—এমন কি মৃত্যুর পরও দেহের অন্নময় কোষ—মলযুক্ত হয়েই পড়ে থাকে।

প্রাণময় কোষ—ঠিক তেমনিই প্রাণময় কোষে যখন আসে বাইরের অশুদ্ধতা, অনাচার—তাতে হয় বিকার। আর তা ঘটে পঞ্চ-প্রাণ-বায়ু ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের অনাচার বা অপবিত্রতায়।

মনোময় কোষ—মনোময় কোষের নিয়ন্ত্রণেই তো পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য্যকলাপ। সেই মনে যখন পাপ চিন্তা আসে, অবিবেকী বিচার আসে, তখনই তার ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকলাপে আসে ময়লা, ঘটে বিক্ষেপ।

বিজ্ঞানময় কোষ—মনের একটি দিক যদিও জ্ঞানেন্দ্রিয়ে বাঁধা থাকে, অন্যদিকটি আমরা চিন্ময় পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারি; ঐ বিশিষ্ট

জ্ঞান-বলেই বাঁধতে পারি সে দিকটা চিন্ময় রূপের সঙ্গে। কিন্তু সে জ্ঞান যদি আসে অজ্ঞানতায় অন্ধকার হয়ে, যদি দুষ্টজনের মতবাদ সেই জ্ঞানকে অজ্ঞানতায় ঢেকে ফেলে তবে সেটাই হলো জ্ঞানের আবরণ।

আনন্দময় কোষ—আত্মার চরম আচ্ছাদন এই আনন্দময় কোষ। আনন্দ দিয়েই তো আমরা জীবসত্তা অনুভব করতে পারি—পরম সত্তার কাছে পৌঁছুতে পারি। কিন্তু যদি তাতে আসে অপরের সঙ্গ-দোষের বাধা, কর্ম্ম-দোষের বিঘ্ন, তবেই তা হলো অস্মিতা।

তাহলে এই যে পঞ্চকোষ, এই যে অন্নকোষ, প্রাণকোষ, মনোকোষ, বিজ্ঞানকোষ ও আনন্দকোষ এরই পঞ্চগ্লানি মল, বিকার, বিক্ষেপ, আবরণ ও অস্মিত; এবং সব কটিই আসে ঐ জীবাণু-অজ্ঞানতা, অবিবেকিতার দোষে। তাহলে ভাবতে গেলে এই স্পর্শাস্পর্শ বা শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেকের কথাও চিন্তা করতে হবে। তবে এ বিষয়ে আমাদের সমাজে একটু বাড়াবাড়িও হয়েছে। সেটা ক্ষমা করা যায়—যখন দেখি বর্ত্তমানে স্ত্রীও স্বামীর উচ্ছিষ্ট খায় না, সন্তানকেও তা খেতে দেওয়া হয় না—এই জার্মের ভয়েই।

প্রাচীনকালে ছিল ঠিক বিপরীত। এমন কি সে যুগে পরের শরীর তো দূরের কথা নিজের অঙ্গের নিম্নভাগই ছিল অশুদ্ধ। নাভির নীচে হাত পড়লে তা ধুতে হয়, মলমূত্র ত্যাগে জল না নিলে তা অশুদ্ধ হয়, রজস্বলা স্ত্রীও অস্পৃশ্যা। বিশেষ বিশেষ ধাতু-পাত্রের অশুদ্ধি—মাটীতে, জলে বা আগুনে শুদ্ধ করে নিতে হয়। নিজের দেহে বা ঘরে আত্মীয়দের মধ্যে যেখানে এত বিচার, তারা চট্ করে অজানা লোকের হাতে খাবে কোন্ রুচি নিয়ে? আজ বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে যা বোঝান হচ্ছে, সেদিন ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে মানুষকে তা বোঝান হয়েছিল। তবে সে বিচার যখন ধাতুপাত্র বা মরণশীল দেহ, রক্ত, মাংসতে আবদ্ধ না থেকে স্রষ্টার সৃষ্টির চরম ও পরমরূপ মানুষকেও ঘৃণা করতে সুরু করাল, তখনই এলো

মানবাত্মার প্রতি অবমাননা, এল সমাজে শৃঙ্খলার নামে অনুদার বিশৃঙ্খলা।

গুণ, কর্ম বিভাগে যে বর্ণাশ্রম হলো আমাদের ভারতের এক সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ, তাকেই মানুষের জন্মগত জাত বলে ধরে নেওয়া হলো। এমন কি মন্ত্রের অংশ-বিশেষ ধরে ব্যাখ্যাও সুরু হয়ে গেল। শাস্ত্রে আছে—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে
বেদ পাঠাৎ ভবেৎ বিপ্রো—ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।

জন্মনা জায়তে শূদ্র মাত্র এই অংশটি নিয়ে যদি বলি, 'বিচার আবার করবো কিগো! শাস্ত্র বলেছে জন্ম থেকেই শূদ্র—শূদ্র।' তবে কি প্রকাণ্ড ভ্রমই প্রতিষ্ঠিত হবে। শ্লোকটির যথার্থ অর্থ হচ্ছে প্রতি মানুষ জন্মকালে শূদ্র, পরে সংস্কারবশে সে হয় দ্বিজ। বেদাদি শাস্ত্রপাঠ এবং জ্ঞান আহরণের পর সে হয় বিপ্র আর তারপর ব্রহ্মকে জানলেই হয় ব্রাহ্মণ। জন্ম বা বংশধারার নামমাত্র নেই এখানে, বরং বর্ণাশ্রম বিভাগের ইঙ্গিত এতে আছে—যে বর্ণেরই হও তুমি—সংস্কার, বেদপাঠ ও জ্ঞান-আহরণ করে সকলেই ব্রহ্মকে জেনে ব্রাহ্মণ হতে পারে। মহাভারতেও আছে—

নকুলেন ন জাত্যা বা ক্রিয়াভি ব্রাহ্মণো ভবেৎ
চণ্ডালোঽপি হি বৃত্তস্থো ব্রাহ্মণঃ স যুধিষ্ঠিরঃ।

হে যুধিষ্ঠির, কুল বা জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণ কেউ হয় না—হয় তার কর্মদ্বারা। সু-বৃত্তি হলে চণ্ডালও ব্রাহ্মণ হতে পারে। আবার সেই মহাভারতেই আছে—

ব্রাহ্মণো বাপ্য সদ্বৃত্তঃ সর্বসঙ্কর ভোজনঃ
ব্রাহ্মণ্যং তু সমুৎসৃজ্য শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ।

এক ব্রাহ্মণ যদি কুকার্য্য করে, কু-খাদ্য অ-খাদ্য আহার করে, তবে সে শূদ্র হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, সেই প্রাচীন যুগেও ভারত ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, এবং শূদ্রের ছেলে শূদ্র এ বিধান মানেনি। আর মানেনি

বলেই, আমরা পেয়েছি আমাদের পূজার জন্য গোপ-পালিত কৃষ্ণকে, ক্ষত্রিয়সন্তান শ্রীরামচন্দ্রকে, মৎস্যকন্যার ছেলে ব্যাসকে, দস্যু রত্নাকর বা বাল্মীকিকে, স্বর্গ-বেশ্যা উর্বশী-তনয় বশিষ্ঠকে। দেখেছি উপনিষদের প্রতি বক্তা ক্ষত্রিয়, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হলেন ক্ষত্রিয়জ হয়েও, মাংস-বিক্রেতা তুলাধর জাজলী ঋষির উপদেষ্টা, অন্ত্যজ শূদ্র কভষ আলুষ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এক সিদ্ধিলব্ধ ব্রহ্মর্ষি।

কুল আর জাত নিয়ে প্রাচীন ভারত মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টত্ব বিচার করেনি—মানুষকে ছুঁতে কোনদিনই তারা পশ্চাৎপদ হয়নি। চণ্ডালকেও কোল দিয়েছেন রামচন্দ্র, শবরীর অন্নগ্রহণ করেছেন তিনি, সুজাতার দেওয়া খাদ্য নিয়েছেন সেদিনও বুদ্ধদেব—বশিষ্ঠের পদধূলি নিয়েছেন স্বয়ং পূর্ণাবতার।

জেলের ছেলে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের আত্মজ শুকদেবকে নতি জানিয়েছে সারা দেবকুল ও মানবকুল। সত্যকাম জবালা—পিতৃ-পরিচয়হীন হয়েও যজুর্ব্বেদীয় যুগে ছান্দোগ্যোপনিষদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ কারও পিতৃ-পরিচয় ছিল না তবু তাঁরা দেবকল্প। তবেই বোঝা যাচ্ছে, মানুষকে ঘৃণা প্রাচীন ভারতও কোনদিন করেনি। অথচ আজ শুধু অস্পৃশ্য নয়, দেখলেও মানুষ অপবিত্র হয়ে যায়। শুধু কায়া নয়—ছায়াকে ছুঁলেও আজ স্নান করতে হয়।

অথচ যাদের ছায়া ছুঁলে পবিত্র ব্রাহ্মণকে আজ নাইতে হয়, দেখলে হন অপবিত্র.সেই হতভাগার দল মুসলমান যুগে মুসলমান হয়ে এবং ইংরেজ আমলে খৃষ্টান হয়ে পেয়েছে আদর ও সম্মান।

চণ্ডাল যেখানে ঢুকতে পারে না, সাহেব সেখানে ঢুকে করমর্দনে গৃহস্বামীকে কৃতার্থ করেছে। তার মানে আমরা যাদের শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি, তারা দূরে তো যাচ্ছেই—ধর্মান্তর গ্রহণ করে আমাদের সমাজকে ভেঙেচুরে দিয়ে যাচ্ছে। মানুষকে ঘৃণা করে আমরা মানুষকে অপমান করে বিশ্বে উপেক্ষিত দৃষ্টিতে হচ্ছি অবহেলিত।

কিন্তু তা বলে এও বলবো না যে, প্রাচীন ভারতে আহারে ব্যবহারে যে শুদ্ধাশুদ্ধির কথা বলেছেন তা ভুল। হোটেল, রেষ্টুরেণ্টে রান্নাঘরের ভিতরের ছবি দেখলে, কোন সভ্যজাতি স্নুরুচি-সম্পন্ন ব্যক্তিই চাইবেনা সেখানে খেতে।

জার্মের ভয়ে আজ অনেকে স্বীকার করেছে—হোটেল রেষ্টুরেণ্টে যার-তার হাতে খাওয়া নিষিদ্ধ অচল। এই না চলার কথাই বলে গেছেন স্মৃতি সংহিতা। তাঁরা বলেছেন—

যেষাং জাতি নির্ণৈতুমশক্যা, কর্ম্মণা তেষাং জাতি নির্ণেয়া।

যার জাত ঠিক করতে পারছো না তার কাজ দেখে জাত নির্ণয় কর। মদ খেয়ে মাংস চিবোতে চিবোতে বেশ্যার ঘরে শত জনের উচ্ছিষ্ট দ্রব্যে যে তৃপ্ত হচ্ছে—তার গলায় পৈতা আছে কিনা দেখতে যেও না, সে শূদ্রই। আর যে শূদ্রকে দেখবে অরুণোদয়ে স্রোতস্বতীতে অবগাহন করে দেহ ও মন পবিত্র ক'রে, ভগবৎ নাম-কীর্ত্তনে ব্রহ্ম-স্মরণ করে, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করছে বা জীবপ্রেমই যার পরম কাম্য সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

"বর্ণোৎকর্ষ মবাপ্নোতি নরঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা"

মানুষ পুণ্য কর্ম্মে উৎকর্ষ বর্ণ প্রাপ্ত হয়। তাই হীনবংশজ নাভাগ শূদ্রা সন্তান বিদুর, বর্ত্তমান যুগের কবীর, যবন হরিদাস সব দেবপদ-বাচ্য ও বিশ্ব-পূজ্য হয়ে গেছেন।

তবে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা বেশীর ভাগই এসে পড়েছে আজ খাবার বা আহারের উপর। তবে ছায়া মাড়ালেও অপবিত্র হতে হয় দক্ষিণ ভারতে! অবশ্য অন্যদেশে এতটা নেই।

আহার বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেছে—

আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধি—শুদ্ধ আহারেই মানুষের বিশুদ্ধি।

ছান্দোগ্যোপনিষদের এই নীতি ও রামানুজের বিচার নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদে এই কথাই সিদ্ধ হয় যে, প্রতিটি আহারের তিনটি বিভাগ বিচার করে আহার গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আহারের তিনটী ভাগ—জাতি, নিমিত্ত, এবং আশ্রয়। আহারের জাতি মানে গুণ বিচার। মাংস, মদ, পেঁয়াজ প্রভৃতি খাদ্যে, যাতে সাধারণতঃ উত্তেজনা আসে তা না খাওয়াই উচিত। কারণ সাধক, ভক্ত বা ভজনরত লোকের মন সত্ত্বগুণ সম্পন্নই হওয়া প্রয়োজন। তবে শ্রমিক বা কর্ম্মী, যোদ্ধা বা রাজার উত্তেজক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়—তাই তাদের পক্ষে সে সব নিষিদ্ধ নাও হতে পারে।

প্রতি মানুষেরই একটা নিজস্ব দীপ্তি আছে, যাকে বলি আমরা ছটা—তার মধ্যে থাকে তার সৎ বা অসৎ গুণের প্রভাব। তার স্পর্শে দ্রব্যেও সেই গুণ আসে।

নিমিত্ত হচ্ছে—দ্রব্যের সঙ্গে যে দূষিত পদার্থের সংযোগ থাকে।

এর মধ্যে নিমিত্ত ও জাতি বুঝি সহজে—বুঝিনা আশ্রয়। আর তা বুঝি না বলেই তা নিয়ে আমাদের ঝগড়া। আহারের আশ্রয় মানে হলো, দেখতে হবে সে আহার কার হাত থেকে আসছে।

মহাভারতে—শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের নিমন্ত্রিত হয়েও আহার গ্রহণ করলেন না, অথচ বিদুরের ঘরে ক্ষুদকুড়ো হাত পেতে নিলেন।

আর যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় শতদাসী-হস্তে খাবার গ্রহণ করেছেন কৃষ্ণ, ব্যাধের হাতের খাবার গ্রহণ করেছেন তেমনি কৌশিক, গুহকের হাতে রামচন্দ্র। শূদ্র হলেই তার হাতের খাবার খাওয়া চলবে না এ ধারণাই ভুল।

তারপর ব্রাহ্মণ রন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হলেই সে হয় পতিত। কারণ রান্না করা ব্রাহ্মণের কাজ নয়।

মনুসংহিতা বলেছে—

আর্দ্দিক কুল মিত্রশ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যথাত্মানং নিবেদয়েৎ।

অর্থাৎ শূদ্র—আর্দ্দিক, কুলমিত্র, গোপাল, দাস বা নাপিতেই রাঁধবে ব্রাহ্মণদের জন্য।

যাজ্ঞবল্ক্যাদিও ঠিক এই মতই দিয়েছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে

দুর্যোধনের অন্ন রাজার অন্ন হলেও অগ্রাহ্য—কারণ তাতে এসেছে অসতের স্পর্শ, আর চণ্ডালের অন্নও শুদ্ধ খাদ্য, তাতে অসতের স্পর্শ নেই—এই হলো আশ্রয় বিচার।

আজ এই আশ্রয় বিচারটাই আমাদের বিভ্রান্ত করেছে। নইলে দ্রব্যগুণ—ময়লা বা জীবাণু মানছি আমরা সবাই।

প্রাচীন নীতি মেনে নিলে আমাদের স্থির করতে হয় যে, যাকে আমরা মোটেই জানি না অথবা জানি লোকটা খারাপ, অশুদ্ধ অনাচারী—তার দেওয়া আহার খাব না। যদি সাধনমার্গে থাকি, উত্তেজক জিনিস খাব না—আর যা কিছু খাব, জীবাণু বাঁচিয়ে সব জিনিস গ্রহণ করবো। এই কথাই বলেছে প্রাচীন ভারত আহার বিষয়ে।

তবে আহার বলতে শুধু খাওয়াই নয়। শঙ্করাচার্য্য বলেছেন—

আহ্রিয়তে ইত্যাহারঃ শব্দাদি বিষয় জ্ঞানম্ ভোক্তুর্ভোগায়া হ্রিয়তে।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম প্রচেষ্টায় শব্দাদির মাধ্যমে যে আত্মিক সংবোধের জন্য সংগ্রহ, তাই আহার।

অতএব আহার কথাটার শুদ্ধাশুদ্ধ ছাড়িয়ে যায় অনেকদূর—দেহ আর স্বাস্থ্য থেকে আত্মা আর ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত। তাই প্রাচীন ভারত ছিলেন এ বিষয়ে এতখানি সচেতন।

৯। যজ্ঞ ও মহাযজ্ঞ

যজ্ঞ বলতেই আমরা ভাবি আগুন জ্বালিয়ে হিং ছিং ফট্ কতকগুলো মন্ত্র পড়ে আগুনে ঘি দিয়ে অপব্যয় বৃদ্ধি করে, ধোঁয়ায় ভরা ঘরে, ধোঁয়ার মত ধ্যেয় এক ধর্ম্ম পালন করা। কিন্তু মোটেই তা নয়। তবে কি? সেকথা না হয় পরেই ভাববো—তার আগে বরং ভেবেনি এটা আমাদের প্রাচীন কৃষ্টির এক স্মারক অনুষ্ঠান।

আজ নেহেরুজীর জন্মদিনে—কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে গড়ে ওঠে তোরণ—তোরণে দেওয়া হয় ফুল মালা পাতা—পথে পথে হয়তো প্রাচীন অজন্তার প্রতীক—আর তাতে থাকে প্রা[illegible] নিদর্শন—

তারই অঙ্গে বা ভূমিতলে আঁকা থাকে হয়তো নানা রঙের আলপনা। যজ্ঞও তাই। অতীতে গণতান্ত্রিক যুগের আর্য্যগণ প্র-জনন ও উৎপাদনের জন্য গণসঙ্ঘের আহ্বান ও সম্মেলনে যে উৎসব করতেন বা প্রথম বৈজ্ঞানিক আঙ্গিরসের প্রজ্বলিত, প্রথম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আগুন জ্বালিয়ে. প্রথম প্রগতির প্রতি যে শ্রদ্ধা জানাতেন, আজও আমরা সেই প্রথম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 'অগ্নিকে, সাক্ষ্য রেখে প্রাচীন গণ-তান্ত্রিক আর্য্যের সম্মান করি। অতীত কৃষ্টির স্মারক ও আর্য্যধর্ম্মের ধারক-রূপে যজ্ঞ, যজ্ঞস্থান, যজ্ঞের হোতা ও ব্রাহ্মণ-পাত্র নির্দ্ধারণ করে, মুক্ত কণ্ঠে যুক্ত প্রার্থনায় অতীত ধারাকে আজও বহন করি। সে যুগে হোতা বা ব্রাহ্মণরা গণতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক শাসন ও সংরক্ষণে পেতেন কর্ত্তৃত্ব আর অগ্নি সাক্ষ্যেই তা হত নির্ব্বাচিত। আজ সেই হোতা বা ব্রাহ্মণ-পাত্র তারই প্রতিভূ ও প্রতীক—সেই যজ্ঞাগ্নি বা যজ্ঞ-হবি প্রাচীন কৃষ্টির স্মারক বা দ্যোতক।

আর্য্য ভারতে বেদের পরেই প্রধান এই শব্দটি পাই 'যজ্ঞ'। প্রকৃত অর্থে কিন্তু যজ্ঞটি শব্দ নয় বাক্য —একটি অতি প্রাচীন জাতির কর্ম্মগতি। য+জ+ন=যজ্ঞ। 'য' বা 'ই' ধাতুর অর্থ যাওয়া বা একত্র হওয়া, জ শব্দের অর্থ জন্ম বা উৎপাদন আর ন বা অন্ অর্থে অন্ত। এই শব্দত্রয়ের বহুবচনাত্মক রূপই হল যজ্ঞ—আর তার অর্থ হচ্ছে বহুর প্রযত্নে জন্মদান বা উৎপাদন।

যে দিন প্রথম মানুষ সৃষ্টি হলো—বনেই তাদের বাসা, অক্ষর-হীন তাদের ভাষা, সেদিন তারা প্রথমেই পেল একত্রে থেকে— সন্তান-সন্ততি জন্মাবার প্রবৃত্তি ও প্রথা—খাদ্য প্রজননের চেষ্টা ও ব্যবস্থা, যজ্ঞ সেইদিনই তাদের সুরু।

তারপর আঙ্গিরসের চেষ্টায় এল আগুন—আর সমবেত আর্য্য সন্তানরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সমাজ গড়লেন। নতুন নতুন উপনিবেশে যজ্ঞের আগুন জ্বালিয়ে সমবেত হলেন উৎপাদন. প্রজনন ও পালন ধর্ম্মের জন্য। প্রকৃত যজ্ঞ সেই দিনই সুরু।

তারপর ধীরে ধীরে বন থেকে গড়লো নগর—অসভ্যরাও হল সভ্য—সমাজে এল শৃঙ্খলা—প্রজনন ব্যাপারে প্রকৃতিকে দেবতার আসরে বসিয়ে—প্রকৃতির গুণগান ও স্তবগানে মুখর হয়ে আগুন জ্বালিয়ে সংহতির শক্তি বর্দ্ধনে তারা মিলিত হতে থাকলো যজ্ঞ-বেদির পাশে। যজ্ঞে ব্রাহ্মণ হল প্রধান। ব্রহ্মকে জেনেছে যে, সেই তো হবে যজ্ঞের হোতা।

এই ব্রাহ্মণ শব্দটি নিয়েই কি কম কলহ। দর্শন উপনিষদের ব্রাহ্মণ হচ্ছে নির্গুণ পরমাত্মা—নিরাকার, অজ্ঞেয় কিন্তু যজ্ঞের ব্রাহ্মণ তো তা নয়। তবে কি? সাম্যবাদীর দল আমাদের বেদের নজীর দেখিয়া বললেন সায়ন স্বয়ং ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থে অন্ন বা অন্ন বলি, সামগানের গায়ক বা বেদপাঠ, যাদু বা অভিচারের পরিপূর্ণ বিধিবৎ সংস্কার, বেদপাঠ ও দক্ষিণা, হোতার বেদপাঠ এবং মহান এতগুলি অর্থ বলেছেন। আর তাই নিয়ে আধুনিক সাম্যবাদীর দল বলতে পেরেছেন যে, ব্রাহ্মণ সেদিন সমাজের যজ্ঞভাগের নেতা ছিলেন —ছিলেন সেই জন-সঙ্ঘের হোতা, যাঁদের জন্য জ্বলতো আগুন, যাঁদের চেষ্টায় বসতো উপনিবেশ। জন্মাত শস্য—গড়তো সমাজ। তাহলেই মোট কথা হলো, জনসঙ্ঘের আচরিত প্রকৃতি-স্তুতি ও প্রজনন প্রচেষ্টাই যজ্ঞ—আর তারই প্রতীক ঐ আগুন জ্বালিয়ে আহুতি দান, বলি বা সোমপান—বেদপাঠ প্রভৃতি।

যে ভাবেই হোক—আমরা প্রকৃতির শক্তিকেই যখন দেবতার আসনে বসিয়েছি তখন তাদের কাছে শক্তিলাভ করবার বাসনায় যে অনুষ্ঠানই করি—তাকেই না হয় যজ্ঞ বললাম।

তবে বেদ প্রচারের আগেও ছিল সমাজ, জনসঙ্ঘ, প্রজনন ও পালন। অতএব যজ্ঞ ছিল আগেই।

তারপর এল বেদপাঠ, এল সঙ্ঘরূপী ব্রহ্মা থেকে ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠা। এল অন্নবলি থেকে পশুবলি, এল প্রকৃতি বা শক্তি-সাধনা থেকে

ইন্দ্র বরুণের পূজা। যজ্ঞ হয়ে গেল সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে একেবারে ধার্ম্মিক আচরণ।

আজ মন্ত্র-বিশ্বাসী আমরা সেই প্রকৃতি-স্তবে পূর্ণ বেদপাঠ ক'রে, প্রকৃতির প্রতীক দেবলোকের স্মরণ ক'রে যজ্ঞ করি—বিশ্বের এবং নিজের কল্যাণ কামনায়।

বিশ্বের কল্যাণে যে যজ্ঞ তাকে বলি **মহাযজ্ঞ** আর নিজের হিতকল্পে যে যজ্ঞ তাকে বলি **যজ্ঞ**। বিশ্বের কল্যাণে অনুষ্ঠিত যে মহাযজ্ঞ তাও আবার পাঁচ রকমের—ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ভূত-যজ্ঞ আর নৃ-যজ্ঞ।

ব্রহ্মযজ্ঞ হচ্ছে নিত্যবেদপাঠ, সৎ অনুষ্ঠান, ঋষি ও ব্রাহ্মণের প্রিয়-কার্য্য সম্পাদনে তার তৃপ্তি—ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠান।

দেবযজ্ঞ সপ্তলোকবাসী দেবতাদের তৃপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

পিতৃযজ্ঞ হচ্ছে শ্রাদ্ধাদি। প্রেতলোক বা পিতৃলোকে যে আত্মীয় গেলেন বিচ্ছিন্ন হয়ে, তাঁদের বায়বীয় শরীর আমার যজ্ঞ ভাগে বা অনুষ্ঠানে তৃপ্তি হোক—এই শ্রদ্ধা নিয়েই অনুষ্ঠিত হয়।

ভূতযজ্ঞ—উদ্ভিজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ এবং স্বেদজ এই চতুর্ব্বিধ ভূত-জ জাতির তৃপ্তির জন্য যে অনুষ্ঠান তাই ভূতযজ্ঞ। একটি গরুকে গোগ্রাস দেওয়া মানেই জরায়ুজ ভূতযজ্ঞ। একটি গাছকে পালন করা বা তুলসী মঞ্চে জল দিয়ে তাকে বাঁচান হচ্ছে উদ্ভিজ-ভূতযজ্ঞ, পক্ষী বা জলজ জন্তুকে খাদ্য দান অণ্ডজ ভূতযজ্ঞ আর স্বেদজ বা বিন্দুজ যে মানুষ তার কল্যাণে যে যজ্ঞ তাই স্বেদজ ভূতযজ্ঞ।

নৃ-যজ্ঞ হচ্ছে শ্রেষ্ঠতর। অন্য যজ্ঞের সাদৃশ্যে কোন কিছু অনুষ্ঠান দেশান্তরে বা ধর্ম্মান্তরে তেমন নেই, যেমন আছে নৃযজ্ঞের আচরণ সর্ব্বদেশে, সর্ব্বজাতির মধ্যে ও সর্ব্ব ধর্ম্মে। নৃ-যজ্ঞ মানেই মানুষের সেবা। সেখানে যবন, ম্লেচ্ছ বা এদেশ ওদেশ নয়, আর্য্য অনার্য্য, সভ্য অসভ্য নয়—মানুষই দেবতার সন্তান, অতিথি সকলের পূজ্য

এই যে ধারা এই হচ্ছে নৃযজ্ঞের মূলকথা। রাজ্যভিষেকের যজ্ঞায়োজনও রূপান্তরিত ভাবে নানা জাতি ও ধর্ম্মের মধ্যে দেখা যায়।

পঞ্চ যজ্ঞ সমাজের একটি অঙ্গ। এবং সমাজের সকলের সহ-যোগে প্রজনন ও উৎপাদনের একটি বিশেষ সহায়ক তো বটেই।

শুধু আগুন জ্বালিয়ে আহুতি দেওয়াই যজ্ঞ নয়—সঙ্ঘের সবাই মিলে বেদী তৈরী করে, যূপ বা পশুবলির স্থান নির্দ্দেশ ক'রে অগ্নি জ্বালিয়ে সমাজের সকলকে ডেকে বলিদানের পর সমভাবে হবিদান ও চরু গ্রহণ প্রভৃতিই যজ্ঞ আর তা পরবর্ত্তী সমাজ-গঠনের পূর্বাভাষ ও প্রকৃষ্ট রূপ মাত্র।

যজ্ঞ বৈদিক যুগের আগে সুরু হলেও বৈদিক, তান্ত্রিক বা পৌত্তলিক যুগেও প্রচলিত হয়ে আছে। আজও আর্য্যজাতির দশবিধ সংস্কারের প্রতিটিই 'যজ্ঞ' প্রধানতম অনুষ্ঠান।

গৃহ-রচনায় বাস্তু-যাগ, বিবাহে কুশণ্ডিকা, ধর্ম্মকার্য্য মহাব্যাহৃতি হোম —সবই বৈদিক যজ্ঞের বিভিন্ন পরিবেশ।

এক এক উদ্দেশ্যে বা এক এক যজ্ঞে, এক এক নামে অগ্নির আবাহান হয়। তবে সমিধ, আজ্য পাত্র, ঘৃত বা হবি, কুশব্রাহ্মণ, ফল, ফুল প্রভৃতি দ্বারা এই যে মন্ত্র—তা বিভিন্ন অর্থে প্রধানত প্রকৃতির আবাহন ও স্তুতিগানে মুখরিত। ক্রমে মূর্ত্তির পাশে নানা দেবদেবীর তুষ্টির জন্য বৈদিক সে ক্রিয়া সাধিত হচ্ছে।

এমন কি প্রকৃতির পূজা থেকে ছড়িয়ে গিয়ে, আজ সব প্রতিমার নামেই যজ্ঞে সমিধ-দানের ব্যবস্থা আছে।

এই যজ্ঞ ও মহাযজ্ঞের নানা বিধি আছে। সে সব সংক্ষেপে বলা চলে না। কর্ম্মকাণ্ডের আলোচনা করতে হয়—তবে তার নানা উপকরণ ও আয়োজনের মধ্যে বহু পূর্ব ইতিহাস যেন সাড়া দেয়।

বারুদ না থাকায় কথা যেমন স্মরণ করায়—কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলনের নিয়মে—তেমনি ঘোড়ার হাড় দিয়ে শস্যগুচ্ছ কাটার প্রথাও বলে দেয়—লৌহ অস্ত্র তখনও হয়নি।

যে ভাবেই হোক জগত প্রগতির পথে এগিয়ে গেলেও প্রাচীনত্বের মোহে, স্মৃতির একটা মায়ায় বা ধর্ম্ম বিশ্বাসে আমরা আজও আগুন জ্বালাই, ব্রাহ্মণ বসাই., আর মন্ত্র পড়ি সব সেই আদিম প্রথায়—মন্ত্রশক্তির সাধনায় দেবকুল ও পিতৃকুলের সন্তোষে।

এ নিয়ে তর্ক করা চলে না---সংস্কার বা বিশ্বাস যাই বল যজ্ঞের মধ্যে সঙ্ঘশক্তি অভিযানে প্রজনন ও উৎপাদনে যে উৎকর্ষতা আছে তা নব্য ও প্রাচীনপন্থী সকলেই বলেছে। তা ছাড়া যজ্ঞের প্রতিটি অনুষ্ঠান ও মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেখলেও একথা স্পষ্টই মনে হয় যে—এর থেকে যে ফল লাভ হয়, ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে তা সত্যই মঙ্গলজনক।

এর পরই পাই আমরা হিন্দুধর্ম্মের অন্য দুটী বিষয়—বর্ণাশ্রম ও সমাজ বিজ্ঞান এবং সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বর-তত্ত্ব। আমরা ইতিপূর্বে বৈদিক তত্ত্বে আশ্রম-ধর্ম্ম ও দেবদেবীর প্রতিমা নিয়ে আলোচনায় অনেক বলেছি। কিছু সমাজ-বিবরণীতে এবং তন্ত্রাদি আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হবে। তাই এখানে হিন্দু ধর্মের বিশেষ একটী জটিল বিষয়---তন্ত্র নিয়েই আলোচনা করা প্রথম প্রয়োজন।

তন্ত্রশাস্ত্র

তন্ত্রের প্রাচীনত্ব

তন্ত্রের প্রচলন প্রাচীন কালের কোন যুগে সুরু হয় সে বিষয় নানা মতান্তর থাকলেও বৈদিক যুগে, বেদে বা উপনিষদে তন্ত্রোক্ত মহাদেবীর উল্লেখ তো আছেই—উপরন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগেও যে শক্তি-পূজার প্রভাব ছিল, মহেঞ্জদারো বা হারাপ্পায় অসংখ্য দেবীমূর্ত্তি তার প্রমাণ।

তাছাড়া ইতিহাসের নীরব সাক্ষ্যেও অনুমান করা যায় যে প্রাচীন আর্যগোষ্ঠী যখন অরণ্য অঞ্চলে যাযাবরবৃত্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াত—তখনও আগুন জ্বালিয়ে বেদগানে তারা মত্ত হয়নি তখনও তারা প্রথম প্রণতি জানায় শক্তিকে।

তারপর বৈদিক যুগেও—ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত এবং সাম বেদের রাত্রিসূক্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে বৈদিক যুগেই অবৈদিক যুগের শক্তিবাদ শাস্ত্রীয় ও সামাজিক উৎসব ও আত্মিক সাধনার সম্পদ হয়ে ওঠে। অদ্বৈতবাদের মূলে বেদ—সেই বেদেই পাই মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা ব্রহ্ম-বিদূষী বাক্ ব্রহ্মশক্তিকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করে বলেছিলেন "আমিই ব্রহ্মময়ী আদ্যাদেবী ও বিশ্বেশ্বরী।"

ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্তে আছে ভুবনেশ্বরী দেবী বা অন্যত্র বিশ্বদুর্গা, সিন্ধু দুর্গা, অগ্নিদুর্গা এবং অন্যান্য দেবীর উল্লেখ।

দেবাসুর সংগ্রামের উপাখ্যানেও আছে যে দেবতাগণ জয়লাভ করে যখন অভিমানে উদ্ধত—তখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, বায়ু সকলকে প্রশ্ন করে বোঝান জয়ের কারণ তারা নয়—এ প্রমাণ করতে প্রত্যেককে একটী তৃণখণ্ড পোড়াতে, ওড়াতে, ভাসাতে বলেন। কেউ তা পারে না। তখন তিনি দেবতাদের বললেন মহাশক্তির কথা।

অদ্বৈতবাদে যে ভাবে বা যে পথে দ্বৈতবাদ এল, এল মূর্ত্তি-উপাসনার প্রথা—হয়তো সেই ভাবেরই দ্যোতক এসব কাহিনী। হয়ত পরবর্ত্তী তন্ত্র পৃথক শাস্ত্ররূপে শক্তি-পূজাকে দিয়েছে আরও প্রাধান্য। তবে তার প্রচলন সুরু হয় বেদেই। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নারায়ণ উপনিষদে 'দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে'—বা যাজ্ঞিক উপনিষদে দুর্গা গায়ত্রী—'কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যা কুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গাঃ প্রচোদয়াৎ'—প্রভৃতি মন্ত্রে মেনে নিতেই হয় যে তন্ত্রোক্ত শক্তি বেদ মূলা।

তাছাড়া দর্শনের যুগে সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতির প্রতীকই তো শিব ও শক্তি। তবে সাংখ্য বলে—প্রকৃতি জড় ও নিষ্ক্রিয়, শিব বা পুরুষের সান্নিধ্যে বা সংযোগে সে চৈতন্যলব্ধা, আর তন্ত্র বলে শিব শব স্বরূপ, শক্তি তার চৈতন্যদায়িনী। হয় তো বেদের উপনিষদ বা দর্শনের পুরুষ বা শিব তন্ত্রে শব হয়েছেন, পরবর্ত্তী যুগে তান্ত্রিক-উপাসনার প্রবল মতবাদে।

শেষ পর্য্যন্ত অথর্ব বেদের দেবী উপনিষদ বা বহ্‌বৃচোপনিষদে দেবীর ব্রহ্মস্বরূপতা, দেবতা দ্বারা দেবীর স্তুতি বা দেবী মহিমা অথবা দেবী থেকেই নিখিল জগতের উৎপত্তির যে বর্ণনা হয়েছে, কালে হয় তো তাই তন্ত্রের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে তন্ত্রশাস্ত্র অতি গুহ্য বলে ব্যাখ্যা করার মধ্যে অনেকে এতে একটা অশ্লীলতা আরোপ করতে চান। হয়তো এই রকম মনোভাব নিয়েই প্রাচীন যুগে সম্প্রদায় বিশেষ শিব-পূজায় শিশ্নোপাসনা বা শিবলিঙ্গকে শিশ্নদেব বলে শ্লেষ করেছে বা যোনী-পীঠকেও বাঁকা চোখে দেখেছেন।

শিবলিঙ্গের অতি প্রাচীন ইতিবৃত্ত দেখলে দেখা যায়—অনেকে বলেন, অনার্যগণ এই লিঙ্গাকৃতি দেবতার পূজার মধ্যে সৃষ্টি-রহস্যই বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন। এমন কি সুপ্রাচীন দ্রাবিড়রা এই রকম দেবতারই পূজা করতেন বলে তাদের অনার্য্য বা অসভ্য বলা হয়েছে। কিন্তু মনে হয় এ সত্য নয়। কারণ দ্রাবিড়রা তো আর্য্যদেরই এক শাখা। হয়তো তারা বেদ-প্রভাবে বেদ-সম্মত বৃক্ষ প্রস্তরাদির পূজা থেকেই ঐ লিঙ্গপূজা বা যোনী রচনায় এসে পৌঁছেছে।

বেদে আছে বনস্পতি পূজার কথা; লিঙ্গ পুরাণে দেখা যায়—
"তস্মাৎ লিঙ্গং সুরতরুং স্থাপয়েৎ।"

বনের পতি বনস্পতি—বন অর্থে জ্যোতি। অতএব বেদ যেখানে পূজা করেছে জ্যোতিষ্মান এক বৃক্ষরূপকে, পুরাণ সেখানে সুরতরু বলেই লিঙ্গকে অভিনন্দন করেছে। আবার প্রস্তর পূজাও দেখি বেদেই। সেই ভাবে মেরুগিরির পূজা করেছে প্রাচীন আর্য্যরা। ঐ গিরিচূড়ায় যে কোণাকৃতি লিঙ্গরূপ, শিবলিঙ্গ হয় তো তারই ছায়া। তাছাড়া শিব কথার অর্থ আবার সূর্য্য—সূর্য্য ওঠে গিরিচুড়ায়, পাহাড়ের চূড়ার মতন শিবমূর্তি। হয় তো এই ভাবেই বেদ থেকে গিরিপূজা এসেছে, যেমন পুরাণেও গিরিপূজার অভাব নেই। হয় তো শিব তাই কৈলাসবাসী। তা হলে শিবমূর্ত্তিকে 'শিশ্ন' বা 'লিঙ্গ' বলে উপহাস করা হল কেন?

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মহেঞ্জদারোর একটী শিলে আছে নারীর জনন-যন্ত্রে বৃক্ষকাণ্ডের উদ্ভব। এখানে হয়ত নারীকে পৃথিবী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। বেদের অদিতি রূপও তো তাই। পৃথিবী থেকেই সৃষ্টি সুরু আর তারই উর্দ্ধভাগে সূর্য্যজ্যোতি। এখন 'অদিতি'রূপী পৃথ্বির জনন-যন্ত্র বা যোনী-দেশে জগত উৎপত্তির মূল সংরোপন থেকেই হয়তো গৌরী-পাটে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা বা সুর-তরুরূপে, শিবলিঙ্গ পূজার দেবতা হয়ে পড়েছেন।

এই লিঙ্গ ও যোনী নিয়ে সৃষ্টির প্রতীক কল্পনা। তন্ত্রের মাধ্যমে সাধনার ক্ষেত্রে তার আরোপ দেখেই হয়তো সাধন-পথের বাইরে যে বাস্তব সংসার বা অন্য মতবাদীর দল—তন্ত্রকে গুহ্য বলেছেন, অনেকে হয়তো অশ্লীলতারও ইঙ্গিত করেছেন ; আর তা করেছেন. বলেই শাস্ত্র বলেছে, মাত্র গুরু সন্নিধানেই এ পদ্ধতি শিক্ষণীয়।

সে কথা মেনেও, মোটামুটি তন্ত্রের কথা একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ পরবর্ত্তী বৌদ্ধযুগে বা জৈনযুগে তন্ত্রের যেমন. হয়েছে বিপুল আলোড়ন, তন্ত্র যেমন প্রধান উপাসনার পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনই আঘাতও তাকে কম সইতে হয় নি। এমন কি অনেকে বলেন যে তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যার কল্পনাই বৌদ্ধতন্ত্র-সাধন-মালার দান। উগ্রা, মহাউগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী ও তারা—এ অষ্টমূর্ত্তির কথা প্রথম আমরা পাই বৌদ্ধ তন্ত্রে। হিন্দুতন্ত্রের বামাচার ও দক্ষিণাচার যেমন দুটি ভাগ—বৌদ্ধ-তন্ত্রে ক্রিয়াতন্ত্র, চর্য্যাতন্ত্র, যোগতন্ত্র প্রভৃতি ভাগ আছে। জৈনতন্ত্রেও সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর বহু স্তুতি বিদ্যমান। তবে অন্যান্য মতের তন্ত্রশাস্ত্র অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম্মে শক্তিবাদই সমধিক সমৃদ্ধ। তাই আমরা হিন্দু ধর্ম্মের তন্ত্রেরই প্রথম আলোচনা করি।

বেদ ও তন্ত্র

বিচারের আগেই মনে হয় আর্য্যভারতে—বেদের পরে আবার তন্ত্র কেন। কিই বা প্রভেদ ঐ বেদ ও তন্ত্রে। প্রধান কথা তো আছেই বেদ অদ্বৈতবাদী বা ব্রহ্মবাদী। তন্ত্র দ্বৈতবাদে ভরা—নানা

রূপের আবির্ভাব তন্ত্রের মন্ত্রে। বেদ সমস্ত সংসারকে বলেছে অনিত্য মিথ্যা, মায়ামোহময় নরকের সমান, মুক্তির বাধাস্বরূপ। তন্ত্র তা বলেনি। সে বলে ভোগ ও বাসনাময় এ সংসারেই তোমার মুক্তি ও মোক্ষ। পরম পুরুষ রামকৃষ্ণের সেই পাঁকাল মাছ। সংসার তরঙ্গে যখন থাকবে তখন হও পঙ্কবিহারী পাঁকাল মাছ....।"

বাংলার পরমসাধক তন্ত্রাচার্য্য শিবচন্দ্র একটা গল্প বলেছেন এই নিয়ে—অতি সহজে বেদ ও তন্ত্রের প্রভেদ সম্বন্ধে।

"একদিন আমি গেলাম এক প্রকাণ্ড রাজবাড়ীতে। দেখলাম, অপূর্ব তার কারুকার্য্য। ভিত্তি গাত্রে অপূর্ব শিল্প-চাতুর্য্য। শুনলাম ভেতরে আছে মহামূল্য রত্নরাজী।

বাড়ীর দুদিকেই পথ। দোর দেখলাম না সামনে। ডান দিকেই এগিয়ে গেলাম। এগিয়ে—পেলাম দুর্গন্ধ নোংরাভরা সে পথ। দোর নেই একটিও। তবে উপরে উঠবার একটা সিঁড়ি। উঠলাম সিঁড়ি দিয়ে উপরে ; যত উঠি তত আলো—দুর্গন্ধ নেই, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। সৌধ শিখরে উঠেই দেখি ভিতরে নামবার পথ। নামলাম সিঁড়ি ধরে নীচে। অন্তরের বা অন্দরের সে ঘর অপূর্ব অতুলনীয় রত্নদীপ্তির ছটায় উজ্জ্বল।

হঠাৎ দেখি অন্য একটি লোক জোরে একটা দরজা খুলে ফেলল—দোরের দুটো পাল্লা সহজে খুলে গেল অপূর্ব কৌশলে।

প্রশ্ন করলাম, তুমি এ দোর পেলে কোথায়।

উত্তর হলো—কেন, বাঁদিকের পথে।

বললাম, বাঁ দিকের পথে আমি তো কোন দোর দেখিনি।

হেসে সে বললে, শিল্পকার্য্যে ছিল ঢাকা। এমন কৌশলে দোরটা তৈরী যে বোঝা যায় না ওটা দোর....পাথরে খোদাই একটা সাপ দিয়ে তা ঢাকা।

আমি বললাম, কিন্তু দক্ষিণ দিকে ?

—নেই দোর—শুধু কারুকার্য্য—বাঁ দিকেই লুকোনো দোর—

প্রশ্ন করলাম, তুমি জানলে কি করে ?

উত্তর এল, গুরুর কৃপায়।

প্রশ্ন—কে গুরু, তিনি জানেন কি করে ?

উত্তর দিলে—যিনি বাড়ী তৈরী করেছেন, তিনিই তাকে পথ বলেছেন।

প্রশ্ন করি—দোরে কি তালা ছিল ?

উত্তর হলো—ছিল, চাবি গুরুই দিলেন।

আবার প্রশ্ন করলাম, ও পথেও তো সেই দুর্গন্ধ, ময়লা।

উত্তরে বলে, না—দক্ষিণ পথেই দুর্গন্ধ--বাঁ দিকে অপূর্ব সুবাস—।

আবার প্রশ্ন করি—এর মানে ? দুদিক দুরকম কেন ?

উত্তরে হেসে সে বললে, বাঁদিকের অন্তঃপুরের মার কাছে পৌঁছবার সোজা পথ। ডানদিকের পথ—আমলা কর্ম্মচারী, বিচারপ্রার্থী, করুণা ভিখারীদের পথ। ভেতরে যিনি থাকেন তিনি রাণীমা—যিনি আমার ধর্ম মা, আমার আপন।

হেসেই বললাম, ধর্ম মা, সে তো দূরের।

—না ধর্ম্ম আপনার কাছে দূর, আমার কাছে ধর্ম্মের জন্য মা সম্বন্ধ অতি নিকট—

সহসা অজ্ঞানতার ঘুম ভেঙে গেল। বার হয়ে দেখলাম, সত্যই শিল্পী অপূর্ব সংযমে দ্বারপথ তৈরী করেছে, বোঝা যায় না, জানা যায় না। পথ অতি সহজ। তাহলে কি আর দুর্গন্ধ পথে সিঁড়ি দিয়ে অত দূর উঠি।

ঐ ডান দিকের পথ বেদের পথ—সংসার তার কাছে পূতিগন্ধময়—তবে সাধক সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলে তবে পায় সে ভিতরের মধ্যমণি।

আর ঐ বাঁদিকের পথ—তন্ত্রের।

ষট্-চক্রে শোভিত সহস্রার-পদ্ম তো এই দেহ মধ্যেই !

সংসারকে সে ভাবে স্বপ্ন ; বলে—সুন্দর অপূর্ব্ব—

গুরুর দেওয়া চাবি নিয়ে সংযমে ভোগের শিল্পে ভরা দোর খুলে ঝট্‌পট পৌঁছে যায় 'মা'র কাছে।

ঐ 'আমি'টি বৈদিক সাধক—আগন্তুক তান্ত্রিক। অট্টালিকা তোমার আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ। অহঙ্কার, মায়া, মোহ, মমতা, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, নিন্দা এই সব পূতি গন্ধ। সাধনক্রম—ঐ সোপান, সৌধ-শিখরের উন্মুক্ত দোর—তত্ত্ব জ্ঞান। অভ্যন্তরের রত্নরাজি—সিদ্ধি বা ব্রহ্ম-বিভূতি। দক্ষিণের পথ বেদ, বাঁ দিকের পথ তন্ত্র। চাবি—গুরুদত্ত মন্ত্র। ভিত্তির কারুকার্য্য মনের বা দেহের নির্ম্মাণ-কৌশল। কপাট মূলাধার, সর্পরেখা—কুলকুণ্ডলিনী। সাধনার ক্রম বলা যায় না গুরুর কাছে জানতে হয়।

বেদেও যে তন্ত্রের কথা আছে তাকে বহু বৈষ্ণব বিপক্ষবাদী শাস্ত্র বলে থাকেন। অথচ নিত্য বেদোক্ত গায়ত্রীর যে ধ্যান ও ধারণা আমরা করি, তা তন্ত্রোক্ত গায়ত্রী-তন্ত্রেরই আবরণ উন্মোচন করে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও একাদশ স্কন্দে আছে—'যিনি আত্মগত হৃদয়-গ্রন্থিকে শীঘ্র পরিহার করতে ইচ্ছা করেন তিনি তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ভগবানের উপাসনা করবেন। ভক্তচূড়ামণি উদ্ধবের প্রতি ভগবান বলেছেন—

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধোমখঃ
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ।

—বৈদিক তান্ত্রিক ও মিশ্র মানে পুরাণোক্ত বিধি অনুসারে সবাই আমার সাধনা করবে।

তন্ত্র ও শ্রুতি

মহর্ষি হারিতও শ্রুতিতে বলে গেছেন—"শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধো প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রিকীতি চ।" আজও হিন্দুর ঘরে প্রতি পর্ব্ব উৎসবে বিবাহ উপনয়নে তাই দেখি—যজ্ঞের সঙ্গে নান্দীমুখ, শ্রাদ্ধ কিংবা দেবী পূজায় যজ্ঞ, ঘট ও বেদী।

সাক্ষাৎ শঙ্করসম শঙ্করাচার্য্য—অদ্বিতীয় ব্রহ্মের যাবতীয় উপাসক-গণের জন্যই 'প্রপঞ্চসার' তন্ত্র রচনা করে গেছেন। অনেকে বলেন—প্রপঞ্চসার শঙ্করের রচিত নয় কারণ তিনি ছিলেন ঘোর

অদ্বৈতবাদী। কিন্তু সমধিক জ্ঞানী রাঘব ভট্ট, ভাস্কর রায়, লক্ষ্মীধর বহুদিন আগেই প্রমাণ করে গেছেন প্রপঞ্চসার শঙ্করের লেখা।

তন্ত্রশাস্ত্রের 'শিব' শব্দটিই তো ব্রহ্মবাচক। উপনিষদে নির্গুণ, নিরুপাধিক যে 'ব্রহ্ম' তিনি শিব, নিষ্কল বা 'তৎ।' তারপর যখন হলেন তিনি গুণময়—নির্গুণ শিবের হল সিসৃক্ষা, প্রকৃতির হল উদ্ভব, শক্তি হল তাঁতে সঞ্চারিত, তখন শিব হলেন সঃ আর প্রকৃতি সা। উপনিষদের শিবব্রহ্ম, পুরাণের শিব-শম্ভু হয়ে তন্ত্রে শিবশক্তিতে এসে দাঁড়ালেন। তন্ত্র শাস্ত্রেও তাই বলেছেন—"অস্তি দেবঃ পরব্রহ্মস্বরূপী-নিষ্কল শিবঃ" বেদ ও তন্ত্র শিব বা ব্রহ্মকে একই জেনেছে। জেনেছে দ্বৈতবাদের মূলে অদ্বৈতবাদের ভিত্তি।

তন্ত্র শাস্ত্র বার বার বলেছে—'গুরূপদেশতো জ্ঞেয়ং ন জ্ঞেয়ং শাস্ত্র-কোটিভিঃ।' তন্ত্র শাস্ত্র পাঠে হবে না—চাই গুরু। কারণ এতে এত গুহ্য জিনিস আছে—প্রকাশে যা সাধারণে নানা বিকৃত ধারণাই টেনে আনবে—মন-মক্ষিকা ব্রণ খুঁজবার জন্য আঁকুপাঁকু করবে। তবে তন্ত্রের সাধন-পথ ভোগের মধ্যে ভোগ্য নানারসে আপ্লুত। হয়তো তাই বহু পণ্ডিত অসংযত পথের শঙ্কায় তন্ত্র-সাধনায় বহু ভাবে বাধা দিয়েছেন নানা মতে ও পথে। যা আপাত-মনোহর অথচ অতিরিক্ত সংযমের অপেক্ষা রাখে—তাদের মতে তা থেকে দূরে থাকাই ভাল। সে বিচারে আমরা যাব না—আমরা কোন মতবাদের মধ্যেও পড়তে চাই না, আমরা তন্ত্রের সারাংশ বর্ণনাই করবো।

তন্ত্র ও কৌলমার্গ

তন্ত্রশাস্ত্র জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিপুটীকৃত পদার্থকে বলেছে কুল। তুমি, তুমি যে জানবে আর তুমি যা জানবে এই তিনটি বিষয় যাতে হবে বর্ণিত বা বিস্তৃত তাই 'কুল'।

তন্ত্রশাস্ত্রের পথে সেই কুল বা ত্রিপুটকের কথা আছে বলেই তার অপর নাম কৌলমার্গ।

কুলার্ণব তন্ত্রে বলেছেন

অকুলং শিব ইত্যুক্তং কুলং শক্তিঃ-প্রকীর্তিতা,
কুলাকুলানুসন্ধানে নিপুণাঃ কৌলিকাঃ প্রিয়ে।

শক্তি দিয়ে তো আজও আমাদের বুল রক্ষা। এই কুলের বা কৌলমার্গের যাঁরা সাধক তাঁরা কৌল-সাধক -- তাঁদেরই শাস্ত্র তন্ত্র। কৌল সাধকদের প্রধান সাধনা জীব শক্তি কুণ্ডলিনীর জাগরণ।

কুণ্ডলিনী কি ?

আমাদের হৃদয়-পদ্মে আছেন 'জীবাত্মা'—শীর্ষে-সহস্রারে আছেন পরম শিব-চৈতন্য আর মূলাধার-শক্তি 'কুণ্ডলিনী'। শীর্ষদেশের পরম শিব দেন জীবাত্মাকে চৈতন্য, আর মূলাধার থেকে কুণ্ডলিনী দেন জীবাত্মাকে শক্তি।

সাধক গুরুদত্ত মন্ত্রে মূলাধার থেকে সুষুম্নার পথে কুণ্ডলিনী টেনে এনে জীবাত্মার সঙ্গে মিলিয়ে আবার তাকে তুলে নিয়ে যায় পরম শিবের চরম চৈতন্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে, অভেদ হয়ে যায় শক্তি, আত্মা ও চৈতন্য—তখনই আসে সিদ্ধি। এই যে ক্রিয়া এইটাই প্রকৃত কৌলক্রিয়া। এই ক্রিয়ায় প্রধানতঃ তিনটি ভাব ও সাতটি আচার প্রয়োজন। ভাব হলো মনের আর আচার হলো বাইরের। ত্রি-ভাব—পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। সপ্ত আচার—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার।

ত্রি-ভাব

'পশু-ভাব'—অবিদ্যার প্রভাবে, যারা মনে শুধু এই ভাবে—আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমার পুত্র, মিত্র কলত্র—তারাই পশুভাবাপন্ন। অবিদ্যার দড়িতে সে বাঁধা। পশুভাবও আবার দুরকমের। যারা মায়াঘেরা সংসারের মধ্যেও শাস্ত্র বিশ্বাসে, ধর্ম্ম আচরণে, ভগবৎ নাম কীর্ত্তনে ভাবাবিষ্ট সে 'উত্তম পশু'। আর যারা ইন্দ্রিয়বিলাসী, ধন-কামী, পরমার্থ ধনে অবিশ্বাসী তারা 'অধম পশু'

'বীরভাব'—যে উত্তম পশুভাবাপন্ন লোক, সহসা সাধন বলে অদ্বৈত জ্ঞানসম্পন্ন অমৃতের আস্বাদে বীরের মতন অবিদ্যার দড়ি কেটে পশুভাব থেকে মুক্ত হতে চায় সে বীর। মনে তখন তাঁর বীরভাব।

'দিব্যভাব'—তারপর যেদিন বীরভাবে সেই সাধক দ্বৈতভাব সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে ফেলে, জাগতিক সমস্ত দ্রব্যে শিব-শক্তির মিথুনীকৃত বিভূতির শুদ্ধরূপ—ব্রহ্মরূপ কল্পনা ক'রে, বীরভাবের সাধনায় ক্রমে এক দিব্য দেশের ছবি দেখে সে দিব্য। মনে তাঁর জেগেছে তখন দিব্যভাব।

মনের ভাব হলেই চলবেনাতো! বাইরের আচারের শৃঙ্খলাও চাই। সে আচারও সাত রকমের।

সপ্ত আচার

বৈষ্ণবাচার—বেদোক্ত নিয়ম মেনেও মাংস ভক্ষণ ও অষ্টাঙ্গ মৈথুন পরিত্যাগ, হিংসা, পরনিন্দা ও কৌটিল্য বর্জন করলে—তাকেই বলা হয় বৈষ্ণবাচার।

শৈবাচার—বেদাচারে রত এবং অষ্টাঙ্গযোগে অভ্যস্ত হবে সে। বৈধ পশু হিংসা করলেও, মাত্র শিব-শক্তি আরাধনা ও সাধনার জন্যই তা করবে।

দক্ষিণাচার—পশুভাব ও বীরভাবের সঙ্গমে অনুষ্ঠিত আচার। বেদাচার করলেও রাত্রে বিজয়া অর্থাৎ সিদ্ধি ভাঙ পান করে একাগ্র মনে 'দৈবী ভূত্বা দেবীং যজেৎ' দেবী হয়ে দেবীকে পূজা করবে।

বামাচার—দিবাভাগে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে দেবী আরাধনা করবে। রাত্রে ভোজনান্তে পঞ্চ মকারের দ্বারা দেবীর পূজা করে বৈদিক কার্য্যাদি ত্যাগ করে আত্মাকে কেবলমাত্র বামা বা শক্তি কল্পনা করে করবে সাধনা।

সিদ্ধান্তাচার—বামাচারের সব কিছুতো করবেই, উপরন্তু শোধনের দ্বারা সবই শুদ্ধ হয় এই জ্ঞানে অন্তর্যাগ ও বহির্যাগ করবে।

কৌলাচার— এই আচারটিই তন্ত্রের কৌল মার্গের চরম ও পরম অবস্থা। কিন্তু তা কী সুন্দর ও কত উচ্চ! এ আচারের বর্ণনা আছে ভাব চুড়ামণি তন্ত্রে মহাদেবের উক্তিতে,—

আমি বেদ ও তন্ত্রের জ্ঞান-সাগরমথিত করেই এই কৌলাচার বর্ণনা করছি। এ আচারের সাধক যাঁরা, তাঁদের সময় অসময় নেই, নেই কোন দিক কাল, কখনও শিষ্ট কখনও উন্মত্তবৎ ভূত পিশাচের বেশে সে ঘুরবে। কর্দ্দমে চন্দনে—পুত্রে ও শত্রুতে—শ্মশানে ভবনে—স্বর্ণে ও তৃণে তাদের সমজ্ঞান।

এখন এই সাতটি আচার আবার ত্রিবিধভাবে ভাবান্বিত হয়। চূড়ামণি তন্ত্রমতে—

পশুভাবে—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার ও দক্ষিণাচার।

কারণ তখনও সে অবিদ্যার রজ্জুতে বাঁধা—দ্বৈতমূলে, পূজা পার্বণে বা নাস্তিক ও আস্তিক ভাবে উন্মত্ত।

বীরভাবে—বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার। ঐ অবিদ্যার মায়া কেটে সে হতে চায় বীর ভাবে জাগ্রত অদ্বৈতের সন্ধানে।

দিব্য ভাবে—কৌলাচার। সব তার এক হয়ে গেছে সব কিছু মিলে গেছে সেই একে—অদ্বৈতে।

আবার বিশ্বসার তন্ত্রে আছে ৭টি আচার প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। দক্ষিণাচারে—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার এবং সবই পঞ্চমকার রহিত।

বামাচারে—পঞ্চমকারাদিসহ বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। সাধারণতঃ দ্বিজমাত্রই বেদাচারী হবেন, বৈষ্ণব হবেন বৈষ্ণবাচারী—শৈব নেবেন শৈবাচার।

একমাত্র শক্তি সাধকই দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার আর কৌলাচারের প্রকৃত অধিকারী। প্রকৃত কৌলাচারী ভাবেন—'শঙ্করঃ পুরুষাঃ সর্ব্বে স্ত্রিয়াঃ সর্ব্বে মহেশ্বরী।' সব পুরুষেই শিব আছেন আর সব নারীতেই শক্তি। শক্তি শক্তিমানকে ত্যাগ করেনা তাই শক্তির

আধার শিব সর্ব্ব দ্রব্যে। তাই সাধকের কাছে বিশ্বের সব কিছু শিবময় —শক্তিমান। বস্তুতঃ কৌলজ্ঞান মানেই নিষ্কল শিবজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান। তাইতো শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ বললে,

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।

কোন ভেদ নেই কৌলাচারী তান্ত্রিকের কাছেও। কৌল সাধকগণ —'সবই শক্তি' এই জ্ঞানে সাধনা করেন। তাই তাঁদের সাধনায় বাহ্য পূজার প্রয়োজন হয়—পঞ্চমকার, যাতে জীবাত্মা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে আনন্দময়ীর শরণ নেয়।

পঞ্চমকার

মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেবচ
মকার পঞ্চকং দেবি দেবতা-প্রীতিকারকম্।

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—পাঁচটির আদিতে 'ম' তাই নাম পঞ্চমকার। এই পঞ্চমকার সাধনা—গোপনীয় আচার ও সাধনার দ্রব্য বলেই এর উদ্দেশ্য বা বিধেয় সব গুরুর কাছেই জানা প্রয়োজন। আমরা শুধু নিছক পড়া কথাই এখানে বলছি—হৃদয়ঙ্গম করেছে তাঁরা, যাঁরা গুরুকৃপায় সাধনার পথে এগিয়ে গেছেন। সাধকের উদ্দেশে রুদ্রযামলে বলা হয়েছে—

বামে চন্দ্রমুখী মুখেচ মদিরা পাত্রং করাম্ভোরুহে
মূর্দ্ধ্নি শ্রীগুরুচিন্তনং ভগবতী ধ্যানাস্পদং মানসং
জিহ্বায়াং জপসাধনং পরিণতিঃ কৌলক্রমাভ্যাগমে
যেষাং বৈ নিয়তং পিবন্তু সুরসং তে ভুক্তি মুক্তী গতাঃ।

অর্থ—বামে সুন্দরী যুবতী, মুখে মদিরা, হস্তে পানপাত্র, মস্তকে শ্রীগুরুর চিন্তা, মনে ভগবতীর ধ্যান, জিহ্বায় মন্ত্র-জপ—কৌলসাধনায় যাঁদের এই রকম পরিণতি তাঁরাই সুরস পান করুন। ভোগ ও মোক্ষ তাঁদের করায়ত্ত। ভোগ আর মোক্ষ একসঙ্গে—এ কি সামান্য কথা! আর সামান্য নয় বলেই অসামান্য অসাধারণ পথ বুঝি বড় পিচ্ছিল।

উক্ত শ্লোকের পর রুদ্রযামলে তাই বলা হয়েছে। এই রকম চিত্ত-বিকারের কারণ প্রাচুর্য্যেও যাঁদের অবিচলিত মন কেবল দেবতার ধ্যান মাত্রেই আসক্ত—সেই সব স্থিরচিত্ত সাধকেরই এতে অধিকার। এ বিষয়ে লম্পটের অধিকার নেই। তাইতো কৌলাচার সাধারণের জন্য অতীব বিপজ্জনক। কুলার্ণবতন্ত্র বলেছে····

"কৃপাণধারাগমনাদ্‌ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ
ভূজঙ্গধারণান্নূনমশক্যং কুলসাধনম্‌

উদ্যত কৃপাণের উপর দিয়ে হাঁটা, বাঘের গলা জড়িয়ে ধরা, ফণীর ফণায় হাত দেওয়া বরং সহজ কিন্তু কুলসাধন এ সবের চেয়েও কঠিন।

সেইজন্য বেদাচারে যেমন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে সংযমের অভ্যাস ক'রে তবে গৃহস্থাশ্রমী হয়, তেমনি পশুভাবে দক্ষিণ মার্গের সাধন ক'রে, বীর ভাবে উন্নত হ'য়ে তবে দিব্য ভাবে পৌঁছোতে পারা যায়। এই জন্যই যাঁরা কৌলমার্গে দিব্যভাবে বা বীরভাবে উন্নীত, তাঁরা বলেছেন—কৌলমার্গে চরম ও পরম অবস্থায় অপবিত্র বলে কিছু নেই। না বিষ্ঠায়, না পুরীষে, না মদ্য মাংসে, না যোনী বা তনুতীর্থে।

ব্যাসকে দেখে যে নারীরা লজ্জায় দেহ বসনে আবৃত করেছিলেন—ব্যাসপুত্র শুকদেবকে দেখে তারা রইলেন অচঞ্চলা। কারণ ব্যাসের মনে পবিত্র, শ্লীলতা ও অশ্লীলতার বিচার ছিল—শুকদেবের মনে তা ছিল না। তেমনই উদাহরণ পাই জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে। তাতে আছে—বিষ্ঠাভোজী কীট বিষ্ঠা খেয়েইতো জীবন ধারণ করে। তাই বিষ্ঠা অন্নেরই সমান পবিত্র। পুরীষ যদি জীবন দান করে—সে পবিত্র। আপো নারায়ণ—জল মাত্রই নারায়ণ, শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার কোথায়? মলমূত্রের দোষ—গোময়, গোমূত্রে নেই তো! শুক্র, শোণিত, স্ত্রীরজ ও পুরুষবীর্য্য অপবিত্র হলে সৃষ্টিই তো হতো অপবিত্র। এমনকি মৈথুন—যা নৈতিক দৃষ্টিতে অতীব কুৎসিত তা নিয়ে যে উদাহরণ, অশ্লীল হলেও তা চমৎকার!

মাতৃগর্ভাদ্‌ বিনির্গত্য শিশুরেব ন সংশয়ঃ
ইন্দ্রিয়াণ্যখিলান্যস্য দেহস্থান্যপি বল্লভে

নির্ব্বিকারতয়া তত্র নান্যথা ভবতি প্রিয়ে
ভগ-লিঙ্গসমাযোগো জন্মকালে ভবেৎ সদা।

সন্তান্ প্রজননে মাতৃযোনীকে শিশুর প্রতি অঙ্গটিই স্পর্শ করে, কিন্তু শিশু সেখানে নির্ব্বিকার। তাই তো পাপ নেই।

পঞ্চ মকারের প্রয়োজন

অতএব বিকার এলেই দ্রব্যে পাপ হয়। পঞ্চ মকার যাবৎ মনকে কেন্দ্রীভূত করতে—সমস্ত ভাবনা থেকে বিচ্যুত ক'রে, ধ্যেয় পথে আবদ্ধ করতে সহায়ক হয়—তাবৎ সে অমৃত।

পঞ্চ মকারের মধ্যে মাংস ও মৎস্য পরে হিংসার মধ্যে, কিন্তু মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুনে আসে নীতিগত প্রশ্ন। আমরা তাই পঞ্চ মকারের পাঁচটি বিষয় এখানে আলোচনা করি। কল্পসূত্রে আছে—

"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্
তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চ মকারাস্তৈরথার্চ্চনম্।

আনন্দেই ব্রহ্মের রূপ, সেই আনন্দ আছে দেহে—তাকে জাগিয়ে তুলতেই প্রয়োজন পঞ্চমকার—

পঞ্চ মকার শোধন—

মন্ত্রসংস্কারসংশুদ্ধামৃতপানেন পার্ব্বতি
জায়তে দেবতা ভাবো ভববন্ধবিমোচকঃ।

সব দ্রব্যই মন্ত্র সংস্কারে শুদ্ধ করে নিতে হবে। তা হলেই উচ্ছৃঙ্খলতা, অপরিমিত মাত্রা বা অবিধিসঙ্গত পথ সাধনাকে গ্লানিময় করবে না।

তবে মন্ত্রশক্তিতে দ্রব্যশুদ্ধ হয় কিনা এ নিয়ে যদি তর্ক তোলা যায় তবে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্যের শারীরিক ভাষ্যের লেখা দেখতে হয়।

যোগশাস্ত্রেই দ্রব্যগুণ ও ক্রিয়াগুণ স্বীকৃত। তিনি লিখেছেন—

"লৌকিক ব্যাপারেও দেখা যায়—দেশকাল নিমিত্তের বৈচিত্র্যবশতঃ মণি, মন্ত্র, ওষধি প্রভৃতির শক্তির দ্বারা পরস্পরবিরুদ্ধ অনেক কার্য্য হইয়া থাকে। এ সকল শক্তি, উপদেশ ভিন্ন কেবল তর্কের দ্বারা অবগত

হওয়া যায় না। অতএব মন্ত্রে দ্রব্য শুদ্ধ করিয়া নিয়মিতভাবে পরিমিত মাত্রায় পান বা ব্যবহার করাই বিধিসঙ্গত।"

যোগ সাধনা ও কৌলমার্গ—

যোগ শুধু কঠোর "ত্যাগের" উপর প্রতিষ্ঠিত। কৌল মার্গে "ভোগের"ও স্থান আছে। রুদ্র যামলে আছে—

যত্রাস্তি ভোগো ন তু তত্র মোক্ষ
যত্রাস্তি মোক্ষো ন তু তত্র ভোগঃ
শ্রীসুন্দরী সাধকপুঙ্গবানাং
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব।

ভোগ চাইলে যোগের পথে মুক্তি আসে না, মুক্তি চাইলে ভোগ করতে হয় ত্যাগ ; তাই শক্তি উপাসনায় ভোগের সঙ্গে মুক্তিলাভ হয়— এই জন্য কৌলমার্গ শ্রেষ্ঠ।

এ যুগেও তাই চায়—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"

'সব ছাড়, সব ভুলে যাও—মানুষের রক্তের ডাক একেবারে ডুবিয়ে দাও—' তন্ত্র বলে এ অসম্ভব। তাই চাই এই পঞ্চ 'ম' কার মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুনজনিত নানারূপ ভোগ ; তবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন আচারেই তা অনুষ্ঠিত হবে। তারই একটি উদাহরণ উল্লাস।

উল্লাস কথাটাও এখানে একটু আলোচনা করা দরকার। কারণ প্রথম 'ম'কার মদ্যের প্রসঙ্গে তা পুনঃপুনঃ বলা হয়েছে।

সপ্ত উল্লাস—উল্লাস মানে আনন্দ। তার সাতটি স্তর। মাত্র তিনটি চুলুক পানে হয়—আরম্ভ উল্লাস। তাতে যখন তরুণ আনন্দ আসে তা' তরুণ উল্লাস। তারপর উল্লাস যখন সম্যকদেখা দেয় সেটি যৌবন উল্লাস, কিন্তু যখন দৃষ্টি, মন, বাক্য হয় চ্যুত তখন প্রৌঢ় উল্লাস। যখন পূর্ণ মত্ততা এল, হলো তদন্তোল্লাস। বাইরে বিকৃতি গিয়ে মন যখন অন্তর্নিরুদ্ধ হলো তখন উন্মনী উল্লাস! আর যখন মন জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হয়েছে তখন অনবস্থা উল্লাস। এই

ভাবে প্রতিটি মকারের স্তরভেদ ও ভোগের সীমিত অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। সে স্তর ডেঙ্গালে চ'লবে না।

যোগবাশিষ্ট রামায়ণে বৈদিক পরিবেশের মাধ্যমে এই অবস্থা সপ্তককে সপ্তজ্ঞান ভূমিকা বলেছে। যথা—শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসী, সত্তাপত্তি অসংসক্তি, পদার্থভাবিনী ও তূর্য্যগা। তন্ত্রে ও বেদান্তে তাহলে প্রভেদ দেখা যায় এই যে—তন্ত্রে ভক্তি মার্গ দিয়ে জ্ঞান পাবার ব্যবস্থা, আর বেদান্তে জ্ঞান মার্গ দিয়ে ভক্তি পাবার ব্যবস্থা।

তন্ত্র বলে স্বাভাবিক পরিবেশে মানুষ দেবতা হতে পারে না—দেবতা তাকে হতে হয়। কিন্তু তার স্বভাব-ধর্ম্ম হচ্ছে—ভোজন ও মৈথুনাসক্তি।

নৃণাং স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজন মৈথুনম্
সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্ম্মে নিরূপিতম্।

এমন কি, যে তন্ত্রে বলেছে 'মরণং বিন্দুপাতেন-জীবিতং বিন্দুধারণাৎ' —বীর্য্য-বিন্দু ক্ষয়ে মরণ, ধারণে জীবন, সেই তন্ত্র আবার মৈথুনের বিষয় বর্ণনা করেছে—

মহানন্দকরং দেবী প্রাণিনাং সৃষ্টিকারণম্,
অনাদ্যন্তজগন্মূলং শেষতত্ত্বস্য লক্ষণম্।

তবে এই পঞ্চতত্ত্ব—এই পঞ্চমকার বিপজ্জনক বস্তু ও তর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই এখানে দু একখানি গ্রন্থের আলোচনা কর্ত্তব্য। তন্ত্রের মধ্যে সহজ ও প্রধান কৌলপনিষৎ এবং পরশুরাম কল্পসূত্র। বুঝবার জন্য না হয় তা থেকেই একটু উদাহরণ দেখা যাক।

কৌলোপনিষদ্

কৌলোপনিষদ্ উপনিষদের সমগৌরবে গৌরবান্বিত। মাত্র পঁয়তাল্লিশটি সূত্রে গ্রন্থ শেষ। তন্মধ্যে আমরা টীকা-টিপ্পনী না করে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করি।

উপনিষদের প্রথম পাঠ্য শান্তিবাক্যে কৌলোপনিষদ বলেছে—

ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্ বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তি—শান্তি—শান্তি।

ব্রহ্মকে ব'লব—তিনি আমাকে রক্ষা করুন, বক্তাকে রক্ষা করুন।

প্রপঞ্চ ঈশ্বরঃ। অনিত্যং নিত্যং। অজ্ঞানং জ্ঞানং। অধর্ম এব ধর্ম্মঃ। এষ মোক্ষঃ।

তাৎপর্য্য—ঈশ্বর প্রপঞ্চ বা নিয়ন্তা। অনিত্য বস্তুও ব্রহ্মশক্তি। অজ্ঞানও ব্রহ্মশক্তি। অধর্ম্মই ব্রহ্ম এবং শক্তি। ইহাই মুক্তি।

গুরুরেকঃ। মদাদিস্ত্যাজ্যঃ। প্রাকট্যং ন কুর্য্যাৎ। নকুর্য্যাৎ পশু সম্ভাষণম্। অন্যায়ো ন্যায়ঃ।

গুরু এক। মদাদিস্ত্যজ্য (অর্থাৎ যে পরিমাণ মদ্যে মাতলামি হয় তা ত্যজ্য।) মন্ত্র প্রকাশ ক'রবে না। পশু (অজ্ঞানী) সঙ্গে আলাপ কোরো না। অন্যায় ও শুভ সাধনের জন্য ন্যায় হয়।

নগণয়েৎ কমপি। আত্মরহস্যং ন বদেৎ। শিষ্যায় বদেৎ। অন্তঃ শাক্তঃ বহিঃ শৈবঃ। লোকে বৈষ্ণবঃ।

সাধনার পথে বিঘ্নকারী কাউকে গণনা করবে না। শিষ্যকে বলবে। অন্তরে হবে শক্তিমান। বাহিরে হবে মঙ্গলময়। লোকে হবে বিনয়ী।

লোকান্ ন নিন্দ্যাৎ। সর্ব্বসমো ভবেৎ।

লোককে—কাউকে কোন মতকেই নিন্দা করবে না। সব সমভাবে ভাব—কৌল সাধনায় সব আত্মতুল্য।

কৌলোপনিষদের এইকটি কথা সত্যই মানব-জীবনের সম্পদ। জীবনের মহান নীতি-কথা।

চতুঃষষ্টি-তন্ত্র

কৌলোপনিষদ ছাড়াও শক্তি-বাদের পথে আরও অনেক উপনিষদ্ আছে। যেমন ত্রিপুরা মহোপনিষদ্, কৌলোপনিষদ্, সুন্দরী তাপশী উপনিষদ্, গুহ্যোপনিষদ প্রভৃতি। এ ছাড়া কৌলমার্গের জন্য কুল-গ্রন্থও বহুবিধ। তন্মধ্যে চতুঃষষ্টি তন্ত্রের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য্য বা বামেকশ্বর তন্ত্র এই কথাই বলেছেন। এই ৬৪ খানি তন্ত্রই কুলগ্রন্থ।

উক্ত চতুঃষষ্টি তন্ত্রের প্রতিতন্ত্রে বিভিন্ন নামে শক্তির উপাসনা বিহিত হলেও, সাধারণতঃ শ্রীবিদ্যার উপাসনা নিয়েই তার কয়েকখানি রচিত—অন্যগুলিতে ঐ শ্রীবিদ্যারই অঙ্গরূপে অন্যদেবতার উপাসনার কথা লেখা।

বামকেশ্বর তন্ত্রে এই ৬৪ খানার নাম দেখা যায়। মহামায়া তন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র, ভৈরবাষ্টক তন্ত্র, বহুরূপাষ্টক তন্ত্র, ব্রহ্মযামল, রুদ্রযামল বিষ্ণুযামল প্রভৃতি অষ্টযামল, চন্দ্রজ্ঞান তন্ত্র, মালিনী তন্ত্র, মহাসম্মোহন তন্ত্র, বাতুলোত্তর তন্ত্র, হৃদ্ভেদ তন্ত্র, তন্ত্রভেদ তন্ত্র, গুহ্য তন্ত্র, কামিক তন্ত্র, কলাবাদ তন্ত্র, কুব্জিকামত তন্ত্র, বীণাতন্ত্র, পঞ্চামৃত তন্ত্র, রূপভেদ তন্ত্র, ভূতোড্ডামর তন্ত্র, কুলচূড়ামনি তন্ত্র, সর্ব্বজ্ঞানোত্তর তন্ত্র, মহাকালী তন্ত্র, কুরূপিকামত তন্ত্র, দেবরূপিকা তন্ত্র, পঞ্চআত্মা তন্ত্র, বৈশিষক তন্ত্র, মোহিনী তন্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ আছে। নামগুলি দেখলেই বক্তব্য বিষয় অনেকটা বোঝা যায়। এছাড়াও কুলার্নব, বামকেশ্বর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অন্যান্য আরও কয়েকখানি তন্ত্র আছে বলে শোনা যায়।

উপনিষদ্ ও চতুঃষষ্টী তন্ত্রের পরই আমরা তান্ত্রিক কল্পসূত্র পাই। আর তার মধ্যে অনেকেই পরশুরাম কল্পসূত্রকে প্রধান বলে মেনেছেন। কারণ এই পরশুরামকেই অনেকে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার জামদগ্ন্য পরশুরাম বলে স্বীকার করেছেন এবং কুলমূলাবতার কল্পসূত্র নাম দিয়েছেন। তবে রামেশ্বরকৃত বৃত্তি সহ যে কল্পসূত্র আজ প্রকাশিত—তাতে আছে প্রথমত শ্রীদত্ত নামক গুরু কৌলমার্গের সাধকের জন্য ১৮০০০ শ্লোকের গ্রন্থ 'শ্রীদত্ত সংহিতা' রচনা করেন। কিন্তু বৃহদাকার এই গ্রন্থ সাধারণের অবোধ্য হতে পারে ভেবেই, এক সংক্ষিপ্ত সরল সংহিতা রচনা করেন পরশুরাম। কিন্তু তাও ৫০ খণ্ডে সম্পূর্ণ। তখন তাঁর শিষ্য সুমেধা—উক্ত দুখানি গ্রন্থথেকে সার সঙ্কলন করে লেখেন এই—"পরশুরাম কল্পসূত্র"। বর্ত্তমানে প্রাপ্ত ১৮টি খণ্ডে এর পূর্ণরূপ দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও কত তন্ত্র, তন্ত্রের কত মন্ত্র যে আজ লুপ্ত হয়ে গেছে তা কে বলবে?—শাস্ত্রে আছে সপ্তকোটি মহামন্ত্র' শিব বলেছিলেন—জীব কল্যাণে। আমরা কল্পসুত্রের অল্পই উদাহরণচ্ছলে বলবো।

পরশুরাম কল্পসূত্র

কল্পসূত্র কাকে বলে ?—এর উত্তরটি যেন পাই গ্রন্থের প্রথম সূত্রে।

অথাতো দীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যাম—

এবার আমরা দীক্ষা ব্যাখ্যা করবো। এই আমরা মানেই—এর মধ্যে তন্ত্রের প্রবর্ত্তক সকল মহাসাধকের কথা নিয়েই এই কল্পসূত্র রচিত—এই ভাবা যেতে পারে।

তন্ত্রের উৎপত্তি

তারপরেই তন্ত্রের উৎপত্তি বিবরণ পাই দ্বিতীয়সূত্রে—

ভগবান পরম শিব ঈশ্বর রূপে তত্তৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে বেদ প্রভৃতি অষ্টাদশ বিদ্যা এবং দর্শন সকল প্রণয়ন করবার পর ভগবতী ভৈরবীর প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চমুখে পরমার্থ সারভূত পঞ্চ আম্নায় প্রণয়ন করেন। এই আম্নায় কথাটির অর্থ কিন্তু বেদ। "শ্রুতিঃ স্ত্রী বেদ আম্নায়"। চারবেদের পর এই তন্ত্র, তাই এর নাম পঞ্চ আম্নায়—অনেকে এই বলেন। আবার অনেকে শিবের পঞ্চমুখে পঞ্চতন্ত্র বা পঞ্চ আম্নায় বলা হলো বলে তন্ত্রকেই আম্নায় নাম দিয়ে তার পাঁচটি বিভাগ করেন।

তাঁরা বলেন, পার্ব্বতীকে শিব যখন বলে চললেন পঞ্চমুখে তন্ত্রের মহিমা-কথা, তখন সদ্যোজাত নামক পূর্বমুখে বললেন পূর্বআম্নায়, অঘোর নামক দক্ষিণ মুখে বললেন—দক্ষিণাম্নায়, বামদেব নামক উত্তর মুখে বলা হলো উত্তরাম্নায় আর ঈশান নামক ঊর্দ্ধমুখে বললেন ঊর্দ্ধাম্নায়। তন্ত্রের এই পাঁচটি বিশেষ ভাগ।

বেদকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েও তন্ত্রকে পঞ্চ আম্নায় বা পঞ্চমবেদ বলা হয়েছে।

শেষ পর্য্যন্ত বিবাদ ঘুচে একটা মিলনের সুর আছে বিভিন্ন এই দুই পথে। কিন্তু আবার অগ্নিপুরাণে নারকীরা বলেছেন—

আমরা লোভ বশতঃ বৈদিক মার্গ ত্যাগ করে, তন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলাম—তাই এই নরক ভোগ করছি।

এই তন্ত্রশাস্ত্রের মূল কি—এই বলতে গিয়ে কুণ্ঠাহীন ভাবেই তন্ত্র বার্ত্তিক বলে গেছেন—মূল ঐ "লোভ"।

বক্তব্য এখানে এই যে তন্ত্রে শান্তিক, পৌষ্টিক, মারণ, বশীকরণ উচাটন, আকর্ষণ, যক্ষিণী বা যোগিনীসাধন এই সব ঐহিক ফল লাভের উপায় লেখা আছে। তাতে পরলোকের উন্নতি বা মুক্তির কথা নেই। ঐহিক অলৌকিক স্বার্থ-পূর্ণ কাম বা ফল দেখেই অনেকে তন্ত্রের মত আশ্রয় করে—কেউ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে, কেউ স্বার্থ বশীভূত হয়ে—কেউ বা অর্থ লাভের জন্য। অতএব লোভ ত বটেই।

তাই বার্ত্তিক বলে গেছে—বেদ-বহির্ভূত এই সব পাষণ্ড মত নিজের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির লোভেই প্রচারিত। শাক্য প্রভৃতি পাষণ্ডগণ সর্ব্বত্র ধর্ম্মোপদেশ দিয়ে থাকে, কিন্তু সবই নিজেদের গড়া মতে—গৌতমাদির মতানুযায়ী বেদকে মূল স্বীকার করে না।

তন্ত্র বার্তিকই যখন এমন কথা বলে, তখন একটু কেমন কেমন মনে হয় না কি?—বুদ্ধ বা শাক্যের বিরুদ্ধে বিষ উদ্‌গার করতে গিয়ে তন্ত্রকেও বুঝি আঘাত করে ফেলেছেন—এমনই মনে হয়। কিন্তু পরে দেখি স্পষ্ট ক'রে বললেন—সাঙ্খ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র (বৈষ্ণব তন্ত্র), পাশুপত (শৈবশাস্ত্র), শাক্য (বৌদ্ধ), নিগ্রহ (জৈন) এই সব ধর্ম্মমতের গ্রন্থগুলি বেদকে কখনও মানেনি। বরং লোক সংগ্রহ, মান, সম্মান, লাভ, পূজা খ্যাতি এই সব প্রয়োজনেই তারা বেদ মিশ্রিত খানিকটা আবরণ নিয়ে বেদবহির্ভূত আচারই পালন করেছেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান, অর্থাপত্তি—নানা তর্ক কোরে। তারা বিষ চিকিৎসা, বশীকরণ, উচাটন, সম্মোহন প্রভৃতি কাজে মন্ত্র ও ঔষধাদির সাহায্যে খানিকটা কৃতকার্য্য হ'য়ে, অহিংসা, সত্য, দম, দান প্রভৃতি কিছু বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে এক এমন শাস্ত্র উপদেশ দিয়েছে যা মানুষের পক্ষে আপাত মনোহর। এমন কি শেষ পর্য্যন্ত ম্লেচ্ছের মতন একত্রে আহারাদির উপদেশেও রত হয়েছে। কিন্তু এ সবই শ্রুতির বিরোধী ও বেদ-মতে উপেক্ষণীয়।

এই ভাবেই চলেছে কলহ। তার মানে, যখন যে সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে, পেয়েছে ভক্তের বা সাধকের সহানুভূতি বা শ্রদ্ধা তখনই তারা বিপরীত মতবাদকে করেছে আক্রমণ।

তবে শেষ পর্য্যন্ত বিচ্ছেদের কলহে যেন একটা আপোষের সুর দেখা দেয়। আবার শাস্ত্রেরই মাধ্যমে সে যেন একটা শেষ রফা।

সুত সংহিতা বল্লে—বৈদিক পথে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় সহজে ও শীঘ্র, তান্ত্রিক মতে তাতে হয় দেরী।

কলহ যেন আরও মিটে গিয়ে ধ্বনিত হ'লো—

আম্নায়াগমবেদ্যায় শুদ্ধবুদ্ধায় তে নমঃ

আম্নায় অর্থাৎ বেদ ও আগম বা তন্ত্র এই উভয় মার্গেই যাঁকে জানা যায় তাঁকে নমস্কার!

এই যে দোষারূপের প্রচণ্ড ঝড়, আবার শ্রেষ্ঠত্বের মান বিচারে একটা সাম্য ভাব, আবার দুই এক-অভেদ নয় কিছু, এই সব মতবাদ মিলে তন্ত্রকে এক রহস্যের জালে ঘিরে রেখেছে। সে জাল ছেদ করার ক্ষমতা শুধু গুরুর। কারণ জিনিস বুঝতে বা বোঝাতে গেলে যে আলোচনা বা যে মন্ত্রাদির ব্যাখ্যা প্রয়োজন, তন্ত্র শাস্ত্র বার বার তা প্রকাশ্যে বলতে বারণ করেছে। স্বমাতৃজারবদগোপ্যা; —মাতৃ জারের মতন জেনেও তা গোপন রাখবে।

কিন্তু কি ঐ তন্ত্র? কি ঐ আগম নিগম শাস্ত্র?

আগম ও নিগম

নামটিতেই দেখি শৈব, বৈষ্ণব ও শক্তির মিলন। মহাদেবের পঞ্চমুখ থেকে যে মন্ত্র আগত, শক্তির নিকট গত এবং বিষ্ণুর অভিমত—তাই আগম। আগতের 'আ' গতের 'গ' আর মতে'র 'ম' মিলে আগম।

আবার পার্ব্বতী যা বললেন বা তাঁর মুখ থেকে যা নির্গত এবং মহাদেবের নিকট গত আর বিষ্ণুর 'মত'-প্রাপ্ত—তাই নিগম।

তন্ত্রের দুটি ভাগ—আগম ও নিগম। এক ভাগে দেবী প্রশ্নকর্ত্রী

মহাদেব উত্তর দাতা আর তাই আগম। আর এক ভাগে মহাদেব প্রশ্ন কর্ত্তা, দেবী উত্তর দাত্রী—তাই নিগম।

সেই আলোচনার প্রসঙ্গেই পরশুরাম কল্পসূত্রের প্রথম বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে সেই আদিম সৃষ্টির রহস্য।

বলা হয়েছে সৃষ্টি ষট্‌ত্রিংশ তত্ত্বে পূর্ণ। ৩৬টি দ্রব্যে গড়া এই বিশ্বের মধ্যে আছেন শিব, শক্তি, ঈশ্বর, বিদ্যা, মায়া, কলা, রাগ, কাল, নিয়তি, পুরুষ, প্রকৃতি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, পঞ্চ স্থূলভূত, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথ্বী ও সব।

কল্প সূত্রে বলেছে প্রাণীবর্গের ভোগ প্রদান করে যা তাই তত্ত্ব। ভোগই বিশ্বের তত্ত্ব কথা। বলেছেন, যে শিব তত্ত্বে বা মন্দে আবৃত তিনি জীব, আর যে শিব তত্ত্বাতীত তিনি পরম শিব। অতএব সেই বেদের কথাই এল—যে জীব সেই শিব।

বেদের কথাই বলেছেন কল্পসূত্রে পরশুরাম—শব্দ বা মন্ত্র নিত্য। তার শক্তিও চিন্তার অতীত। সাধনা ও বিশ্বাসেই তার সিদ্ধি। বলেছেন—গুরু, মন্ত্র, দেবতা, আত্মা, মন ও প্রাণবায়ু একত্রিত হলেই আত্মজ্ঞান। এ পর্য্যন্ত যেন সবই বেদের কথা।

বেদে পাই রসো বৈ সঃ, রসং হ্যে বায়ং লব্ধা আনন্দীভবতি

তন্ত্রে আছে—আনন্দংব্রহ্মণো রূপং, তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং,—

তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাস্তরর্চ্চনং গুপ্ত্যা প্রকট্যান্নিরয়ঃ।

"আনন্দ ব্রহ্মের রূপ, সেই আনন্দ দেহে অবস্থিত। পঞ্চমকার সেই আনন্দের অভিব্যঞ্জক, সেই হেতু পঞ্চ মকার দ্বারা গোপনে অর্চ্চনা করিবে, প্রকাশ্যে নরকগামী হইতে হয়।

পঞ্চমকারের বিধি বলবার আগেই কল্পসূত্র কয়েকটি নিয়ম বা ধর্ম্ম বলে নিয়েছে। তন্মধ্যে ১২টি জানবার মতন।

প্রথম ধর্ম্ম—'ভাবনাদার্ঢ্যাদাজ্ঞাসিদ্ধিঃ'—ভাবনার দৃঢ়তাতেই সাধনায় সিদ্ধি আসে।

দ্বিতীয় ধৰ্ম্ম—'সর্ব্বদর্শনানিন্দা'। কোন দর্শনেরই নিন্দা করবে না।

তৃতীয় ধৰ্ম্ম—'অগণনং কস্যাপি'। নিজের কাজে কাউকে গণনা করবে না বা ভয় করবে না

চতুর্থ ধৰ্ম্ম—'সচ্ছিষ্যে রহস্য কথনম্'। রহস্য কথা বলবে শিষ্যকে।

পঞ্চমধৰ্ম্ম—'সদা বিদ্যানুসংহতিঃ'। সৰ্ব্বদা বিদ্যা বা মন্ত্র ব'লে তার অর্থের অনুসন্ধান করবে। অনেকে বলেন, মানস পূজা করবে।

ষষ্ঠ ধৰ্ম্ম—"সততং শিবতা সমাবেশঃ"। সব সময় মনে করবে "আমি শিব"। জীবে ও শিবে প্রভেদ নেই ভেবেও নিত্য কৰ্ম্ম করবে।

সপ্তম ধৰ্ম্ম—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যাবিহিতহিংসাস্তেয়-লোকবিদ্বিষ্ট বর্জনম্—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, অবিহিত, হিংসা, স্তেয় বা চুরি এবং লোকগর্হিত কাজ করবে না। উদাহরণ বলেছেন—মার মতন ভেবেও পরস্ত্রীর সঙ্গে নির্জ্জনে থাকবে না। লোকে বা সমাজে সেটা গর্হিত।

অষ্টম ধৰ্ম্ম—"একগুরূপাস্তিরসংশয়ঃ"। এক গুরুই উপাস্য, তাতে সন্দেহ থাকবে না।

নবম ধৰ্ম্ম—'সর্ব্বত্র নিষ্পরিগ্রহতা।' ভোগ কামনায় পঞ্চমকারাদি গ্রহণ করবে না।

দশম ধৰ্ম্ম—'ফলং ত্যক্ত্বা কৰ্ম্মকরণম্।' ফল ত্যাগ করে কৰ্ম্ম কর। গীতার সেই কথা—কর্ম্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়।

একাদশ ধৰ্ম্ম—'অনিত্যকৰ্ম্মলোপঃ'। নিত্য কৰ্ম্ম লোপ করবে না।

দ্বাদশ ধৰ্ম্ম—'নির্ভয়তা সর্বত্র—কাউকেই ভয় ক'রো না, পঞ্চমকারাদি বর্ণনা করে অন্য শাস্ত্র তোমাকে ভয় দেখালে তুমি তা মানবে না।

তন্ত্র এইকটি ধৰ্ম্ম স্থির করে দিয়ে সাধনার ক্রম নির্ণয়ে এগিয়ে গেছে বটে কিন্তু প্রধানতঃ সেই সব তান্ত্রিক রীতির মধ্যেই—সন্দেহ, রহস্য, কলঙ্ক, আশঙ্কা আসে এই পঞ্চমকার নিয়ে।' অতএব প্রথম আমরা আলোচনা করবো পঞ্চমকার কি ?

পঞ্চমকার—সাধারণতঃ মদ, মাংস, মৎস্য, ও মৈথুন এই পঞ্চমকার তিন পথে বা তিন মতে হয়েছে প্রয়োগ।

(১) খাঁটি মদ, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন।

(২) তার অনুকল্প বা প্রতিনিধি।

(৩) আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় সমর্থন।

প্রথমটিতে খাঁটি মদ, মাংস, মৈথুনাদির কথা বললেও, যে সে, যা তা ভাবে, যে কোনো পরিমাণ খাবে না—প্রকৃত অধিকারী, বিধিবদ্ধ সংস্কারে, তাকে শোধিত করে, বিধিবৎ পরিমাণে তা ভোগ করবে।

কিন্তু এসব কথা তন্ত্র এমন ভাবেই বলেছে যে সে সব কঠিন নিয়ম শুনলেও মনে হয়, ও দ্রব্য ব্যবহার না করাই ভাল ; কারণ সাধারণের পক্ষে সে সব নিয়ম একেবারেই সাধ্য নয়।

আমরা এখানে তার দু একটা উদাহরণ দিই। আর তা প্রথম মকার মদ নিয়েই দিতে চেষ্টা করি।

মদ—বেদ, স্মৃতি, প্রভৃতিতে সুরা পান তো নিষেধ করেইছে, তন্ত্রশাস্ত্র কুলার্ণবেও বলেছে—'ইচ্ছাকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত, প্রজ্জ্বলিত সুরাপানে প্রাণত্যাগ'। ত্রিপুরার্ণবে আছে—ব্রাহ্মণ যদি মোহ বশতঃ একবারও সুরাপান করে তবে সে বিদ্বান হলেও তন্ত্রজ্ঞ কর্তৃক ত্যক্ত হবে। দেবীযামল তন্ত্রে তো বলেছে—সুরা দর্শনও পরিত্যাগ করবে। এইভাবে কঠিন আদেশ-বাণীতে সুরাপান নিষিদ্ধ। কিন্তু তারপরই শাস্ত্রের অন্য বাণী শুনি "যজ্ঞাদি ব্যাপারে অশ্বাদি বধের ন্যায় সুরাপানও বিধেয়।" সুরটা নরম ; আরও নরমসুরে বিধি দিল কুলার্ণব তন্ত্র—

বীক্ষণ-প্রোক্ষণ-ধ্যান-মন্ত্র-মুদ্রাবিভূষিতম্
দ্রব্যং তর্পণযোগ্যং স্যাদ্‌দেবতাপ্রীতিকারকম্।

দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখে, মূল মন্ত্রাভিষিক্ত জলে সিঞ্চিত ক'রে, অমৃত রূপ ধ্যানে, মূলমন্ত্র যোগে, ধেনুমুদ্রা প্রদর্শনে সুরাকে তর্পণযোগ্য করে নিতে হবে। যাতে দেবতা তৃপ্ত হন। প্রকৃত অধিকারীর এই বিধি।

অধিকারী ও বিধি—বিধান তো শব্দ সমষ্টি নয়—করতে হবে।

দিব্য দৃষ্টি হওয়া কি সহজ ? যার হয় সেকি আর মদের জন্য বসে আছে না মাতাল হতে তার বাকি ! তারপর মূলমন্ত্র দেবেন প্রকৃত গুরু। নেবেন প্রকৃত অধিকারী—শিষ্য। তারপর দীক্ষিত সাধনায় মন্ত্রসিদ্ধি হলে, তবে তো তার প্রভাবে সুরায় হবে অমৃতরূপ ধ্যান। বুঝতে হবে মৃত্যু-বিহীন সে অ-মৃত কি ? তারপর প্রকৃত মন্ত্র, প্রকৃত মুদ্রা—এসব কি সহজ বস্তু ! অনেক বৈদিক মন্ত্রে সুরা ও গোবধের ব্যবস্থাও আছে। তবে সর্ব্বত্রই পরিমাণ, কাল, সব হবে নির্দ্দিষ্ট। বিষয়টা আরও একটু স্পষ্ট বোঝা যাক। প্রথমে মদ্যপানের অধিকারী কে ? প্রকৃত কৌল যে, তার লক্ষণ কি ?

ব্রাহ্মণো বেদশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞো বুদ্ধিমান বশী
গূঢ়তন্ত্রার্থভাবস্য নির্ম্মন্থ্যোদ্ধরণক্ষমঃ
কৌল মার্গেঽধিকারী স্যাদিতরো দুঃখ ভাগ ভবেৎ”

অর্থাৎ বেদশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞ, বুদ্ধিমান, জিতেন্দ্রিয় যে ব্রাহ্মণ, তন্ত্রশাস্ত্রের ভাবমন্থন করে, সার উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন তিনিই কৌলমার্গে অধিকারী। অন্য কেউ এ মার্গে এলে দুঃখ পাবেই। সাবধান করে দিয়েছেন কুলার্ণবে—যে মদ্য পান ক'রে দেবতারাও মোহগ্রস্ত হন, সেই মদ্য পান করে যে অবিকৃত থাকে সেই প্রকৃত কৌলিক।

কিন্তু মদ্য গ্রহণের পূর্বে পূর্ণাভিষিক্ত হবার কথা বলেছে ঐ তন্ত্রই।

পূর্ণাভিষেক—পূর্ণাভিষিক্ত কে ? তবে শুধু দীক্ষায় পূর্ণাভিষিক্ত হতে পারে না। প্রকৃত কৌলের যে লক্ষণ বলেছে কুলার্ণব তা হচ্ছে—।

যো নিন্দা-স্তুতি-শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখাদিসম্ভবে।
সমঃ সর্ব্বত্র যোগীশো হর্ষামর্ষবিবর্জিতঃ
তত্ত্বত্রয়-শ্রীচরণ-মূলমন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ
দেবতা-গুরুভক্তশ্চ শাম্ভবীমুদ্রয়ান্বিতঃ
স চ পূর্ণাভিষিক্তঃ স্যাৎ কৌলিকো ন তু দীক্ষয়া।

নিন্দা, স্তুতি, শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ সবে যার তুল্য জ্ঞান, লোভে যার হর্ষ নেই, ক্ষতিতে নেই বিমর্ষতা, তত্ত্বত্রয়, গুরুর চরণ,

মূল মন্ত্রের যাথার্থ জিনি জেনেছেন, যিনি শাম্ভবী মুদ্রাযুক্ত, দেব ও গুরুভক্ত তিনিই পূর্ণাভিষিক্ত। শুধু দীক্ষিত হলেই হয় না।

এমন পূর্ণাভিষিক্ত যে,—তিনি ঐ পরিমাণ মদই খাবেন।

ত্রি-প্রকার—এহেন সুরা কিসে উৎপন্ন হয় সেটাও তো জানা দরকার। সুরা তিন রকম—গৌড়ী, মাধ্বী, ও পৈষ্টী।

ইক্ষুজাত গুড় বা মধু থেকে যে সুরা তাই গৌড়ী এবং তা সাত্ত্বিক।

মধুক পুষ্প বা মহুয়া, দ্রাক্ষা এবং তাল বৃক্ষ থেকে যে সুরা উৎপন্ন তাই মাধ্বী এবং তা' রাজসিক।

পিষ্টক, বা চাল থেকে যা উৎপন্ন তার নাম পৈষ্টি—এ তামসিক।

ভৈরবী তন্ত্রে এরই একটু রকম ফের দেখা যায়—

বৃক্ষ থেকে যে সুরা তার নাম ক্ষীর, ছাল থেকে যে সুরা তার নাম আজ্য, ফুল থেকে যে সুরা তার নাম মধু, আর চাল থেকে যে সুরা তার নাম আসব।

ত্রিভাব—এই সুরা পানেরও আবার তিন রকম ভাব—দিব্য ভাব বীরভাব ও পশু ভাব। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সুরা বোধহয় এই জন্যই পৃথক পৃথক ভাবে নির্ম্মিত হয়।

ত্রি-কাল—এই তিন রকম সুরা পানের কালও পৃথক। দেবতা বিসর্জনের পূর্বে দিব্য-পান, বিসর্জনান্তে বীর-পান ও অসংস্কৃত সুরা পান —পশু-পান।

ব্রাহ্মণ শুধু দিব্য-পান করবে, ক্ষত্রিয় করবে বীর-পান আর শূদ্র করবে ঐ পশু-পান।

তান্ত্রিক মণ্ডলে বা আসনে সাধনার জন্য যারা বসবে তাদের যদি মদ্য পানে বিকার আসে তবে তাকে মণ্ডল থেকে বের করে দেবে এই হল তন্ত্র বাক্য।

তাহলে অধিকারী হবে সংযত, তার বিকার হবে না। সে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ হিসাবে দিব্য, বীর বা পশু-পান করবে।

মাত্রা—মদ্যপানের কি পরিমাণ? পরমানন্দ তন্ত্রে বলেছে—

বালা-মন্ত্রের উপাসক তিন পাত্র, পঞ্চদশী মন্ত্রের উপাসক চার পাত্র, ষোড়শী মন্ত্রের উপাসক পাঁচ পাত্র মদ্য পান করবে। আরও খেতে পারেন তিনি।

'পাত্বা পাত্বা পুনঃ পিত্বা যাবৎ পতিত ভূতলে।'

তবে মদ খেয়ে মজা করার জন্য মাটিতে লুটোলে ধুলোই লাগবে— ধর্ম্ম হবে না, শক্তির অনুগ্রহ লাভ হবে না—এ তন্ত্রই বলে গেছে। চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত ক'রে একমাত্র ইষ্ট জ্ঞানে তন্ময় হয়ে যাবার জন্য বাহ্য জ্ঞানটা পুরোপুরি লোপ পাইয়ে দেবার জন্যই—মদ্য পান।

মাংস ও মৎস্য—এ হলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় মকার। ভক্ষণ যোগ্য মাংস রূপে দশ রকম ভূচর ও দশ রকম খেচর নির্দ্দেশ ক'রে গেছে যোগিনী তন্ত্র—ছাগ, মেষ, রোজ, হরিণ, বরাহ, সজারু, গণ্ডার, গোধা, বা শুঁইসাপ, শশক—এই দশ রকম ভূচর এবং তিন জাতীয় কুক্কুট, তিত্তিরি, চক্রবাক, সারস, রাজহাঁস, হাঁস, ময়ূর ও চড়ুই এই দশ রকম খেচর। প্রতিটি মাংস হবে জীবিত পশু বধ করে এবং সুন্দর ভাবে রেঁধে খাওয়া।

মৎস্যের মধ্যেও কতকগুলি মাছের বিধি ও রন্ধন প্রণালীর উল্লেখ দেখা যায়। মুখ্য কথা—মৎস্য ও মাংস সুস্বাদু ভাবে রাঁধতে হবে।

মুদ্রা—চতুর্থ মকার হলো মুদ্রা। মুদ্রা হলো প্রকৃতপক্ষে মদের সঙ্গে যে সুস্বাদু ভাজা জিনিস খাওয়া হয় তাই। ছোলা, কড়াই, ময়দা নুন দিয়ে তেল বা ঘিয়ে ভেজে সেই মুদ্রা বা চাট তৈরী করা হবে।

মৎস্য, মাংস বা মুদ্রা পচে গেলে বা বাসি হলেই আর খাবে না।

মৈথুন—তার পরেই হলো মৈথুন। এর জন্য চাই নারী। শক্তি পূজার পর হবে নারী পূজা।

প্রথম হলো দূতী-যাগ একমাত্র যোগীরাই জানেন এ যজ্ঞের প্রথা। এ অনুষ্ঠান বিধেয় শুধু উচ্চ সাধকের জন্যই।

দ্বিতীয় হলো যুবতী স্ত্রীকে অর্থাৎ নিজের বিবাহিতা যুবতী-পত্নীকে দূতীরূপে কল্পনা করে শক্তি পূজার অন্তে তার পূজা করা।

শাস্ত্রেই বলেছে যোনি রূপ কুণ্ডে শিবরূপ বহ্নিতে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক রেতঃরূপ হবি দিয়ে আহুতি করবে। দূতী নিজের পরিণীতা স্ত্রী হওয়া চাই।

আদ্যং তত্র কলৌ দেবী ত্রিসহস্রান্তমিষ্যতে
দ্বিতীয়স্তু ভবেদ্ দেবি স্ব যোষিৎসু সুরেশ্বরী॥

তাৎপর্য্য এই যে—প্রথম যে দূতী-যাগ তা কলির ৩০০০ বৎসর পর্য্যন্তই চলতে পারে—মানুষ তাবৎ পূর্ণতেজা। এই দূতীযাগের অনুষ্ঠান এত ভয়ঙ্কর যে বর্ত্তমান যুগে তা বর্ণনা করতেও অশ্লীলতার আশঙ্কা। তাছাড়া এ যুগের লোক ধারণা করতে পারবে না যে পরস্ত্রী নিয়ে হবে মৈথুন, যোনি দেশে হবে অনুষ্ঠান, অথচ মন থাকবে অচঞ্চল, দেহ থাকবে উর্দ্ধরেতা, এ কি সম্ভব? তাই বার বার শাস্ত্র তা বারণ করেছে। তবুও বহু কপট এ আচরণের ভান করে।

যাঁরা সত্যই উচ্চস্তরে পৌঁছেছেন তাঁদের কথা আলোচনার বস্তু নয়। কিন্তু সাধারণের নিজ স্ত্রীতে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য।

বরং কল্পসূত্রের বিধি আছে—"পরদার ধনেষ্বণাসক্তিঃ"—পরদার ও পরের ধনে আসক্তিহীন হ'বে। তবে পরস্ত্রী প্রসঙ্গ এল বুঝি অনুকল্পে।

অনুকল্প—এখন কার অনুকল্প কি সে বিষয় আলোচনা দরকার।

মদের অনুকল্প—মহাকাল সংহিতা বলেছে 'নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রে গব্যং তথা মধু।' কাঁসার পাত্রে নারিকেল জল ও তামার পাত্রে গব্য বা মধু দিলেই তা মদের অনুকল্প। তাছাড়া আবার মদ, মাংস, মৎস্য এবং চন্দন, অগুরু, কর্পূর, চৌর, কুঙ্কুম; গোরোচনা, জটামাংসী ও শিলারস এই গন্ধাষ্টক মিশিয়ে বেঁটে বড়ি করে তাই হবে মদের অনুকল্প। কুলচূড়ামণি অনুকল্প মেনেই বলে গেলেন, যেখানে সুরা দিয়ে পূজার বিধি সেখানে ব্রাহ্মণ তাম্র পাত্রস্থ মধুকেই সুরা বলে কল্পনা করে পূজা করবে। যুক্তিও পাই হংস মাহেশ্বর তন্ত্রে—মদিরা বা নিজের গায়ের রক্ত দানে পতিত ও আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত হয়। ভৈরবী তন্ত্রে দুধকেই সুরা রূপে ভাবতে বলেছে।

মাংসের অনুকল্প—পিষ্টক বা পিঠে।

মাছের অনুকল্প—কলা বা মূলা। অনেকে সিদ্ধি আর ছোলা বেঁটেও মাছের মতন ভেজে নেয়।

মুদ্রার অনুকল্প— মুদ্রারও নানা অনুকল্প আছে।

মৈথুনের অনুকল্প —পঞ্চম মকারের তৃতীয় স্তরে কিংবা যদি শিষ্য হয়ে কেউ তোমার কাছে আসে অথবা গুরু বা সাধক সে অনুষ্ঠান সঙ্গত বা প্রয়োজন মনে করেন, তবে 'মনসাতাং সমাগন্ধান দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ।' শিষ্যভূতা কোন অন্য যুবতী নারী যদি প্রার্থনা করে, তবে তাকে পূজাস্থানে এনে, যথাবিধি তার পূজা করে, ভোগ্য পাত্র তাকে নিবেদন করে মনে মনে তাতে মৈথুন উপগত হয়ে মানসিক সে মৈথুন দেবতাকে নিবেদন করবে।

অনুকল্পের কথা বলে শাস্ত্র এও বলেছে যতক্ষণ তুমি পূর্ণ অধিকারী হওনি বা দ্রব্যাভাবে সব দ্রব্য খাঁটি পাচ্ছনা তাবৎ সবই অনুকল্প দিয়ে করবে। কিছু অনুকল্প আর কিছু খাঁটি এ চলবে না।

আধ্যাত্মিক মত—আর এক বিচার আধ্যাত্মিকপথে। সে মতে আগামসার ব্যাখ্যা করেছে—যে সাধক যোগসাধন-বলে ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার পদ্মে শিবশক্তি সম্মিলন করাতে পারেন আর সেই মিলনে-জাত চন্দ্রমণ্ডল থেকে নির্গত ক্ষরিত সুধা পান করতে পারেন তিনিই মদ্য সাধক। যিনি মাংসল এই রসনাকে ভক্ষণ করে বা সংযত ক'রে বাক সংযমে সিদ্ধ, তিনিই মাংস সাধক। যিনি সাধনা দ্বারা গঙ্গা-যমুনা-রূপা ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর তুটি মাছ—শ্বাস ও প্রশ্বাসকে রুদ্ধ করে মনকে নিশ্চল করতে পারেন তিনি মৎস্য সাধক। যিনি সহস্রদল কমল-কর্ণিকাগত পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেন, পারদ-সম-চঞ্চল আত্মাকে স্থির করে নানা রকমের বাহ্য বস্তুর সারবস্তু জ্ঞানোদয়ে আত্মানন্দে পুলকিত হন—তিনি মুদ্রাসাধক। আর মৈথুন সাধক সেই মহান—যিনি প্রকৃত মৈথুনানন্দ ভোগে সমর্থ।

মৈথুনক্রিয়ার নাম রমণ। রমণ শব্দ 'রম' ধাতু থেকে। 'রম' ধাতু থেকেই 'রম' 'রাম' 'রামা' ও 'রমণ' চারটি শব্দ। 'র'কার শক্তি— তিনিই কুণ্ডলিনী। দেহের মধ্যে যে কুণ্ড বা মূলাধার চক্র—শক্তির আধার তাতেই এই 'র' শক্তি প্রতিষ্ঠিত। 'ম'কার হচ্ছে পুরুষ— পরমাত্মা পরম শিব। এখন 'ম' বা পুরুষই নিহিত থাকেন সহস্রদল কমল-কর্ণিকাগত ত্রিকোণমধ্যস্থ মহাযোনীতে। র+ম এর সঙ্গে যোগে আকার অর্থাৎ সবাম প্রসারণ দ্বারা সম্পাদিত অজপা মন্ত্র হংস।

দেখা যায় 'চ'কার শক্তি এই অজপা মন্ত্র 'হংস' বা 'আ'কারে ভর ক'রে 'ম'কার রূপ শিবরূপী পুরুষে মিলিত হ'লে, সে মিলনে যে আনন্দ হলো তাই মৈথুনানন্দ—প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের আনন্দ 'রমণ' আর তারই স্বরূপ ঐ রাম—পরম দেবতা। রমণ যাতে করা হলো সে রামা—এহেন মৈথুনই প্রকৃত পঞ্চম মকার মৈথুন।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বের এসব কথা বুঝতে হলে আরও একটু বিশদ করে বুঝতে হবে দেহ মধ্যস্থ তীর্থপীঠ বা সাধন-ক্ষেত্রের কথা।

'ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বানি দেহতঃ।'
"দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।"

দেহ মধ্যেই সব দেবালয়—জীবই তো শিব। সেই দেহমধ্যে আছে আনন্দের উপাদান—যে আনন্দ-কমল সাধনার রসে উন্মোচিত ক'রে, তার মকরন্দ পরম ইষ্টের পদতলে পৌঁছে দিতে হয়।

দেহ মধ্যের সে আনন্দ-কমল বা চক্র ছয়টি। ষট্‌চক্র হচ্ছে— মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক আজ দেহমধ্যে যে শিরা, উপশিরা, গ্রন্থি বা নানা আঙ্গিক তথ্যের আবিষ্কার করেছেন, প্রাচীন মহাসাধকগণ হয়তো তারই একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন এই আধ্যাত্ম সাধনার মাধ্যমে। দেহ মধ্যে সাধনার জন্য যে ষট্‌চক্রের উল্লেখ আছে সাধক ব্যতীত অন্য সাধারণ লোক হয় তো তার একটা ছবি কল্পনা করতে পারবেন আধুনিক এই গ্রন্থী-পরিচয়ে।

দেহাভ্যন্তরেও আছে ৬টী গ্রন্থিস্থল। পৃথ্বীগ্রন্থি, বরুণগ্রন্থি, অগ্নি-গ্রন্থি, বায়ুগ্রন্থি, ব্যোমগ্রন্থি এবং অহংগ্রন্থি। তারও উপরে আছে শীর্ষদেশে মহৎগ্রন্থি হয়তো মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা চক্র পার হয়ে যে সহস্রার চক্র—এ গ্রন্থি তারই নির্দ্দেশ দেয়।

অবশ্য সাধনার ক্রমে দেহতত্ত্বের কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয়তো পৃথক জিনিস আর দৈহিক গ্রন্থি বিচার হয় তো সম্পূর্ণই পৃথক—তবু বেশ একটা সামঞ্জস্য যেন পাওয়া যায় এর আলোচনায়।

দৈহিক গ্রন্থি বিচারে আমরা পাই প্রথম পৃথ্বীগ্রন্থি—যা গুহ্য দেশ ও মূলদেশের মধ্যস্থলের মূলাধারেরই সমান।

সারা দেহে ঐ স্থানই তো মূল আধার বা স্থূল দেহের আশ্রয়স্থল।

তারপর বরুণগ্রন্থি—এতে আছে ছয়টি গ্রন্থির বা Gland এর সমষ্টি—ঠিক যেন ষড়দলে প্রস্ফুটিত স্বাধিষ্ঠান চক্র। মুত্র (Kidney) পিতৃ (Testes) কন্দর্প (Prostate), মদন (Cowper's) এবং প্রজাপতি বা নারী দেহে মাতৃগ্রন্থি (overy), রতি (Bartholin's gland এবং মিথুন গ্রন্থি বা (Skene's gland)—এই ছয়টির সমষ্টিভূত যে বরুণ গ্রন্থি তাই যেন স্বাধিষ্ঠান চক্র—লিঙ্গ মূলে যার অবস্থান।

তাইপরই নাভিমূলে অগ্নি গ্রন্থি—Pancreas এর কাজ ক্ষরণাদি। হয়তো একেই দেহতত্ত্বে বলেছে মণিপুর চক্র।

পরবর্ত্তী গ্রন্থি হলো বায়ুগ্রন্থি—বক্ষদেশের মঙ্গলগ্রন্থি (Thymus) ফুসফুস নিয়ে এর কাজ। সাধন তত্ত্বে এক্ষেত্রে পাই অনাহত চক্র। তারপর সারাদেহের কর্ম্মকেন্দ্র ঐ ব্যোমগ্রন্থি। স্থান তার কণ্ঠে। তালু (Tonsil) লালা (Salivary) প্রভৃতির সন্ধান পাই সেখানে সাধকগণ এ ক্ষেত্রে কণ্ঠ দেশেই ইঙ্গিত করেন বিশুদ্ধ চক্রের।

তারপরই সেই অহংগ্রন্থি—বিচার শক্তি, স্মৃতি শক্তি, শিবশক্তি (Pituitary glands) এখানেই আছে। তাই—চরম সাধনার জন্য কাম্যস্থল এই ভ্রূ-মধ্যস্থ আজ্ঞাচক্র।

ষটচক্রে সাধন ক্রিয়া শেষ করে তবে আমরা পৌঁছুতে পারি সেই চির কামনার স্থল—সহস্রারে। তখনই হয় অমৃতের উদ্ভব।—নাম তার "সামরস্য"। বৈজ্ঞানিক মতেও সেখানে মহৎগ্রন্থি। ললাট দেশের অহং বা Pituitary গ্রন্থির ঊর্দ্ধে সোমগ্রন্থি ও দেবক্ষগ্রন্থি (pineal glands) রুদ্রগ্রন্থি প্রভৃতি। তারই পরে সহস্রার। মহৎ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসধারাই সারা দেহে নেমে এসে সমস্ত গ্রন্থিকে, দেহকে, চিত্তকে প্রাণবান করে।

অন্তর্মুখী সে রসের নাম সোমধারা। দেহের ঊর্দ্ধতম প্রদেশে ব্রহ্মরন্ধ্র বা সহস্রার—যাকি বিজ্ঞান-ঘন চেতনার (Crystallized consciousness) আধার।

এ সব আধ্যাত্মিক জগতের উন্নত আলোচনা নয়, এ সাধারণ স্থূল বুদ্ধির কথা সাধারণকে বোঝাবার জন্য মাত্র।

সাধনজগতের প্রধান সোপান ঐ 'ষটচক্র'।

বৈজ্ঞানিক এ সব মতবাদের বহু ঊর্দ্ধে যে সাধনার পথ তাতেই প্রয়োজন এই ষট্চক্র জাগরণের। তার ক্রমটার একটু আলোচনা করা যাক। এর অধিকারী যেমন মহাসাধক, স্থানও তেমনই হওয়া চাই সিদ্ধপিঠ। তা ছাড়া পঞ্চবটী প্রভৃতি স্থানও প্রশস্ত বলা হয়।

পঞ্চবটী—অশ্বত্থ, নিম, অশোক, বেল ও চাঁপা এই নিয়ে যে স্থান তাই পঞ্চবটী বা সাধনার স্থান। তাতে চাই আসন—যার মধ্যে পঞ্চমুণ্ডী প্রধান।

পঞ্চমুণ্ডী—২টি চণ্ডালের, একটি শৃগালের, একটি বানরের এবং একটি সর্প মুণ্ডের উপর অথবা অন্ততঃ একটী মুণ্ডের উপর বসান হবে কুশাসন। তাতে বিভিন্ন আসনে সাধক সাধনায় বসেন যেমন —পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি।

সাধনার ক্রম—এইভাবে আসনে স্থির চিত্তে বসে করা হয় সাধনা বা প্রাণায়াম-যোগে কুণ্ডলিনীর জাগরণ। প্রথমেই—পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত ক'রে, মন ও বুদ্ধির আধার যে

জীবাত্মা তাকে অনাহত পদ্ম বা চক্র থেকে মূলাধার পদ্মে বা চক্রে আনবে। অনাহত পদ্ম বা চক্রে আছে হৃদয়ে, চিত্ত ও বুদ্ধি যেখানে —তাকে আনবে মূলাধারে, কাম বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে। তখন 'হুং' মন্ত্রে নাসা রন্ধ্রে বায়ু আকর্ষণ করে সেই বায়ু মূলাধারে চালনা করবে কামবহ্নি জ্বালাতে। নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী উঠবে জেগে। তখন হংস মন্ত্র উচ্চারণ করে গুহ্য দেশ সঙ্কুচিত করে কুম্ভক যোগে কুণ্ডলিনীকে উর্দ্ধে ওঠাবে। কুণ্ডলিনী আপন শক্তিতে তখন স্বকীয় ক্রিয়ায় অভ্যন্তরস্থ নানাচক্রের বা পদ্মের দল বিকশিত করতে করতে —স্বাধিষ্ঠান চক্র থেকে হৃদয়ের মণিপুর চক্র হয়ে, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ পদ্মে এসে পদ্মটিকে দলে দলে উর্দ্ধমুখে প্রস্ফুটীত করবে। দেহের সকল সুবৃত্তি হবে স্ফুরিত— কুণ্ডলিনী এসে উপস্থিত হবে আজ্ঞাচক্রে —ভ্রূমধ্যস্থ দ্বিদলে। সাধকের তখন মানস-জাগরণ। আলোর পথ যেন তার উজ্জ্বল। সে পথ যেন অমৃত পথ।

এইবার আরও উর্দ্ধে হবে কুণ্ডলিনীর গতি— সেই সহস্রারে। শিব সেখানে তখনও অচেতন—শক্তির স্পর্শ-কামনায়। কুণ্ডলিনী শক্তি এখানে এসেই তাই হন— দেবী রূপবতী কামোল্লাস বিহারিণী। দেবী শিবের মুখপদ্মে চুম্বন করে ক্ষণমাত্র 'রমণ' করেন। সে রমণে অমৃতের হয় উদ্ভব—এই অমৃতই 'সামরস্য।'

সেখানে সাধক চৈতন্য বা পরম শিবরূপ চন্দ্রের সঙ্গে শক্তির মিলনে বিভোর হয়ে সহস্রার পদ্ম নিঃসৃত সুধা পান করবেন। যে সাধক বাহ্য পূজায় সুরাকে সেই রকম সুধা বলেই পান করতে পারবেন তিনি মদ নয়, অমৃত পান করেন। যে তা পারে না, যার সেই সহস্রারে পৌঁছবার ক্ষমতা নেই—সে বাইরের মদ খেলে পতিত হবেই। যে সাধক জ্ঞানরূপ খড়্গে, পাপ পুণ্যরূপ পশুকে হত্যা করে সব পরমাত্মায় লীন করে দিতে পারে তিনি প্রকৃত মাংসাশী। যিনি মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়রূপ মৎস্যগুলিকে সংযত রাখতে পেরেছেন তিনিই প্রকৃত মৎস্যাশী। নইলে মাছ খেয়ে পাপই বাড়বে।

প্রবুদ্ধ যাঁদের শক্তি তাঁরাই প্রকৃত শাক্ত। তাঁরাই প্রকৃত মুদ্রার স্বরূপ বুঝেছেন। শক্তি সর্ব্বমুদ্রার মূল। যে সাধক পরমাশক্তির ও পরম শিবের মৈথুন জনিত আনন্দের রসাস্বাদ জেনেছেন তিনিই প্রকৃত সাধক। গুরুর নিকট এ দীক্ষা পেলেই সে সার্থক কৌল।

এখন এই গুরু শিষ্যের মধ্যে 'অধিকার' 'কর্ত্তব্য' প্রভৃতি বিষয়গুলো সংক্ষেপে পাই আমরা তন্ত্রের নানা গ্রন্থে ও নানা উক্তিতে। তন্মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ আমরা তন্ত্র-রাজতন্ত্রের নিত্যোৎসবের কয়েকটি কথা বলছি। যাতে বিষয়গুলি একটু স্পষ্ট করা হবে।

কৌলগুরু – হবেন সুন্দর, সুমুখ, স্বচ্ছ, সুলভ, বহুতন্ত্রবিৎ. অসংশয়ী সংশয়-বিনাশ কারী, নিরপেক্ষ, হিতোপদেশ-দানকারী।

শিষ্য—তিনিও হবেন সুন্দর, স্বচ্ছ, সুলভ, শ্রদ্ধাবান, দৃঢ়-চিত্ত, অলুব্ধ বা আসক্তিহীন (পঞ্চ মকারে লোভ থাকবে না) স্থিরগাত্র, প্রেক্ষ্যকারী (সব দিকে যার দৃষ্টি) জিতেন্দ্রিয়, আস্তিক ও দৃঢ়ভক্ত।

সিদ্ধান্ত—শিষ্যের জানা প্রয়োজন ঐ ত্রৈপুর সিদ্ধান্তের কথা। জানতে হবে পরম শিবের শরীর এ বিশ্ব যে বিশ্ব তিনি নিজে ছত্রিশটি প্রমেয় পদার্থে সৃষ্টি করেছেন।

তারপর পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, গুণত্রয় প্রকৃতি, চিত্তের পঞ্চধর্ম্ম—নিত্যতা, স্বতন্ত্রতা, নিত্যতৃপ্ততা, সর্ব্বকর্ত্তৃতা, ও সর্ব্বজ্ঞতা সঙ্কুচিত হয়ে নিয়তি, কাল, রাগ, কলা, অবিদ্যা এই পাঁচটী ভাবে আখ্যাত হবে—থাকবে মায়া ও শুভ বিদ্যা, শক্তি এবং শিব।

এই শিবই—নিয়তি, কাল, রাগ, কলা ও অবিদ্যায় নিজেকে যখন ঢেকে ফেলেন তখনই তিনি জীব। অতএব সিদ্ধান্ত জীবই—শিব।

মন্ত্রোপসনা—ন্যাস, প্রাণায়াম কত অঙ্গই আছে সাধনায়, কিন্তু শ্রেষ্ঠ এই মন্ত্রোপাসনা। বর্ণাত্মক নিত্য শব্দই এই মন্ত্র। অচিন্ত্য এক শক্তি এতে নিহিত—তাই লোকে বলে মন্ত্রশক্তি। গুরু পরম্পরায় তা লাভ হয়। এই পরম্পরা থেকেই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। শাস্ত্রের এ প্রমাণে চাই শুধু বিশ্বাস। গুরুর উপদেশ অনুসারে মন ও আধ্যাত্মিক

বায়ু নিরুদ্ধ করে গুরু, মন্ত্র, দেবতা ও আত্মা সবই এক—এই জ্ঞান লাভ করতে হয়। সেই স্বরূপ আনন্দের উপলব্ধি করতে, বাহ্যিক সব বিস্মৃত হতে, গোপনে পঞ্চমকারের অর্চ্চনাই প্রশস্ত, প্রকাশ্যে তা করলে নরক। এই ভাব-সাধনায় অলৌকিক নিগ্রহ বা অনুগ্রহের সামর্থ্য আসে।

উপাসকধর্ম্ম—অন্য কোন ধর্ম্মে নিন্দা না করা। সর্বদা আমি 'শিব'—এই ভাবনা। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য, অবৈধ হিংসা, চৌর্য্য, বিরোধ, দ্বেষ বা নারী বিদ্বেষ না করা। গুরু ও দেবতায় বিশ্বাস, উপভোগ-বুদ্ধি বর্জ্জন, নিষ্কাম ধর্ম্ম আচরণ, নিত্য কর্ম্মসাধন, পঞ্চমকারের সাধন না হলেও নিত্য কর্ম্মে রত ও অনুষ্ঠানে কাউকে ভয় না করা।

সর্ব্বসারভূত ধর্ম্ম—এটি পূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিচিতি। ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা যা গ্রহণ করা যায় তাই হবি। ইন্দ্রিয় সেখানে স্রুক—যাতে হবি নেওয়া হয়, পরমশিব বহ্নি, জীবে শিবের যে সঙ্কুচিত আবরণ বা শক্তি—তাই শিখা, আত্মাই হোতা। এই ভাবে যে হোম তাই সার ধর্ম্ম বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার।

দীক্ষা—এ হেন সাধনার জন্য যে মন্ত্র বা পথ তাই দীক্ষা।

দীক্ষা তিনরকম—শাম্ভবী, শাক্তী ও মান্ত্রী।

এই দীক্ষার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ গুরুর অধিকার এবং অত্যন্ত গোপনীয়। তাই এখানে তার কিছুই বলা যায় না, তবে শিষ্যের মনের ময়লা দূর করে শাম্ভবী দীক্ষায় পাপ রূপ পাশ ছিঁড়ে ফেলে, শাক্তী দীক্ষার শক্তিতে জমি তৈরী করে, বীজ মন্ত্র দানই হল মান্ত্রী দীক্ষা। আজ আমাদের দেশে সাধারণ ভাবে এই মান্ত্রী দীক্ষা বা বাগ্দীক্ষা দানই হয় বেশী।

পরচিদ্ রূপ—শেষ পর্য্যন্ত গুরু-শিষ্যকে সাধন মার্গের মতন তৈরী করে—তুমি ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন, 'জীবই 'শিব' ইত্যাদি আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়ে পরচিৎ স্বরূপ করে নেবেন। শিষ্য তখন—আমি আর অপূর্ণ

জীব নই—আমি পরিপূর্ণ পরমাত্মা বা 'শিব' এই ভাবনা করে কৃতকৃতার্থ হয়ে গুরু-শরণে সাধন পথে এগিয়ে যাবে।

অনেকের ধারণা বাংলা দেশে তন্ত্রমত বেশী প্রচলিত। হয়ত এটা ঠিক নয় কারণ আজও দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয় কৌলমার্গ সমধিক খ্যাত।

মিথিলাতেও তান্ত্রিক আচরণ প্রচলিত ছিল, তবে বাংলার বৈদিক আচার বহুদিন থেকেই নির্জ্জীব, তাই বামাচার মতে তন্ত্র সাধনাতেই তাঁরা এগিয়েছে। ফলে আচারের নামে বহু অনাচারও সংঘটিত হয়েছে।

অবশ্য যে দেশে পূর্ণানন্দ, সর্ব্বানন্দ, বামাক্ষেপা,রামকৃষ্ণ প্রভৃতির জন্ম, সেখানে কোন কৌল কি অনাচার করলো তাতে কিছু যায় আসে না।

তবে তন্ত্র শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা,গ্রন্থ-গবেষণা, বহু নিন্দা-খ্যাতি, বাদ-বিসম্বাদ চলে এলেও তান্ত্রিক সাধকগণ বলেন পিচ্ছিল পথ ও মতকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে আকণ্ঠ ভোগের পর, নিবৃত্তি বা অপূর্ব্ব সংযমে জীবকে শিব জ্ঞান করে, আত্মাকে প্রবুদ্ধ করে পরম ব্রহ্মে লীন করে দেওয়ার নামই প্রকৃত তান্ত্রিক সাধনা। ভোগের খানিকটা বাকি রেখে, তার জের টেনে, জন্ম ও কর্ম্মের বাঁধন বাড়িয়ে দিয়ে মুক্তি-পথে বিলম্ব ঘটাতে তাঁরা চান না।

অনেকে আবার বৈদিক বা তান্ত্রিক সব মতের উর্দ্ধে দৃষ্টি রেখে দেহস্থ শিবেই শক্তিকে লীন করে দিতে চান।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদের চেয়েও সূক্ষ্মতম বিচারে দেহের ৩॥০ লক্ষ নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নাকে প্রধান করে, দেহস্থ সুমেরু যে মেরুদণ্ড, তাকে সমুন্নত রেখে দেহতীর্থেই সাধনার ধনকে খুঁজে নেন। তাদের কাছে ইড়া—গঙ্গা, পিঙ্গলাই যমুনা এবং সুষুম্না হচ্ছে সরস্বতী অন্তর্লীনা। দেহস্থ ত্রিবেণীতেই তাঁরা স্নান করে ধন্য—বাইরের ত্রিবেণী, বাইরের অনুষ্ঠান বা বাইরের পঞ্চমকার তাদের প্রলুব্ধ করে না। ধর্ম্মাচরণে কোন মত বা সম্প্রদায়-গত পথই তাদের চঞ্চল করে না, তাদের মনে নিরন্তর ধ্বনিত হয়—

"নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব"।

চণ্ডী ও গীতা

এরপরই আমরা পুরাণ বা অন্যান্য প্রসঙ্গ তুলবার আগে প্রসিদ্ধ দুখানি উপনিষদ-কল্প পৌরাণিক গ্রন্থেরই আলোচনা করব—গীতা ও চণ্ডী।

যেমন মহান উপনিষদ সাগর মন্থন ক'রে উঠেছে গীতা, তেমনই তন্ত্র-মন্থনে উদ্ভূতা চণ্ডী। গীতা যেমন মহাভারতের অংশ, চণ্ডী তেমনই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশ। তন্ত্রের মতে—সমগ্র তন্ত্রের সার—'চণ্ডী'।

চণ্ডী

শ্রীশ্রীচণ্ডী বেদমূলা। চণ্ডীর চরিত্র-ত্রয় ত্রিবেদের স্বরূপ। গায়ত্রী বেদমাতা এবং গায়ত্রী ও চণ্ডী উভয়ই প্রণবরূপা। বেদমাতাই চণ্ডী।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত তেরটি অধ্যায়ের নামই 'চণ্ডী'। 'চণ্ড' শব্দটির অর্থ হচ্ছে—অসাধারণ দেশ কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছন্ন পরব্রহ্ম,—স্ত্রীলিঙ্গে চণ্ডী। ব্রহ্ম-শক্তিই চণ্ডী। জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই শক্তি ত্রয়ে আবির্ভূতা ত্রিগুণের সমষ্টিভূতা ব্রহ্মাভিন্না তুরীয়া দেবীই হচ্ছেন "চণ্ডী"। চণ্ডীর তাই নানা রূপ বা নাম দেখি, জ্ঞানশক্তি অর্থে মহাসরস্বতী, ইচ্ছা-শক্তি অর্থে মহাকালী ও ক্রিয়া-শক্তি অর্থে মহালক্ষ্মী রূপে চণ্ডীর প্রকাশ।

চিদ্রূপা মহাসরস্বতী—সাত্ত্বিকী ও সামবেদরূপা, সদ্রূপা মহালক্ষ্মী—রাজসী ও যজুর্ব্বেদরূপা এবং আনন্দরূপা মহাকালী—তামসী ও ঋগ্বেদরূপা। চণ্ডীর বিভিন্নমন্ত্রের—জগন্মূর্ত্তি, জগন্ময়ী, মহীস্বরূপা বিশ্বরূপা প্রভৃতি সম্বোধন বিশ্বদেবী ও বিরাটরূপা বলেই দেবীকে প্রতিষ্ঠিতা করে এবং দেবীকে বিভিন্ন নামে অভিহিত দেখা যায়।

তন্ত্রের মতন চণ্ডীরও প্রতিপাদ্য তত্ত্ব হচ্ছে মহামায়ার স্বরূপ।

চণ্ডীর অন্য দুটি নাম—দেবীমাহাত্ম্য এবং দুর্গা-সপ্তশতী।

দুর্গোৎসবে বা দুর্গাহোমে সাতশ' আহুতি দেওয়া হয় চণ্ডীর সাতশ' মন্ত্রে। তাই এর নাম সপ্তশতী। আর দেবী-মাহাত্ম্য হচ্ছে মার্কণ্ডেয় পুরাণের নাম।

বেদ, তন্ত্র বা দেবী ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, কালিকা পুরাণ, দেবী পুরাণ প্রভৃতিতে চণ্ডীর নানা রূপারোপের কথা থাকলেও মার্কণ্ডেয় পুরাণেই চণ্ডীর প্রকৃত রূপ উদ্ভাসিত।

পরেও আবার নানা গ্রন্থে, সাহিত্যে, রুদ্র যামলে, চণ্ডীশতকে নানা ভাষ্য ও টীকায় চণ্ডী ভারতীয় কৃষ্টির এক অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দীপ্ত।

দণ্ডী, ভবভূতি, বা বাণভট্টই শুধু নয় - তদানীন্তন প্রাচীন প্রায় প্রতিসাহিত্য, ধর্ম্ম বা পরিবেশেই চণ্ডীর কথা দেখা যায়।

তবে চণ্ডীর প্রাচীনত্ব নিয়ে মতান্তরও আছে নানা।

উড্রফ, পার্জিটার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বা আমাদের দেশের বিভিন্ন তান্ত্রিক সাধক ও গবেষকগণ এনিয়ে নানা চর্চ্চা করেছেন।

এতদ্দেশীয় যে সম্প্রদায় বা ভক্ত সাধক চণ্ডীকে বেদমূলা, তন্ত্রকে পঞ্চমবেদ ও মহামায়ার দেবীরূপে আবির্ভাবকেই চণ্ডী বলে মেনেছেন— তাঁরা পুরাণোক্ত চণ্ডীকে সময় বা তারিখের সীমায় আবদ্ধ করতে নারাজ— কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের ধারকগণ তা শোনেন কই? আর শোনেন না বলেই কেউ বলেন চণ্ডী তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত, কেউ বলেন প্রথম শতাব্দীতে।

চণ্ডীতে নন্দগোপ-গৃহে জাতা' বলে দেবী আবির্ভাবের যে কথা আছে, তাতে মনে হয় চণ্ডী ভাগবতের পূর্ব্বে। আবার 'শঙ্কর দিগ্বিজয়' গ্রন্থে চণ্ডীর উল্লেখ দেখে মনে হয় চণ্ডী তৃতীয় শতাব্দীতেই রচিত।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে--যে শকগণের উল্লেখ আছে তারা তখন মধ্য ভারতের অধিবাসী। মথুরা অঞ্চলে গুপ্ত রাজবংশগণের উদ্ভবের আগেই ছিল সে সব শক। তবেই সে সময়টা ৪র্থ শতাব্দীর আগে—তৃতীয় শতাব্দীতে। চণ্ডীর ৮ম অধ্যায়ে মৌর্য্য ও ১ম অধ্যায়ে 'কোলাবিধ্বংসী' বিশেষণ থাকায় সময়টা হয়ে যায় খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব কাল।

অতএব খ্রীষ্ট পূর্ব থেকে সুরু করে তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত চণ্ডীর রচনা কাল ধরলেও তা প্রায় ২০০০ বছরের কথা, আর রচনার মূল যে ঘটনা সেতো মহাকালের অতি-প্রাচীন কোঠায় গিয়ে পড়বেই।

কোনদেশে উৎপত্তি চণ্ডীর এ নিয়েও নানা মতবাদ। অনেকে দেশটা উজ্জয়িনী, কলিঙ্গ আদি বল্লেও, বহু জনমতে গৌড় বা বঙ্গদেশই চণ্ডীর উৎপত্তি স্থল। বাংলার অধিকাংশ স্থান ছিল জঙ্গলে ভরা—কিরাত, শবরদের আশ্রয় স্থল। কিরাত দেশেই চণ্ডীর আবির্ভাব—তাই বংলার মাটিতেই দেবীর চরণস্পর্শ হয়েছিল—না হয় তাই মেনে নিলাম।

তাছাড়া বর্ত্তমান বিহার প্রদেশ ছিল বাংলারই অঞ্চল—বৌদ্ধ বিহারে পরিবৃত। বৌদ্ধ ধর্ম্মে তন্ত্রের যে প্রভাব - তা চণ্ডী বা তন্ত্রের লীলাভূমি এই বাংলা থেকেই উদ্ভুত—সে কথাও মনে জাগে বইকি।

থাক, এ সব ঐতিহাসিক তত্ত্বের কথা। আমরা জানি—আমাদের জীবন-দৌর্ব্বল্য বা ক্লৈব্যকে নাশ করতে একদিন মহাবীর গাণ্ডীব-ধারী অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতিভারতে
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানংসৃজাম্যহং।

আর চণ্ডীতেও অসুর-বলক্রান্তা ভারতকে দেবী শুনিয়েছিলেন—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম।

এই বাণী একদিন ভারতের দিকে দিকে, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, এমন ভাবেই বিঘোষিত হয়েছিল যে প্রতিদেশ ভারতীয় বৌদ্ধ, জৈন প্রতি ধর্ম—প্রতি প্রাচীন সাক্ষ্যে, গ্রন্থে, স্তূপে, বা শীলালেখে চণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায়। নালন্দা বিক্রমশীলায় তন্ত্র সহ চণ্ডীও পঠিত হোত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর হাতে লেখা একখানি প্রাচীন চণ্ডী আজও নেপালে আছে। বৌদ্ধ জাপানে 'চনষ্টী' নামক যে দেবীমূর্ত্তি আজও পূজিতা হন, তা হয়তো 'চণ্ডী'র অপভ্রংশ। বৌদ্ধ ধর্ম্মে মারীচিদেবীও চণ্ডীরূপা দশভূজার মতনই।

জৈনধর্ম্মেও চণ্ডীতে প্রাপ্ত সরস্বতী, বাগীশ্বরী ব্রহ্মাণী মূর্ত্তি প্রভৃতির প্রভাব দেখা যায়। শিখধর্ম্মের দশম বাদশাহ কি গ্রন্থে—শ্রীচণ্ডীর কথা আছে।

তারপর মহাভারত, রামায়ণে তো বটেই—বিভিন্ন পুরাণে, মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে, কুলার্ণব প্রভৃতি তন্ত্রে, নাটকে, সাহিত্যে, কথা ও কাহিনীতে 'চণ্ডীর' প্রভাব পূর্ণ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর 'মূল কাহিনী অত্যাচারী অসুর শুম্ভ, নিশুম্ভ এবং তৎপ্রসঙ্গে চণ্ডমুণ্ড, ধূম্রলোচন রক্তবীজ বা মহিষাসুর বধ।

আমাদের কাছে দুর্গা প্রতিমায় যে মূর্ত্তি বিরাজিতা - তাতে মহিষাসুর-বধ সম্যক পরিস্ফুট। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় ঐ অসুর—পশু হৃদয়স্থ পাপবৃত্তির প্রতীক বা যাই হোক—জগদম্বা দুর্গা ভীষণা করালিনী চণ্ডীরূপে আমাদের পরম শত্রুকে নিধন ক'রে—আমাদের রক্ষা কচ্ছেন—আমরা সে রক্ষাকর্ত্রীর করুণা পেয়েছি ভাবতেই আমরা আনন্দ পাই।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় বলেন এই চণ্ডী শিষ্য ক্রৌষ্টুকি ভাগুরিকে।

কি করে অষ্টম মনু সাবর্ণির জন্ম হল—তাই নিয়েই এ আখ্যান।

অষ্টম মনু যিনি—তিনিই পূর্ব্বজন্মে ছিলেন দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষের পুত্র, চৈত্রের বংশধর—রাজা সুরথ।

একদিন রাজা সুরথ কোলাবিধ্বংসী যবনের হাতে পরাজিত হ'য়ে বনে পালিয়ে যান। ভাগ্যলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যলক্ষ্মী, রাজের সব মন্ত্রী পরিষদ, সেনাপতি ও সেনানী তাঁকে ত্যাগ করেন। শুধু মায়া ত্যাগ করেনি তার মনকে। একা বনে গিয়েও রাজা সুরথ এই শুধু বিগত রাজ্যের কথাই ভাবেন আর বনে বনে ঘোরেন।

একদা তিনি দেখলেন কাননে দিন কাটাচ্ছেন বৈশ্য সমাধি যাঁকে তাঁর স্ত্রীপুত্রাদি অর্থলোভে নির্য্যাতিত ও বিতাড়িত করেছে।

দুজনে দুজনকে দেখলেন, বল্লেন দুজনে দুজনার মনের কথা—দুজনেই ভাবলেন কেন—তাদের এই মহামায়া—যাঁরা তাদের ছাড়লো তাদের নিজেরা এখনও মনে করেছেন কেন?

দুজনেই এই মহাপ্রশ্ন নিয়ে এলেন—ঋষি মেধার কাছে—তাঁর কানন কুটিরে। ঋষি মেধা তখন সেই মহামায়া—তার লীলা এবং লীলাক্রমে দেবীরূপে অবতীর্ণা হয়ে অসুর-নিধনের কাহিনী বল্লেন।

প্রথমেই বল্লেন কি করে মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয় মায়াময় বিষ্ণু, ব্রহ্মাকেই বিব্রত করেছিল। ব্রহ্মা গত্যন্তর না দেখে মহামায়ার করেন স্তুতি। মহামায়ার মায়াপসারণে বিষ্ণু মায়া-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে—মধু কৈটভের সঙ্গে করেন যুদ্ধ। দীর্ঘ দিনের সে যুদ্ধে তুষ্ট হয়ে বীর অসুরদ্বয় দিতে চান বিষ্ণুকে বর। বিষ্ণু বর চান তাদেরই মৃত্যু।

জলময় তখন ভুবন। তাই চতুর দৈত্যদ্বয় বলে—শুধু জলে যেন তাদের মরতে না হয়। চতুর-চুড়ামণি বিষ্ণু নিজ জানুদেশেই তাদের মাথা রেখে—বরদাতা অসুরদ্বয়কে সুদর্শনে কেটে ফেলেন।

তারপর ঋষি মেধা বল্লেন কি করে নিজে মহামায়া অন্যান্য অত্যাচারী অসুর-নিধনে নানারূপে অবতীর্ণ হন।

তখন চলেছে মহিষাসুরের অত্যাচার। দেবতারা নিল মহামায়া জগদম্বার শরণ। দেবী অবতীর্ণ হলেন রণরঙ্গিনী বেশে অসুর-নিধনে সেই রূপারোপের অপরূপ বর্ণনা সত্যই অপূর্ব্ব। ইন্দ্রাদি দেবতার তেজ সমষ্টি নিয়ে দেবী আবির্ভূতা হলেন মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে।

শম্ভুর তেজে দেবীর হল মুখ, চন্দ্রতেজে। হল স্তনযুগল, ইন্দ্র-তেজে দেহের মধ্য-ভাগ বরুণ-তেজে জঙ্ঘা ও উরু এবং পৃথিবীর তেজে নিতম্ব।

ব্রহ্মার তেজে হল পদযুগল, সূর্য্যের তেজে পদাঙ্গুলি, অষ্টবসুর তেজে করাঙ্গুলি এবং কুবেরের তেজে নাসিকা। দক্ষাদি প্রজাপতির তেজে দন্ত, বহ্নি-তেজে ত্রিনয়ন। সন্ধ্যা দেবীর তেজে ভ্রু, বায়ুর তেজে কর্ণ এবং বিশ্বকর্ম্মাদির তেজে দেবী দুর্গার হ'ল আবির্ভাব।

ত্রিশূলী দিলেন শূল-শক্তি, বিষ্ণু দিলেন সুদর্শন-চক্রের শক্তি, বরুণ শঙ্খ, অগ্নি শক্তি, পবন ধনু ও তূণ, ইন্দ্র বজ্র, এমনকি ঐরাবতও দিলেন নিজ কণ্ঠের কণ্ঠধ্বনি, যম দিলেন কালদণ্ড, বরুণ দিলেন পাশ, ব্রহ্মা রুদ্রাক্ষমালা ও কমণ্ডলু। দিবাকর সমস্ত তেজ দিলেন দেবীর রোমকূপে, নিমেষাদি কাল-দেবসমূহ দিলেন খড়্গ ও ঢাল। ক্ষীরোদ সমুদ্র থেকে আহরিত হ'লো মুক্তাহার, নব বস্ত্র, দিব্য চুড়ামণি অলঙ্কার, কুণ্ডল, বলয়, অঙ্গদ, নূপুর, হার ও অঙ্গুরী।

বিশ্বকর্ম্মা দিলেন কুঠার ও অভেদ্য কবচ, সমুদ্র দিল অম্লান পদ্মমালা বক্ষে ও কণ্ঠে আর হাতে দিলেন এক একটি নীল-কমল। হিমালয় দিলেন বাহন সিংহ ও বিবিধ রত্ন, কুবের দিলেন সুরাপূর্ণ পানপাত্র। বাসুকী দিলেন নাগহার—আর দেবী সেই তেজে উগ্রতরা হয়ে হুঙ্কার করে উঠলেন। কী অপূর্ব্ব বর্ণনা ও ভাব। তারপর চল্ল যুদ্ধ।

যুদ্ধে অসুর সেনাপতি চিক্ষুর, চামর এবং অন্যান্য বীর—উদগ্র, মহাহনু, অগ্নি লোমা, বাস্কল, পরিবারিত ও বিড়ালাক্ষ প্রভৃতি অসুরদের বিনাশ করে—মহামায়া প্রভাবে মহিষাসুরকে করলেন বধ। দুর্জ্জন বিনাশ হল—দেবী মায়া-মুক্ত হলেন। সে যুদ্ধ বর্ণনা অদ্ভুত ও রোমহর্ষক। মহিষাসুর বধের পর ইন্দ্রাদি দেবতারা করলেন দেবীর স্তুতি—সংসারে শান্তি এল।

আর একবার শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক দুই ভাই—অজেয় অসুর তারা—দেবতাদের রাজ্য নিল কেড়ে। দেবতারা সবাই মিলে শক্তির করলেন আরাধনা। তাঁদের সে সাধনায়, দেবী আবার রণসাজে সাজলেন।

প্রথমেই এল শুম্ভ-নিশুম্ভের মনে সেই 'অহং'—মায়া। তারা পাঠালেন দূত সুগ্রীবকে দেবীর কাছে, বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে। চণ্ড মুণ্ডের মুখে দেবীর রূপ-গুণের কথা শুনে তারা পাগল। মহামায়াও চান তাদের মায়ার ঘোরে রাখতে—তাই বল্লেন দূতকে যুদ্ধে যারা আমাকে পরাজিত করবে—আমি তাদের হবঁ।

যুদ্ধে প্রথম এল নানা সেনাপতি ও বীরের দল। ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ সবাই হলেন নিহত। রক্তবীজের যত রক্ত পড়ে—তত সৈন্য জন্মায়—তাই দেবী ছিন্নমস্তা রূপে সব রক্তই পান করলেন। চাণ্ডমু রূপে শুধু রক্ত নয়, রক্তজাত অসুরকেও ফেল্লেন খেয়ে। তারপর এল নিশুম্ভ—সেও হত হ'ল এবং শেষ পর্যন্ত শুম্ভও হ'ল নিহত। দেবতারা আবার স্তুতি-পাঠে মাকে করলেন অভিনন্দন।

মহর্ষি মেধস মুনির ঐ সব কাহিনী শুনে—রাজা সুরথ ও বৈশ্য সন্ন্যাসী দুজনেই মায়ার বিকার বুঝতে পেরে মহামায়ার শরণ নিলেন—

সাধনা করলেন। দেবী তুষ্ট হয়ে বর দিলেন—বৈশ্য সমাধির মুক্তি আর রাজা সুরথকে দিলেন জন্মান্তরে সূর্য্যের সন্তানরূপে সবর্ণার গর্ভে সাবার্ণ নামে অষ্টম মনু রূপে আবার রাজ্য লাভের বর। এই ভাবেই অষ্টম মনু সাবর্ণির জন্ম হয়।

চণ্ডী প্রসঙ্গে অন্যান্য কথা যা বলা প্রয়োজন—শক্তি-তত্ত্বের সে সব কথার সারাংশ তন্ত্র প্রসঙ্গেই আমরা পেয়েছি।

এখানে মাত্র বলছি সপ্তশতী বা সাতশ মন্ত্রের এই চণ্ডীর ৫৭৮টি শ্লোকে. মাত্র ১৩টি অধ্যায়েই শক্তির ত্রিবিধ চরিত্রের মাধ্যমে মহামায়ার বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন তত্ত্বের প্রকাশ উদ্ভাসিত।

এই ১৩টি অধ্যায়ের প্রতিটি অধ্যায়ের ঋষি, দেবতা. ছন্দ, শক্তি, বীজ, তত্ত্ব ও স্বরূপ পৃথক। কার প্রীতির জন্য কোন অধ্যায়ের প্রয়োগ তারও বর্ণনা পৃথক। তদ্ব্যতীত চণ্ডীতে শক্তির মূল তিনটি চরিত্রই যেন উদ্ভাসিত—প্রথম, মধ্যম ও উত্তম তিনটি রূপে।

প্রথম চরিত্র দীপ্ত—প্রথম অধ্যায়ে মধু-কৈটভ বধ প্রসঙ্গে।

মধ্যম চরিত্র দীপ্ত—২য় হইতে ৪র্থ অধ্যায়ে—মহিষাসুর বধ প্রসঙ্গে।

উত্তর চরিত্র দীপ্ত—পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ প্রসঙ্গে। প্রতি অধ্যায়ের ধ্যান ও ধারণা পৃথক।

তদ্ব্যতীত চণ্ডী পাঠের পূর্ব্বে যথাবিহিত পূজা—অর্গলা স্তোত্র, কীলক স্তব, দেবী কবচ, রাত্রিসূক্ত পাঠ বিধি আর চণ্ডীপাঠের পর পাঠ্য হচ্ছে—পাঠের অপরাধ-ক্ষমার্পণ, দেবী সূক্ত ও রহস্যত্রয়।

চণ্ডীপাঠের শেষে হচ্ছে ফলশ্রুতি। এই ফলশ্রুতি প্রতি গৃহস্থকে কল্যাণকল্পে গৃহে বা পূজা-উৎসবে চণ্ডী পাঠে প্রবুদ্ধ করে। তারপর আবার বিশেষ একটিমাত্র শ্লোক প্রতি শ্লোকের আদিতে ও অন্তে পাঠ করে মঙ্গল কামনায়—পুটিত চণ্ডীপাঠও প্রশস্ত। আবার বিল্ববৃক্ষ মূলে এক মাস ধরে জপ ক'রে চণ্ডী পাঠে পুরশ্চরণ করে অনেকে অতুল ঐশ্বর্য্য ও সুখ কামনায়। মন্ত্রশক্তির প্রতি বিশ্বাস মানুষকে আত্ম-বিশ্বাসে বলীয়ান করেই।

গীতা

গীতা পঞ্চম বেদ। গীতাতত্ত্ব ও বেদবাণী অভেদ। বেদের চরম ভাষ্য গীতা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে—"উপনিষদ হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কুসুমরাজী চয়ন করিয়া গীতারূপ এই সুদৃশ্য মাল্য গ্রথিত হইয়াছে।" পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও বলেছেন—'গীতার মত সুললিত সত্য এবং সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ পদ্যগ্রন্থ সম্ভবতঃ পৃথিবীর আর কোন ভাষায় নাই। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন— আমার গর্ভধারিণীর স্বর্গগমনের পর গীতা তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছে।' শাজাহান পুত্র দারা শিকো বলেছেন—'গীতা স্বর্গীয় আনন্দের অফুরন্ত উৎস'। ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস বলেছিলেন--'গীতা পাঠে শুধু ইংরাজগণ কেন সমগ্র বিশ্ববাসী উপকৃত হইবেন।' এই সব উক্তিগুলির মাধ্যমেই গীতার উৎকর্ষতার বিশেষত্ব বোঝা যায়।

মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্রেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনকে ক্লৈব ত্যাগের জন্য এই উপদেশ দেন—এ সত্য মেনে নিলে প্রমাণিত হয় খৃঃ পূঃ ১২ শত শতাব্দীতে গীতা উদ্‌গীত হয়

বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ—গীতা পরবর্ত্তী ভাগে মহাভারতের আদিম রচনা কালেই লিখিত বলে মন্তব্য করেও স্বীকার করেছেন যে খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে গীতা রচিত। অনেকে বৌদ্ধ-যুগের পর গীতা রচিত বলেন বটে কিন্তু তা প্রমাণে টেঁকে না। কারণ যে 'নির্ব্বাণ' শব্দ গীতায় আছে তা শূন্যার্থে নয়—'ব্রহ্ম' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তা ছাড়া মহাভারতে তো বুদ্ধ বা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নামও নেই। অতএব গীতা বুদ্ধদেবেরও আগে। গীতা ও পতঞ্জলির কালসূত্র প্রায় একই রকম। পতঞ্জলি পাণিনির ভাষ্যকার। পাণিনির সময় খৃঃ পূঃ ৮০০। অতএব তার ১০০ বা ১৫০ বৎসর পর পতঞ্জলি। গীতা যদি তার অপেক্ষা প্রাচীন বা সমসাময়িক হয় তথাপি আজ প্রায় ৩০০০ বৎসরের

প্রাচীন এই গ্রন্থ। যাই হোক, অধিকাংশের মত এই যে—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যতদিনের, গীতা ততদিনের। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কারও মতে খৃঃ পূঃ ১৯৩১, আবার কারও মতে খৃঃ পূঃ ১১৬২, আবার কারও মতে খৃঃ পূঃ ১৫৬৬। অতএব মোটমাট প্রায় ৪৫০০ বৎসর আগে। যদি ৫০০০ হয়, তথাপি ভারতের এ গ্রন্থ অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ সন্দেহ নেই। তাছাড়া গ্রন্থ-রচনা যতদিনেরই হোক, ঘটনা তো প্রাচীনতম বটেই।

গীতার ভাষ্য অনেকেই করেছেন—তবে শঙ্কর ভাষ্যই প্রাচীনতম। শঙ্কর ছাড়াও রামানুজ, মাধব, বল্লভ, নিম্বার্ক, জ্ঞানদাস, নীলকণ্ঠ, মধুসূদন সরস্বতী, শঙ্করানন্দ, শ্রীধরস্বামী, বিজ্ঞানভিক্ষু, কেশব ভট্ট, ব্রহ্মানন্দগিরি, রামকৃষ্ণ, মুকুন্দ দাস, রামনারায়ণ বলদেব বিদ্যাভূষণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনেকেই ভাষ্য লিখেছেন। আর তার মধ্যে এক এক জন এক এক ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কারও মতে গীতা ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম এই পঞ্চ বিষয়ের কথাই বলেছে। শঙ্কর যখন গীতার অদ্বৈত বেদান্তনুযায়ী ভাষ্য করলেন রামানুজাচার্য্য তখন বিশিষ্টদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের অর্থগত ভেদের মাধ্যমে করেন ভাষ্য। নিম্বার্ক করলেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর মতে ভাষ্য। আবার অভিনব গুপ্ত করলেন তার ভাষ্য—বল্লেন "ধর্ম্মক্ষেত্র শব্দের অর্থ নবদ্বার বিশিষ্ট দেহ। মামকা শব্দের অর্থ প্রজ্ঞালব্ধ চিত্ত, ধৃতরাষ্ট্র কৌরব বা পাণ্ডব সব জড় দেহবান ব্যক্তি নন—এমনি সব নানা কথা। সোজা কথায় রামকৃষ্ণদেব বল্লেন—কয়েকবার গীতা গীতা উচ্চারণ করলে যা হয় তাই গীতার শিক্ষা। গীতার উল্টো তাগী। বার বার বললে হয় ত্যাগী। গীতার সার কথা সব কর্ম্মফল ত্যাগ করে আমার শরণ নাও, এই ত্যাগই গীতার মূলকথা।

গীতার প্রশংসায় বিভিন্ন বৈদেশিক মনীষিগণ সশ্রদ্ধভাবে বলেছেন—'গীতা সগুণ ও নির্গুণ উভয় উপাসনাকে সমান স্থান দিয়েছে "শ্বেতাশ্বেতরের ন্যায় গীতা পূর্বে একখানি উপনিষদ ছিল' "ভগবৎ গীতা সেই বেদ-সরোবর যাহার স্বচ্ছ ও শুদ্ধ সলিল, ভারতে দারুণ

সংঘর্ষের মধ্যে যুগে যুগে ভারতেতিহাস-রূপ অরণ্যের মধ্য দিয়া বেদরূপ হিমালয়ের অগম্য শৃঙ্গ হইতে প্রবাহিত ও সঞ্চিত।”

গীতাকে তাঁরা কত না বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখেছেন!

গীতা ও ভাগবতের বক্তা একই শ্রীকৃষ্ণ,—গ্রন্থকার একই ব্যাসদেব। পার্থক্য ভাগবতের পরিবেশ ভক্তি রসাপ্লুত বৃন্দাবন, গীতার পরিবেশ রক্তাক্ত কুরুক্ষেত্র। তাই ভাগবত হয়তো সরস—কিন্তু গীতা কঠোর যুক্তি ও তত্ত্বকথা। তবে গীতায় শ্লোকের সঙ্গে যেমন আছে কঠোর কঠোপনিষদের ভক্তের ইষ্ট বক্তব্য. মুণ্ডকোপনিষদের তত্ত্ব. ঈশোপনিষদের ইঙ্গিত. তেমনই আছে ভক্তের ইষ্ট স্মরণের কথা ভাগবতেরই সুরে।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা অনেকে বলেন যে রক্তাক্ত রণক্ষেত্রে যুদ্ধোন্মাদ বীরগণের মধ্যে কি করে গীতার গীত সম্ভব? সেখানে শুধু পাশ্চাত্ত্য। ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে উত্তর দিতে হয়—রোমান সম্রাট মার্কাস আরলিয়াম যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে ঘরে বসে তিন দিন ধরে দর্শন আলোচনা করেছিলেন। সম্রাট শাজাহান-তনয় দারা শিকো—যুদ্ধক্ষেত্রের শিবিরেও দর্শন আলোচনায় দিন কাটাতেন।

গীতা বিভিন্ন মতের সমর্থক—তাই ভগবান বলেছেন, ‘যে যে ভাবে আমার আরাধনা করে, আমি সেইভাবে তাকে কৃপা করি।’ ‘যাহারা ঈশ্বরের যে কোন রূপ. শ্রদ্ধাপূর্বক অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে আমি তাহাদিগকে সেই মূর্ত্তিতে. ভক্তি ও বিশ্বাস প্রদান করি।’ “যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে তাহারাও অ-বিধি পূর্বক আমারই উপাসনা করে।”

মোটমাট গীতার বাণী আমাদের কি বলেছে, কোন্ পথের ইঙ্গিত দিয়েছে তা তার অধ্যায়গুলির সারাংশ দেখলেই বোঝা যায়। গীতার মোট ১৮টি অধ্যায়। প্রথম বিষাদযোগে তার আরম্ভ। যুদ্ধক্ষেত্রে যাদের বধ করতে হবে তারা নিজেরই আত্মীয়—ভেবে অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হলেন—তখন সারথীরূপী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গাইলেন এই গীতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগে তার উপদেশের সার বোঝালেন—আত্মা অজয় অমর—একে বধ করা যায় না, সে শুধু দেহটি ছেড়ে অন্য দেহে যায় মাত্র। দেহ বিনাশী, সুখ দুঃখ অনিত্য—নিত্য আত্মা মাত্র। আর সেই আত্মাই হচ্ছে ব্রাহ্মীস্থিতি।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ—
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগে—অর্জ্জুন প্রশ্ন করলেন, কর্ম বড় না জ্ঞান? ভগবান বললেন, উভয়ই প্রয়োজন—তবে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ তবে কর্ম হবে নিষ্কাম। মানুষ সংস্কারের অধীন, তাই পুরুষকারের প্রয়োজন। স্বধর্ম্মের উৎকর্ষে তা বিধেয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞান যোগের শ্রেষ্ঠতা বোঝালেন ভগবান—কর্ম্মের জন্য বিবিধ যজ্ঞ বর্ণনায়, জ্ঞান সাধনার কথায়, সংশয় ঘোচালেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে বোঝালেন সন্ন্যাস-যোগের কথা। নিষ্কাম কর্ম আর সন্ন্যাস এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি। বললেন, উভয়ই মোক্ষপ্রদ। দ্বেষ ও কামনা শূন্যতাই তো সন্ন্যাস— তাই প্রকৃত কর্ম ও সন্ন্যাসের একই ফল। তবে ব্রহ্মদর্শী সন্ন্যাসী জীবন্মুক্ত হ'ন একথা সত্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অভ্যাসযোগে আবার তিনি বললেন, সন্ন্যাসী হবে কর্ম্মফল-ত্যাগী। আর সন্ন্যাসী যোগ-সাধকের পদ্ধতি নিয়ে অভ্যাস ও বৈরাগ্য যোগে জন্মান্তরে সিদ্ধিলাভ করবে। কর্ম্মী জ্ঞানী ও তপস্বী অপেক্ষা অভ্যাস-পথের যোগী শ্রেষ্ঠ।

সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞান যোগ হয়েছে বর্ণিত।

অষ্টম অধ্যায়ে আবার ব্রহ্মযোগের নানা উপদেশ কথিত হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে রাজযোগের উপদেশ দিলেন ভগবান অর্জুনকে।

দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগ বোঝালেন। বল্লেন সর্ব্ব ক্ষেত্রে তাঁরই প্রকাশ।

একাদশ অধ্যায়ে বিহ্বল অর্জ্জুনকে শান্ত করতে না পেরে, সবই যে ভগবানের বিভূতি—এই কথা বোঝাতে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দর্শন করালেন। বোঝালেন, যা থাকবে, যা যাবে আর যা হবে, সবই তিনি।

দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জুন আবার প্রশ্ন করলেন সগুণ ও নির্গুণ উপাসনায় কোনটি শ্রেষ্ঠ? ভগবান বললেন, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ বিবেক-যোগ আত্মা ও জ্ঞানের সার্থক উপদেশ দিলেন ভগবান।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণত্রয় বিভাগের উপদেশ দিয়েছেন—সত্ব, রজ ও তমোগুণের কর্ম্মফলের গতি এবং গুণাতীতের মুক্তি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে যোগীর ধ্যেয় সংসার বৃক্ষের বর্ণনা। বৈরাগ্য আশ্রম, জীবের স্বরূপ অব্যয়, পুনর্জ্জন্ম ও আত্মদর্শন বর্ণনায় পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব বুঝিয়েছেন অর্জুনকে।

ষোড়শ অধ্যায়ে—দৈবাসুর-সম্পদ্বিভাগ যোগে দৈবী ও আসুরী সম্পদ প্রভৃতির বর্ণনা করে নরকের দ্বার যে কাম, ক্রোধ ও লোভ সেই সব ত্যাগের উপদেশ দিয়েছেন।

সপ্তদশ অধ্যায়ে—শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগে আছে। ত্রিবিধ শ্রদ্ধা, ত্রিগুণ, ত্রিবিধ আহার, ত্রিবিধ যজ্ঞ, ত্রিবিধ তপস্যা, ত্রিবিধ দান এবং ত্রিবিধ ওঁ তৎসৎ উচ্চারণের ফলাফল।

অষ্টাদশ অধ্যায়ই শেষ। এর নাম মোক্ষযোগ। সন্ন্যাস ও ত্যাগের ব্যাখ্যা, যজ্ঞ, দান ও তপস্যার কর্ত্তব্য, ত্যাগের উপযুক্ত কি এই সব কথা আছে। কর্ম্মফল ত্যাগই ত্যাগ। ত্রিবিধ কর্ম্মপ্রেরণা, ত্রিবিধ কর্ম্মসংগ্রহ, ত্রিবিধ জ্ঞান, ত্রিবিধ কর্ম্ম, ত্রিবিধ কর্ত্তা, ত্রিবিধ বুদ্ধি, ত্রিবিধ ধৃতি, ত্রিবিধ সুখবর্ণনা করে বলেছেন জগতে কেউই ত্রিগুণ মুক্ত নয় তবুও অনন্যভাবে স্বধর্ম্ম পালন করতে হবে, তাতেই নিষ্কাম সিদ্ধ হবে—হবে ব্রহ্মজ্ঞান।

এই ভাবে সম্পূর্ণ গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে সারা উপনিষদের প্রধান তত্ত্ব। একই শাস্ত্রের মধ্যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণনা কোন জাতির মধ্যে বা কোন দেশে নেই। তাই গীতা সমগ্র বিশ্বে অতুলনীয়। মহান ভারতের এই মহান শাস্ত্র তাই গৌরবের বস্তু।

পুরাণ ও পুরাতনী
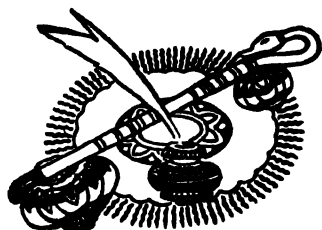
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ
বংশানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্

সৃষ্টি, প্রলয়, মন্বন্তর, বংশ ও বংশজাত ব্যক্তির চরিত্র এই পাঁচটি বিষয়ে জানা যায় যাতে তারই নাম পুরাণ। পুরাতন ইতিহাসের কথা নিয়েই পুরাণ বটে কিন্তু বর্ত্তমানে প্রচলিত পুরাণ সমূহের মধ্যে কোনটি কত প্রাচীন এ নিয়ে বাদবিসম্বাদ আছে বিস্তর।

বেদ যেমন কারও নয়, মুখে মুখে হয়েছিল প্রচারিত পুরাণও তাই। আজকের কথক ঠাকুরের মতন হয়ত তখন কোন কোন লোক গল্পচ্ছলে বলে যেতেন পুরাণ সাধারণের মধ্যে। তাদের বলা হ'ত সুত।

মুখে মুখে বলা আর শোনা কথায় অলঙ্কার বর্ণনা ক্রমে এমনই হয়তো বেড়ে চলেছিল যে পুরাণ যখন মনীষিরা লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থরূপে প্রচার করলেন তখনও ও বর্ণনার ছটায় অত্যুক্তি কিছু রয়েই গেল।

আজও পাঁচালী গায়ক গায়—উৎসবের আনন্দে হনুমান পান খেয়ে দেখলেন মুখে তার রক্ত, তখন কাঁদতে সুরু করলেন 'মুখে রক্ত ওঠে একি বিপদ ঘটে'—ইত্যাদি। রামায়ণে যে হনুমানকে মহাবীর মহা-পণ্ডিত, সংস্কৃতজ্ঞ, বুধজন বলে গেছেন হঠাৎ পাঁচালীকার তাকে এমন বেকুফ তৈরী করলেন—তার ল্যাজ নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি সুরু করলেন যে পবন-নন্দন হনুমান সত্য হলেও, রামের রাজ্যাভিষেক উৎসব সত্য হলেও, বর্ণনা ভঙ্গীটা নিছক মিথ্যা হয়েই দাঁড়াল।

পুরাণ তাই বেদেরই মতন সত্য ইতিহাসের প্রতীক হলেও, কবি কল্পনায় রস-প্রবাহে জায়গায় জায়গায় সত্যের দুকূল ছাপিয়ে—তীরবর্ত্তী জঙ্গলের বনবাদাড়ে হারিয়ে গেছে—পথের কাদায় বিকারগ্রস্ত হয়েছে।

বর্ণনার লালিত্য,উপমার অপূর্বতা, ছন্দের রণণ আর কৌতূহল ও কৌতুকের সমৃদ্ধি নিয়েও আজ বর্তমান যুগের নজির-ওয়ালা প্রমাণ-বাতিকের কাছে হয়ে পড়েছে অচল।

অথচ কবির কাব্যে 'চম্পক অঙ্গুলি'—'চন্দ্রানন', 'বজ্র কণ্ঠ', 'পুরুষসিংহ' 'আজানুলম্বিতবাহু' 'মরালগ্রীবা'—এসব বেশ চলে যায়—পাঠক পুলকিত হয়। বর্ণনার সম্ভার না থাকলে অনেক কবি আর কাব্যই ধূলিসাৎ হতো। অতএব আজও সহৃদয় জ্ঞানান্বেষী পাঠক বর্ণনার ছটা ভেদ ক'রে ইতিবৃত্তের সার সংগ্রহে যদি তৎপর হন, তবে সব কখানি পুরাণ থেকেই বহু সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। পুরাণের প্রাচীনত্ব ও নবীনত্ব বিচার, পুরাণের অত্যুক্তি বা অলৌকিকত্ব বিচার এক পৃথক ব্যাপার, কিন্তু পুরাণ সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বধর্ম্মে ও সর্ব্বজাতিতে সর্ব্বজন মনোহারী সংযোজক রূপে নব যুগের মানুষকে পুরাতন কথার ইতিহাস বলেই।

যাই হোক, বেদের পর আর্য্যগণ যখন যজ্ঞ সুরু করতেন তখন সেই যজ্ঞোৎসবে সমবেত সাধারণের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে বলে যেতেন পুরাণ নানা গল্পে, সুরে, ছন্দে, বর্ণনার রং দিয়ে নানা রকম ভাবে ফলিয়ে।

এরই বাস্তব উদাহরণ আমরা পাই নৈমিষারণ্যে—যজ্ঞস্থলে ঋষিদের কাছে বলে চলেছেন সূত নানা পুরাণ। কেউ গল্প সুরু করেছেন অভিশপ্ত পরীক্ষিতের জীবনের শেষ সাতটি দিনে নানা ভগবৎ কথার বর্ণনে, কেউ পরীক্ষিৎ-পুত্র জন্মেজয়ের যজ্ঞ বিবরণে—কেউ বললেন, কবে শ্রীকৃষ্ণ নারদকে কোন প্রসঙ্গে কি গল্প করেছিলেন তাই নিয়ে।

কিন্তু নৈমিষারণ্যের কথা বা জন্মেজয় কিংবা শ্রীকৃষ্ণের কাল আর কতোদিনের? তবে কি পুরাণ তখনকার লেখা।

শাস্ত্র ব'লে পুরাণ বেদেরও আগে লেখা।

প্রথমং সর্বশাস্ত্রাণাং পুরাণ ব্রহ্মণং স্মৃতম্
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিস্মৃতাঃ।

ব্রহ্মা আগে বললেন পুরাণ—তারপর বেদ। এখন ব্রহ্মাই বলুন

আর ব্যাসই বলুন, পুরাকালে যা ঘটেছিল—আগে সেই গল্পই তো বলবেন সৃষ্টিকর্ত্তা বা যে কোন পিতা তাঁর পুত্রকে।

সন্তান যখন শিশু থাকে—উপদেশ তাকে কেউ দেয় না—গল্পচ্ছলে দেয় নীতিকথার শিক্ষা। আজও তাই হিতোপদেশ বা কথামালার গল্প। তাই ব্রহ্মারূপ সৃষ্টিকর্ত্তা, সন্তানরূপ মনুবংশধর মানবকে আগে গল্প কথাই বলেছেন, বলেছেন পুরাণ, তারপর বেদ বেদান্ত আর উপনিষদ। এটা খুব সহজেই বোঝা যায়—প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

এখন গল্প তো যা তা বলবেন না—বলবেন একদিন যা ঘটেছিল—পুরাকালে যা ঘটলো তাই বলতে গিয়েই তিনি বললেন পুরাণ।

পুরাতনস্য কল্পস্য পুরাণানি বিদুর্বুধাঃ।

আদি পুরাণ—এখন ব্রহ্মা বা প্রথম স্রষ্টা যে পুরাণ সৃষ্টি করলেন আজও তাকেই আমরা বলি আদিপুরাণ। এই আদি পুরাণই সর্ব্বপ্রথম ও অতি প্রাচীন যুগের একমাত্র পুরাণ। আজও বিভিন্ন পুরাণে এমন অনেক শ্লোক পাওয়া যায় যে তা হুবহু মিলে যায়। আর তাই মনে হয় কোন একখানি পুরাণ মূল ধরেই তাঁরা নানা পুরাণ রচনা করেছেন—আর সেখানে এই আদি পুরাণ।

পুরাণ সংহিতা—তবে বাস্তব জগতে সেই আদি পুরাণকে ভিত্তি ক'রে ব্যাস পুরাণ-সংহিতা লেখেন। কিন্তু এ কোন ব্যাস। ব্যাস মানে ভাগ করা। বেদ ব্যাস করেন বেদব্যাস—কিন্তু পুরাণ ভাগ করেন সে কি সেই বেদব্যাস ? যুগে যুগে ধর্ম্মের গ্লানি-শঙ্কায় বা নানা সন্দেহ-নিরসনে স্বয়ম্ভু বা ব্রহ্মার পর স্বায়ম্ভুব থেকে বিভিন্ন মনীষি বেদ বা পুরাণকে সাজিয়েছেন। শাস্ত্রে আমরা তাঁদের যে আটাশটি নাম পাই তা হচ্ছে—১। স্বায়ম্ভুব ২। প্রজাপতি ৩। উশনা ৪। বৃহস্পতি ৫। সবিতা ৬। মৃত্যু ৭। ইন্দ্র ৮। বশিষ্ঠ ৯। সারস্বত ১০। ত্রিধামা ১১। ত্রিবৃষা ১২। ভরদ্বাজ ১৩। অন্তরীক্ষ ১৪। বজ্র ১৫। ত্রয়্যারুণ ১৬। ধনঞ্জয় ১৭। কৃতঞ্জয় ১৮। ঋণজা ১৯। ভরদ্বাজ ২০। গৌতম ২১। হর্যাত্মা ২২। বেণ ২৩। তৃণবিন্দু ২৪। বাল্মীকি ২৫। শক্তি

১৬। পরাশর ১৭। জাতুকর্ণ ১৮ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ১৯। দ্রোণি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বায়ম্ভুব যে যুগে সে যুগেই বেদ ব্যাস করা হয়—আর পুরাণও বর্ণিত হয় সেই সত্য যুগে। এই ভাবে ২৩ জন ব্যাস জন্মাবার পর আমরা পাই ত্রেতার বাল্মীকিকে এবং তার আরও তিন জনের পর দ্বাপরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে—যাকে আমরা 'বেদব্যাস' বলে জানি—বেদ, পুরাণ, মহাভারতের বক্তা রূপে।

কিন্তু বেদ পুরাণ তো আর মহাভারত যুগের লেখা নয়—আর এক ব্যাসও কিছু ব্রহ্মার সৃষ্টিকাল থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কাল পর্য্যন্ত ছিলেন না যে বলতে হবে লক্ষ লক্ষ বৎসর ছিল তাঁরই আয়ু। হয়তো পুরাণের বর্ণনায় তা মনেও হয়ে যেতে পারে কোথাও, কিন্তু যে যখন ব্যাসের কাজ করেছে তাঁকেই আমরা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আসনে বসিয়ে ব্যাসরূপে ধ্যান করেছি মাত্র। লোকে আজও কথককে বা পাঠককে ব্যাস বলে।

যাইহোক—আমরা বলবো ও জানবো অতি প্রাচীন থেকে যে বেদ বা পুরাণ ছিল প্রচলিত—বেদব্যাস অসাধারণ মনীষিদের জন্য সেই বেদ সঙ্কলন করে বর্ত্তমান বেদ-সংহিতার রচনার পর পুরাণ রচনায় মন দিলেন—গল্পচ্ছলে উপদেশ দিতে। আর তাতে ইতিবৃত্ত, বংশ, চরিত্র প্রভৃতি পঞ্চ লক্ষণ যুক্ত এমন বর্ণনা করে গেলেন, তার সঙ্গে আস্তিক হিন্দুর জন্য স্বর্গপ্রাপ্তি, ধন প্রাপ্তি, শান্তি ও সুখের এমন ফলশ্রুতি শুনিয়ে গেলেন যে ধর্ম্মলাভের জন্য পাগল হিন্দু তাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে রেখে অমর ক'রে রাখলো। কবিত্বে, কাহিনীর অলৌকিকত্বে, আর ফলশ্রুতিতে তা হয়ে রইলো অটুট আর অক্ষয়—ইতিকথা ইতিহাস হয়ে গেল।

ব্যাস-রচিত পুরাণ সংহিতাখানি ব্যাস দিলেন নিজের প্রিয় শিষ্য রোমহর্ষণকে। হয়তো তার বর্ণনা শক্তি শ্রোতার দেহে রোমাঞ্চ আনতো, তাই তাকে তাঁরা রোমাহর্ষণ বলেই প্রণাম করেছেন। এই রোমহর্ষণ নিজে একখানি পুরাণ-সংহিতা লেখেন—নাম দেন 'রোমহর্ষণিকা।'

রোমহর্ষণেরও ছয়জন শিষ্য ছিলেন—সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রযু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। এদের মধ্যে অকৃতব্রণ বা কাশ্যপ,

সাবর্ণি ও শাংশপায়ন তিনজন তিনখানি পুরাণ সংহিতা লেখেন।

ব্রাহ্মী, ভাগবতী. শৈবী, বৈষ্ণবী চ প্রকীর্ত্তিতা।

চতস্রঃ সংহিতাঃ পুণ্যা ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষদা।'

ব্রাহ্ম. ভাগবৎ, শৈব ও বিষ্ণু এই ৪ খানি প্রথমে রচিত পুরাণসংহিতা হয়।

অনেকে বলেন, এইভাবে নাকি আদি পুরাণ, সুতসংহিতা, শৈব (শাঙ্কর) পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ব্রহ্মপুরাণ ও সৌরপুরাণ নামক ছয় খানা পুরাণ সংহিতা লেখা হয়।

সুত ও মাগধ—শুধু লেখা নয়— নানা স্থলে তাঁরা এই স্বরচিত বা গুরু-কথিত পুরাণের গল্প বলে যেতে থাকেন সমবেত লোকের মধ্যে, ঠিক যেমন আজ কথক বলে সভায়,— কীর্ত্তনীয়া গান গায় উৎসবমণ্ডপে। তাদের বলা হ'ত সুত ও মাগধ।

সুত বলতেন সকলের পুরাতন ঘটনা আর মাগধ বলতেন মাত্র যে কোন একটি বংশের কথা— যে রাজার আশ্রয়ে তিনি থাকেন।

'সুতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশ বেদিনঃ।'

কুরুক্ষেত্রে নৈমিষারণ্যে বা জন্মেজয়ের যজ্ঞস্থলে কিংবা পরিক্ষিৎ জীবনের শেষ কটিদিনের গল্প বলার মধ্যেই সুত তার পুরাণ কথা বলে গেছেন।

সুতের এই ছিল কাজ। 'বংশানাং ধারণং কার্য্যং'—সমস্ত রাজ-বংশের ইতিকথাই সবিস্তারে সুললিত বর্ণনায় তিনি বলতেন। তিনি হতেন সত্যনিষ্ঠ—নিরপেক্ষ ও ধার্ম্মিক।

সে যুগে প্রতি রাজার রাজসভায় একজন ক'রে মাগধ থাকতেন।

তিনি নিজের রাজা ও তার বংশের বিষয় বলতেন, লিখতেন— প্রচার করতেন তার নিজের আশ্রয়দাতার কাহিনী বর্ণনাচ্ছটায় হয়তো খানিকটা বাড়াবাড়ি হয়ে যেত—সুত তা শুদ্ধ ক'রে দিতেন বা নিতেন।

পৃথু রাজার সময় থেকেই সম্ভবতঃ এই সুত ও মাগধের উৎপত্তি।

অষ্টাদশ পুরাণ

এখন সুত ও মাগধের বিষয় নিয়েই পরবর্ত্তীকালে আঠারটী পুরাণ রচিত হয়ে গেল। তার মধ্যে ১। ব্রহ্মপুরাণ ২। পদ্মপুরাণ ৩। বিষ্ণুপুরাণ (বৈষ্ণব) ৪। শৈবপুরাণ ৫। ভাগবতপুরাণ ৬। নারদীয় পুরাণ ৭। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮। অগ্নিপুরাণ (আগ্নেয়) ৯। ভবিষ্যৎ পুরাণ ১০। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ১১। লিঙ্গপুরাণ (লৈঙ্গ) ১২। বরাহ পুরাণ ১ । স্কন্দ পুরাণ ১৪। বামন পুরাণ ১৫ কূর্ম্মপুরাণ ১৬। মৎস পুরাণ ১৭। গরুড় পুরাণ (গারুড়) ও ১৮। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

এই আঠারখানা পুরাণের প্রতিখানা আবার বিভিন্ন সংগ্রহ কর্ত্তার লেখায় পাওয়া যায় অথবা হয়তো একই লেখা বিভিন্ন সুত বা মগধ বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন স্থানে।

বিষ্ণুপুরাণের কথকগণের মধ্যে বাইশটি লোকের নাম পাই। আজও ত একই ইতিহাস নানালোকের লেখা সংস্করণ হচ্ছে। যে বাইশজনার নাম পাই—তা হচ্ছে কমলোদ্ভব, ঋভু, প্রিয়ব্রত, ভাগুরী, স্তবমিত্র, দধীচ, সারস্বত, ভৃগু, পুরুকুৎস, নর্ম্মদা, ধৃতরাষ্ট্র, পুরণ, বাসুকি, বৎস, অশ্বতর, কম্বল, এলাপাত্র, বেদাশিরা, প্রমতি, জাতুকর্ণ, বশিষ্ঠ ও পরাশর। এর মধ্যে অনেক নাম পরিচিত এবং যুগের সন্ধান দেয়, আবার অনেক নাম বিশিষ্ট চেনা লোকটী নয়—সেই নামে অন্য কোন লোক।

তার প্রমাণ নিয়ে অনেক কথা বলতে হয়। বায়ুপুরাণে আবার ব্যাসকে দেখি সংগ্রহকার রূপে। আবার তারই পাশে অনার্য্য, আরণ্যক বা স্ত্রীলোকের নামও দেখা যায় পুরাণ সংগ্রহ কার্য্যে।

এমনই বিভিন্ন পুরাণে পুরাণসংগ্রহকারীর নানা নাম পাওয়া যায়—আর তাদের দিয়েই নিরূপণ করা হয় কোন পুরাণ কতদিনের প্রাচীন—কার মর্য্যাদা বা মান কত কম বা বেশী।

তবে ১৮ খানি পুরাণের প্রতিখানিই হাজার হাজার শ্লোকে শত শত ঘটনায় পূর্ণ। সে সব বলতে গেলে মহাভারতের চেয়েও বুঝি

বড় হয়! তাই আমরা মোটামুটীভাবে আগে ১৮ খানা পুরাণের পরিচয়টা পৃথক পৃথকভাবে জেনে নেব। তারপর সে যুগের শিক্ষা, দীক্ষা, কৃষ্টি, সামাজিক নিয়মাদি বলে সে যুগের একটা নিয়মাদি মোটামুটী ধারণা নিয়ে পরে সুযোগমত গল্প বলা যাবে—কারণ তাহলে দ্রৌপদীর পঞ্চপতি বা ভাই-বোনের বিয়ের কারণটা বোঝা যাবে সহজে। শোনা যাবে কি অপূর্ব্ব সে সব কথা আর বোঝা যাবে তা সত্য না মিথ্যা, সম্ভব না একেবারেই অসম্ভব।

ব্রহ্ম পুরাণ

রোমহর্ষণ বলেছেন ঋষিদের ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মারীচীর নিকট বর্ণিত এই ব্রহ্ম পুরাণ। এতে আছে ১০০০০ শ্লোক—এই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মপুরাণই আদি পুরাণ। অনেকে একেই সৌরপুরাণ বলেন, তবে সৌরপুরাণ নামে এক উপপুরাণও আছে।

ব্রহ্মোত্তর খণ্ডে কাল, সূর্য্য নিয়েই প্রধান কথা। তবে সৃষ্টি-তত্ত্বের পর—শ্রীকৃষ্ণ ও সূর্য্য-চন্দ্র-বংশধারা ধরে নানা দেব-কাহিনী, এসে দাঁড়িয়েছে উড়িষ্যার সূর্য্য, শিব ও জগন্নাথের কথায়। ব্রহ্মপুরাণের বক্তব্য—কৃষ্ণই জগন্নাথ। উত্তর খণ্ডে তো মাহাত্ম্য ও কাহিনীতেই পূর্ণ।

অনেকে উড়িষ্যাস্থ জগন্নাথ বা সূর্য্য-প্রাধান্যে কোণারক আদি স্মরণ করে পুরাণখানিকে ১৩ বা ১৪ শতাব্দীর লেখা বলে কল্পনা করেন। বিশেষতঃ বৈদেশিক পণ্ডিতগণের তাই মত।

পদ্ম পুরাণ

পৃথ্বী ছিল স্বর্ণ-পদ্ম রূপে। পদ্মযোনী ব্রহ্মা পৃথ্বীরূপা সর্ব্বভূতাশ্রয় পদ্মবিষয়ে বলেছেন নানা কথা এই পুরাণে—তাই এর নাম পদ্মপুরাণ। এ পুরাণখানাও ৫ খণ্ডে বা পর্ব্বে সম্পূর্ণ। সৃষ্টি বা পৌষ্কর ভূমি স্বর্গ, পাতাল ও উত্তরখণ্ড—এই পাঁচ ভাগ। ৫০০০০ হাজার শ্লোকে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। সৃষ্টি বা পৌষ্কর খণ্ডে—বিরাটপুরুষের উৎপত্তি বিবৃত হয়েছে। পুষ্কর তীর্থ ধরে চলেছে সৃষ্টি তত্ত্বের নানা কথা। ব্রহ্মাবর্ত্তে নয় রকম সৃষ্টি বর্ণনা। দেবতা ও পিতৃগণের কথা।

ভূমিখণ্ডে আছে—তীর্থ থেকে সুরু করে সব গ্রহের, পর্বত, দ্বীপ ও সপ্তসাগরের নানা কথা।

স্বর্গখণ্ডে আছে দানকারী রাজাদের কথা, দক্ষ-শাপাদি নানা কাহিনী।

পাতাল খণ্ডে আছে নানা রাজার উৎপত্তি ও তাদের বংশ কীর্ত্তন।

উত্তর বা শেষ খণ্ডে মোক্ষ তত্ত্ব বা সাধন-ক্রম বর্ণিত হয়েছে।

বিষ্ণু পুরাণ

পরাশর বলেছেন বরাহ কল্পে এই ২৩০০০ শ্লোকে ভরা বিষ্ণু পুরাণ। বিষ্ণু পুরাণে আমরা দেখতে পাই—আদি কারণ, সৃষ্টি দেবাদির উৎপত্তি, সমুদ্রমন্থন ও দক্ষাদির বৃত্তান্ত, ধ্রুব ও পৃথু চরিত, প্রচেতার আখ্যান, প্রহ্লাদের কথা এবং পৃথক পৃথক রাজাও রাজ্য-বৃত্তান্ত।

প্রিয়ব্রতাখ্যান, দ্বীপ, বর্ষ-নিরূপণ, পৃথক পৃথক লক্ষণযুক্ত সূর্য্যাদি কথা, ভরত চরিত, মুক্তিমার্গ নিদর্শন এবং গ্রীষ্ম ঋতুর সংবাদ, মন্বন্তরাখ্যান, বেদব্যাসের অবতার, নরকোদ্ধারক কর্ম্ম, সগর ও ঔর্ব সংবাদ, সর্ব ধর্ম্মের নিরূপণ, বর্ণাশ্রম, শ্রাদ্ধ-কল্প নির্দ্দেশ, সদাচার, প্রভৃতির আলোচনা হয়েছে।

আর আছে কৃষ্ণাবতার বিষয়ক প্রশ্ন, গোকুলের কথা, বাল্যকালে পুতনা প্রভৃতির বধ, কৌমারে অঘাসুরাদির হত্যা, কৌশোরে কংশ বিনাশ ও মাথুর চরিত, যৌবনে দ্বারকাপুরীতে লীলা, সর্বদৈত্য বধ, পৃথক পৃথক প্রকার বিবাহ, দ্বারকায় থেকে এবং শত্রুহননাদি দ্বারা ভূ-ভার হরণ এবং অষ্টাবক্রীয় উপাখ্যান।

কলিজাত চরিত, লয়ের চতুর্বিধ অবস্থা এবং কেশিধ্বজের সঙ্গে খাণ্ডিক্যের ব্রহ্মজ্ঞান সমুদ্দেশ ইত্যাদির কথাও বলা হয়েছে।

এরপর নানাবিধ ধর্মকথা, ব্রত, নিয়ম, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, বেদান্ত জ্যোতিষ, বংশাখ্যান, স্তোত্র, মন্ত্র এবং সর্ব্বলোকোপকারক নানাবিধ বিদ্যার বিষয়ও কীর্ত্তিত হয়েছে।

এই বিষ্ণু পুরাণে বৌদ্ধ ও জৈন প্রসঙ্গ সম্বন্ধেই বিশেষ করে লেখা

হয়েছে। বৌদ্ধরা ভারতে খৃঃ ১২ শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। অনেকে ভাবেন সম্ভবতঃ তার আগে দশম শতাব্দীতেই এই বিষ্ণুপুরাণ লিখিত হয়েছে। কুরুপাণ্ডবের মহাসমর থেকে ভবিষ্যৎ রাজবংশ পর্য্যন্ত যেরূপ রাজ্যকাল নির্ণীত হয়েছে. তাতে কলির ৪১৪৬ অর্থাৎ১০৪৫ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। অনেকে ঐ সময়ে বিষ্ণুপুরাণের রচনা কাল অনুমান করেন।

বায়ু পুরাণ—অনেকে বলেন শৈব ও বায়ুপুরাণ এক। আবার ভিন্ন-মতও আছে। বিষ্ণু. পদ্ম, মার্কণ্ডেয়, কৌর্ম, বরাহ, লিঙ্গ, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত, ভাগবত ও স্কন্দ পুরাণে শৈব এবং মৎস্য, নারদ ও দেবীভাগবতে শৈবের স্থানে 'বায়বীয়ের' এবং মুদ্‌গল পুরাণে শিব ও বায়ু উভয়ের উল্লেখ আছে। পুরাণের মধ্যে এই বায়ু প্রোক্ত পুরাণ শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য। ২৪০০০ শ্লোকে এ পুরাণ গ্রথিত। বায়ু পুরাণ সুত বলেছেন—নৈমিষারণ্যে। এতেও চারটি খণ্ড—প্রক্রিয়া, উপোদ্যাত, অনুসঙ্গ ও উপসংহার।

প্রক্রিয়ায় সৃষ্টিতত্ত্ব, উপোদ্‌ঘাতে বিভিন্ন কল্পকথা, অনুসঙ্গ সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি বংশ কাহিনী ও ভবিষ্য নানা বংশের কথা আর উপসংহারে আছে ভবিষ্য মন্বন্তরের কথা- যোগবলে শিবত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতি নানা সাধন কথা। অনেকে বলেন এই খানাই প্রাচীনতম।

ভাগবত পুরাণ—ভাগবতপুরাণখানি আবার দুই প্রকারে বিভক্ত। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু-মহিমা-প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবতকেই প্রকৃত ভাগবতপুরাণ বলেন, কিন্তু শাক্তরা বলেন শক্তির মহিমাদ্যোতক দেবী ভাগবতকে ভাগবতপুরাণ। তাই এর মহাপ্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্ব নিয়ে নানা মতবাদ আছে। দেবী-ভাগবত তান্ত্রিক কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত দাশনিক পথের ধারক।

১৮০০০ শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণখানি বর্ণিত সুতকর্ত্তৃক নৈমিষারণ্যে রচিত। আর পরিক্ষিতের সর্পাঘাতের পর জীবনের শেষ কয়দিন এই মহাপুরাণ শোনান তাঁকে শুকদেব। জীবনের কর্ত্তব্যের নির্দেশ পান মৃত্যুপথযাত্রী পরিক্ষিৎ এই ভাগবতের মাধ্যমে।

দ্বাদশ স্কন্দে এ পুরাণ বর্ণিত। সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মা বলেন নারদকে।

বেদান্তের সার কথাই যেন গল্পের মাধ্যমে এতে বিবৃত। সৃষ্টিতত্ত্ব, অবতার—বিশেষ করে বরাহ অবতার, প্রজাপতি বা স্বায়ম্ভুবের উৎপত্তি, কর্দ্দম ও দেবাহুতির বিবাহ, বিষ্ণুর অন্য অবতার, কপিলের কাহিনী, নানা মন্বন্তরের কথা, অগস্ত্যের সমুদ্র শোষণ, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের পর শ্রীকৃষ্ণের বংশধর ও যদুবংশ ধ্বংশের কাহিনী এবং কলি ও কলিযুগের কথা।

এই ভাগবত পুরাণ-কথা শেষ হওয়া মাত্র অভিশপ্ত পরিক্ষিৎকে সাপে কামড়ায়। কিন্তু পরম ভাগবত পরিক্ষিৎ মুক্তি পান।

অনেকে ভাগবত পুরাণ বোপদেব রচিত বলেন এবং বলেন এ পুরাণ দ্বাদশ শতাব্দীর লেখা।

নারদীয় পুরাণ- স্বয়ং নারদ মানুষের কর্ত্তব্য বা বৃহৎকল্প বিষয় নিয়েই এ পুরাণ বলেন—মোট ২৫০০০ শ্লোকে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ রুক্মাঙ্গদ-কন্যা মোহিনীর একাদশী ব্রতের পারণে নিজ পুত্র-বধের কথা প্রভৃতি বহু মনোরম কাহিনীতে এ গ্রন্থ পূর্ণ। তবে অনেকে বলেন এ আধুনিক। কারণ পুরাণের কোন লক্ষণ তো এতে নেই বরং গোবধকে মহাপাপরূপে এমন ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন যে মনে হয় এ ভক্তিগ্রন্থখানি বৈষ্ণবোচিত বৃত্তি নিয়ে ম্লেচ্ছ রাজ্যে অহিংসা প্রচারেই ব্যস্ত। তাই অনেকে এ গ্রন্থ ষোড়শ শতাব্দীর রচনা বলে থাকেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ—স্বতন্ত্র এর রচনা পদ্ধতি। একটি পাখীকে কেন্দ্র ক'রে পুরাণখানির প্রারম্ভ। ব্যাস শিষ্য জৈমিনী বাসুদেব-মাহাত্ম্য কথা শোনাতে বলেন মার্কণ্ডেয় ঋষিকে। কাহিনীর সুরু করে সহসা কোন এক বিশেষ যজ্ঞে যাবার প্রয়োজনে অথবা সন্দেহ নিরসনের জন্য বা মাহাত্ম্য প্রমাণের জন্য মুনি শমীক আনীত পিঙ্গাক্ষ নামক পাখীর উপরই পুরাণ শোনবার ভার দিয়ে মার্কণ্ডেয় চলে যান সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে। তখন পাখী পিঙ্গাক্ষ শোনাল সেই কাহিনী যা সে শুনেছিল সমীক আশ্রমে বেদ-বেদান্ত প্রসঙ্গে। পাখীকেই প্রশ্ন করলেন জৈমিনী—কেন বাসুদেবের এত মাহাত্ম্য, আর তাহলে কেনই বা তাঁর সখী দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলেই গেল মরে, কেন দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি, কেন

বলদেবের তপস্যা। নানা প্রশ্নের উত্তরে পাখী বললে মহাভারতের ঘটনা, বৃত্রাসুর বধের গল্প, বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠের কলহ প্রভৃতি উপাখ্যান।

তারপর নানা সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে বৈবস্বত মন্বন্তরের কথাও বলেন যাতে সর্ব্বপ্রথমে আমরা পাই শক্তিবাদের নানা প্রসঙ্গ। কালী, চণ্ডী, দুর্গার সব কথা—চণ্ডীপাঠের মাহাত্ম্য ও কাহিনী। তবে এ পুরাণে কাহিনী অপেক্ষা নানা প্রামাণ্য উপদেশই প্রধান। গ্রন্থের ৬৯০০০ শ্লোকের বেশী অংশই নীতি কথায় পূর্ণ।

অগ্নি পুরাণ—ঈশান কল্পের কাহিনী। অগ্নি বলেন বশিষ্ঠকে, বশিষ্ঠ ব্যাসকে এবং ব্যাস সুতকে। ১৫০০০ শ্লোকে অন্যান্য পুরাণের মতন সৃষ্টিতত্ত্ব, অবতার কথা, মহাভারত রামায়ণের বহু কাহিনী, শিব পূজাদি বিধি, গয়ামাহাত্ম্য. তীর্থ বিবরণ থাকলেও মিতাক্ষরা প্রভৃতি বহু আইনের কথা বহু বিচার প্রসঙ্গ আছে এই পুরাণে। তাছাড়া অতি মূল্যবান প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের কথা ও তৎপ্রসঙ্গে শিব-শক্তির মিলন-কথায় গ্রন্থ বিশেষ সমৃদ্ধ। পাণিনীর মধ্যেও অগ্নিপুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া অস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা বা ন্যায় ও বিচারের এমন সব কথা এতে আছে যা মোগলসম্রাট আকবরকে এই পুরাণখানি অনুবাদ করতে প্রলুব্ধ করে। তিনি একখানি মূল ও একখানি অনুবাদ গ্রন্থ লেখান এই অগ্নিপুরাণ নিয়ে। মনে হয়. তা থেকেই আকবরের রাজসভায় লিখিত আইনী আকবরী প্রভৃতি গ্রন্থ অনেক ইঙ্গিত পেয়েছে।

ভবিষ্য পুরাণ—'ভবিষ্যোক্তে ভবিষ্যকম্।' ভবিষ্যতে কি হবে এই কথা নিয়েই পূর্ণ এই পুরাণ। ব্রহ্মা বলেছেন মনুকে এই অঘোর কল্পের কথা। মোট ১৪৫০০ শ্লোকে গ্রন্থ শেষ। ব্রহ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ত্বাষ্ট্র ও প্রতিসর্গ—এই ৫ খণ্ডে ১২৬ অধ্যায়ে গ্রন্থ রচিত। সৃষ্টিতত্ত্ব ও সূর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়েই কথারম্ভ। তারপর গুরু, শিষ্য, বর্ণভেদ, উপনয়ন ব্রত, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি অধুনা প্রচলিত বহু কথা আছে এতে। তারপর চন্দ্রগ্রহণাদি গ্রহরাশির কথা, শাকদ্বীপাদি ভূ-খণ্ডের কথা, মদনোৎসব প্রভৃতি প্রসঙ্গে—চ্যবনঋষির কাহিনী, নাগপঞ্চমীর গল্পাদি

বলেও ভবিষ্যৎযুগে দরিদ্রের দারপরিগ্রহের বিড়ম্বনা অথচ ভার্য্যাহীন গৃহস্থের অবস্থা— সব যেন বর্ত্তমান যুগের ছবি হিসেবে এঁকে গেছেন। নারী চরিত্র, বাসগৃহ প্রভৃতির বহু কথায় এ পুরাণ পূর্ণ। তাছাড়া এই কলিকালের কথা– ম্লেচ্ছ যজ্ঞ বৃত্তান্ত, ব্যাসের ভবিষ্যৎ কথার বিস্তার— ম্লেচ্ছ ভূমির উৎকর্যতা, আদম নূহ বংশের কথা, শ্বেতনূহ, সীমসম, মহলল্ল প্রভৃতি বর্ত্তমান বৈদিশিক জাতির সৃষ্টিকথা—সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশে নানা দেশী ও বিদেশী ভাষা– যাবনিক, ব্রজ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ভাষার কথা, মাগধাদি বংশের বিষয়,- কালিঞ্জর চৌহান, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি আধুনিক ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গে এই পুরাণখানি ভরা। দ্বাদশ শতাব্দীর পল্হবাদির আক্রমণ, শালিবাহন, শক, ম্লেচ্ছাদির অত্যাচার, ভোজরাজ ও কালিদাস প্রভৃতির কথাও আছে এ পুরাণে।

পুরাণের শেষ অংশে তৈমুর বংশ, তোমার রাজ্য, উদয়পুর, বুন্দেল-খণ্ড, দেহলী প্রভৃতির কথা আছে। এমন কি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, নিম্বকাচার্য্য, রামানন্দ, মাধবাচার্য্য, বরাহমিহির, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ কবীর প্রভৃতি নানা সাধক জীবনীরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীন ও নবীন কালকে সংযোগ করতে একটি কাহিনী পাওয়া যায় শাম্ব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সূর্য্য পূজার পুরোহিত নিয়োগে। সূর্য্যপূজার উপযুক্ত পুরোহিত না পেয়ে শাম্ব পশু দেশ বা পারশ্য থেকে আনেন সৌর বা অগ্নিপূজারী, নাম তাদের 'মগ'। এখানে শাকদ্বীপবাসীর সঙ্গে মিশে—তাদেরই বংশধররা মগ নামে খ্যাত হয়। আবার শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে তাদেরই সঙ্গে যাদব-কন্যার মিলনে হয় ভোজকগণের উদ্ভব।

এছাড়া উদ্ভিদ বিদ্যা সম্বন্ধেও বহু তথ্য আছে এই পুরাণখানিতে। আজও বহু তথ্যপূর্ণ এই পুরাণ বাস্তব জগতের বিশেষ কল্যাণকর।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে—ব্রহ্মার বিবর্ত্তন কাহিনী নিয়ে যে পুরাণ তারই নাম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। ১৮০০০ শ্লোকে রথান্তর কল্পের কথা নিয়ে সাবর্ণি নারদকে বলেন এ পুরাণ-কাহিনী। তবে পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ এতে নেই। তাছাড়া প্রাচীন পুরাণের মতন সৃষ্টিতত্ত্ব, গণেশ জন্ম ও ব্রহ্মা-বরাহ-

কালের বহু কাহিনী এতে থাকলেও, বঙ্গদেশ, রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতির উল্লেখে ম্লেচ্ছজা কুবিন্দ-কন্যার প্রসঙ্গে জোলা জাতি বা বাংলা দেশের ছবি আঁকা আছে, তাতে মনে হয় এ গ্রন্থ আধুনিক।

লিঙ্গ পুরাণ—ঈশান কল্পের কথা নিয়ে ১১০০০ শ্লোকে রচিত এ পুরাণ। লিঙ্গ বা শিব পূজার কথাই এতে প্রধান। অনেকে বলেন এ পুরাণও আধুনিক, তবে কর্ম্মকাণ্ডেরও অনেক কথা এতে আছে।

বরাহ পুরাণ—মানবকল্প প্রসঙ্গে বরাহ অবতারের মাহাত্ম্য প্রচারেই এ পুরাণের রচনা। ২৪০০০ শ্লোকে পূর্ণ এ গ্রন্থে মহাবরাহ সংবাদ প্রধান হলেও কাহিনীর মাধ্যমে নাগগণের ইতিহাস, বিনায়কাদি কাহিনী, গৌরীর উৎপত্তি বা সত্যতপার ব্রত, বহু গল্পই এতে আছে। তাছাড়া মূল্যবান অংশ অগস্ত্য গীতা, রুদ্র গীতা প্রভৃতি। মহিষাসুর বধাদির গল্প থাকলেও 'গীতা' নামটি অথবা কাহিনী মধ্যে রামানুজ চরিত্রের আভাস দেখে মনে হয় এ গ্রন্থও দ্বাদশ শতাব্দীর লেখা।

স্কন্দ পুরাণ—বেদসার থেকে সংগৃহীত ৮১০০০ শ্লোকে লেখা এই পুরাণ আকারে ও বর্ণনায় বিরাট। ছয়টি সংহিতা ও অর্দ্ধশত খণ্ডে এ পূর্ণ। সনৎকুমার, সূত, শঙ্কর, বৈষ্ণব, ব্রহ্ম ও সৌর এ ছটি সংহিতা। মাহেশ্বর খণ্ড, বৈষ্ণবখণ্ড, ব্রহ্ম খণ্ড, কাশী খণ্ড, রেবা খণ্ড, প্রভাস খণ্ড প্রভৃতি নানা খণ্ডে ও সর্ব্বাধিক সংখ্যার কাহিনীতে এ পুরাণ পূর্ণ।

বামন পুরাণ—সুতরোমহর্ষণ এ পুরাণ নৈমিষারণ্যে বললেও এ পুরাণ সর্ব্বাগ্রে বলেছেন পুলস্ত্য নারদকে এবং নারদ ব্যাস দেবকে। ১১০০০ শ্লোকে পুরাণখানি রচিত। পাতালের বলিরাজ-বংশ ও বামন কাহিনী নিয়ে এ পুরাণ হলেও ত্রিবিক্রম মাহাত্ম্য ছাড়াও বিষ্ণু, ও ব্রহ্মা ও মহাদেবের নানা কাহিনী আছে এতে। তাছাড়া কামদেব-দহন, প্রহ্লাদ সহ বিষ্ণুর মহাযুদ্ধ, মহিষাসুর বধ প্রভৃতিও এতে বর্ণিত।

কূর্ম্ম পুরাণ—ইন্দ্রদ্যুম্ন কথা প্রসঙ্গে নৈমিষারণ্যে রচিত ১৭০০০ শ্লোকে পূর্ণ এই পুরাণ। প্রাচীন পুরাণের লক্ষণ থাকলেও তন্ত্রের কথা আছে এতে বেশী। বহু অংশ এর পাওয়া যায় না।

মৎস্য পুরাণ—কল্কির আদিতে জনার্দ্দন মৎস্যরূপে যে অবতার রূপ গ্রহণ করেন—তারই কাহিনী নিয়ে এ পুরাণ। শ্রুতির কথা ও নরসিংহ বর্ণন প্রসঙ্গে সাত কল্পের কথা আছে ১৫০০০ শ্লোকে। যযাতি, নহুষের বিবরণ—ভৃগুর অভিশাপ, অগস্ত্য ব্রত, অনন্ত ব্রত, শ্রাদ্ধ ও রাজধর্ম্মের বহু কথাই এ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

গরুড় পুরাণ—বিষ্ণু গরুড় কল্পের প্রসঙ্গে বিশ্বের অন্ত থেকে কাহিনী আরম্ভ করে ১৯০০০ শ্লোকে গরুড় পুরাণ রচনা করেছেন, এতে বিষ্ণুসহস্র নাম, বিষ্ণু ধ্যান, সূর্য্যপূজা, মৃত্যুঞ্জয় পূজা প্রভৃতি কথা ছাড়া আয়ুর্ব্বেদ নিদান, চিকিৎসা, দ্রব্যগুণ নিয়েও অনেক কথা আছে। আবার বেদান্ত-সাংখ্যের আলোচনাও দেখি সাধনা ও সিদ্ধির প্রসঙ্গে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গরুড়ের কোন প্রসঙ্গই এই গরুড় পুরাণে নেই। তবে মৎস্য পুরাণের ছায়া আছে এর মূল বক্তব্যে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ—ভাবি বা ভবিষ্য কল্পের কথা নিয়ে ১২০০০ শ্লোকে এ পুরাণ লেখা। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভৌগোলিক তত্ত্ব আছে এ গ্রন্থে—প্রক্রিয়া, অনুষঙ্গ, উপসংহার, উপোদ্‌ঘাত নামক চারটি খণ্ডে। অতি প্রাচীন বলেই মনে হয় বটে তবে বহুল অংশ দুষ্প্রাপ্য। বায়ু পুরাণের বহু কথা এতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যেই এর প্রচার বেশী।

আঠার পুরাণের পাশে আমরা আবার পাই মহাপুরাণ ও ১৮ খানা উপপুরাণ ও ১৮ খানা অতিপুরাণ। তবে তার প্রায়গুলিই মূল অষ্টাদশ পুরাণের ছায়া নিয়ে লেখা।

তবে পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ বা টিকাকারগণ বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণকেই সমধিক শ্রদ্ধা দিয়ে ঐ দুখানির টীকা প্রণয়নেই আনন্দ পেয়েছেন—পুরাণে অনেক অত্যুক্তি বা অলৌকিক কথা আছে—কিন্তু প্রকৃত ভাবে সেগুলো বুঝতে হলে আগে আমাদের প্রয়োজন সে যুগের সামাজিক বিধি নিয়ম, বিবাহাদি প্রসঙ্গে ন্যায়, অন্যায়, তখনকার শিক্ষা, দীক্ষা, কৃষ্টি, শিল্পের কথা জানা—সমাজ ও সংস্কৃতির আলোচনা করা।

সমাজ ও সংস্কৃতি

মানুষ তার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়ায় তার গতিপথে জন্মসংস্কার নিয়ে। তারপরই সে প্রথম জীবনেই সমাজ গড়ে, দেশ বসিয়ে, শিক্ষায় ও শালীনতায় মহিমময় হয়ে উঠলো—এ তো আর নয়। তার জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধন, মান, ঐশ্বর্য্য—জীবনের সম্পূর্ণ সত্তার বিকাশ হয় দিনে দিনে, যুগে যুগে। ধীরে ধীরে মহিমময় হয় তার সংস্কৃতি।

দেবতার সন্তানই যদি মানব, তবে তো মানব-সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই দেবত্বে সমাসীন। তারা তবে তো ভারতে একেবারে সভ্য, শিক্ষিত, বীর কৃষ্টিবান হয়েই এসেছে—কশ্যপের সন্তান মহাপ্লাবনের পর ভারতের বুকে এসে দাঁড়ালেও অসভ্যরূপে আসেনি।

অথচ তাদের আগেও নাকি হারাপ্পা মহেঞ্জোদাড়োর মাটিতে একদল লোক ছিল যাঁরা সভ্যতার চরম শিখরে উঠেছিল, আবার তাদের আগে নাকি অসভ্য ও বর্ব্বর ছিল ভারতে--নাগা, মুণ্ডা, কোল তার সাক্ষ্য—এমনই সব নানা প্রশ্ন যেন অতীত ইতিহাসকে রহস্যময় করে তোলে।

মনুর ছেলে মানব—জন্ম মাত্রই সভ্য, না ধীরে ধীরে সভ্য হ'ল—কে বলবে।

তবে পুরাণের পাতায় বিভিন্ন বার মন্বন্তর আর প্রলয়ের কাহিনী খানিকটা রহস্যকে বুঝি বা সামলে দেয়—

আবার বেদ বা অন্যান্য ইতিবৃত্তের বিশেষভাবে করা ব্যাখ্যায় যেন একটা উত্তরও খুঁজে পাই—যা আজকের ইতিহাসকে খণ্ডন করে না, —সমর্থনই করে।

তাছাড়া অতীত ইতিহাসকে খুঁজে বের করতে পারে শিলালেখ, বাস্তব নিদর্শন, প্রাচীন সাহিত্য বা লোকগাথা। কিন্তু পিরামিড থেকে সুরু করে মহেঞ্জদাড়োর বস্তু নিদর্শন, বা হিট্টি সংস্কৃতি থেকে অশোকের স্তূপ ও চৈত্য যে ইতিহাসের নজির দেখা যায় সে সব প্রমাণ আর কতদিনের ?

বেদের মাধ্যমে ভারতের ইতিহাস,– আর্যদের ইতিকথা তার চেয়েও প্রাচীন। সেই বেদ-মন্ত্র বিচার করলেই আমরা আমাদের আর্যবংশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সংস্কৃতি, সমাজ-কৃষ্টি ও সভ্যতার কথা জানতে পারবো। তারপর আসবে পুরাণ, শিলালেখ বা জড়-বস্তুর নিদর্শন।

প্রাচীন আর্য্য-সমাজ

যাযাবর—বেদের মন্ত্রের অর্থ ধরে আমরা অনুভব করতে পারি—প্রাচীন যে আর্য-সন্ততি তাদের অতীতের সব ঐশ্বর্য্য গৌরব, মহিমাকে প্লাবনের জলে ভাসিয়ে দিয়ে ভারতের গিরিশৃঙ্গে এসে দেখা দিল, পর্ব্বত বক্ষ থেকে নেমে এলো সিন্ধুর সমতলক্ষেত্রে, তাঁরা প্রথমে ছিলেন যাযাবর। তবে তার আগে—সৃষ্টির প্রথমে নরসৃষ্টির পূর্ব্বে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ যেমন হয়েছে, তেমনই হয়েছে অর্দ্ধমানব ও অর্দ্ধপশু নরসিংহ। তারপর দেখা দিয়েছে নররূপেই বামন অবতার আর শেষে পেলাম পরশু হস্তে প্রথম পরিপূর্ণ মানব—পরশুরাম তার প্রতীক। মানুষকে দেখলাম জঙ্গল কেটে চলেছে সে চলার পথে উপনিবেশ স্থাপন করতে।

এইভাবে বিচার করলেও আমরা পাই বেদেরই কথায়—মনুর সন্তান যেদিন প্রথম সৃষ্টির পর প্রথম উন্মেষে এসে দাঁড়িয়েছে চলার পথে—তখন তাঁদের স্থান স্বর্গে,—এ মাটির ধূলায় ভারতে নয়—তাঁরা তখন হয়েছে দেবতা। অতএব দেবতার বংশধর যেদিন ভারতে এল সেদিন তারা নরসিংহ নয়, বামন নয়, মধুকৈটভ নয়—মহিষাসুর নয়—একেবারে পরিপূর্ণ মানব। শিক্ষা দীক্ষা আছে বটে তবে ঘর নেই—বাসা নেই—অরণ্যে তাদের চলার পথই আশ্রয় ও আবাস।

"চরৈবেতি চরৈবেতি"—চলে চল, চলে চল—এইটি তাদের

প্রধান মন্ত্র। বেদের সূক্তগুলি দেখলে বুঝতে পারি, কী অপূর্ব্বভাবেই এই গতি-প্রাধান্য, যাযাবর আর্য্যদের মনে ঠাঁই নিয়েছিল। জগতে প্রত্যেকেই নিজ দেশ, জাতি ও ঈশ্বর নিয়ে তাদের গৌরবের নিশানা এঁকে রাখে। প্রাচীন আর্য্যরাও বোধ হয় সেই দেশ, জাতি ও ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের নামের সঙ্গে গতি-ধর্ম্মকে অটুট করে রেখেছে। দু-একটি শব্দেই তার উদাহরণ পাওয়া যায়।

অশ্ব কথাটি আর্য্যদের কাছে ছিল গতির প্রতীক। তাই আজ যেমন পুরুষ-সিংহ বলি, সেদিন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বলতেন সবাই—'অশ্ব বুদ্ধ্যান্' 'অশ্ববুদ্ধম্'—কারণ অশ্বের গতি ছিল যেন তাদের প্রাণ-গতির আদর্শ। ঋগ্বেদে প্রথম মণ্ডলে অশ্বের প্রতি স্তুতি-মন্ত্র তারই নিদর্শন। "হে অশ্ব ! যান বল, মানুষই বল আর পশুই বল সব তোমার পশ্চাতে থাকে--তোমার আবির্ভাবের পর। কামনাশীলের ঐশ্বর্য্যের উদ্ভব হয়।"

এখন এই 'অশ্ব' গতির প্রতীক বলেই তারা হয়তো স্বদেশের নাম রেখেছিল অশ্বীয়া। যা থেকে আজ পেয়েছি আমরা এশিয়া—যে দেশ সেই যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত জগতে শ্রেষ্ঠত্বে ও মহনীয়তায় গৌরবান্বিত।

জাতিতে তারা ছিল মনুষ্য বা মানব। মানবজীবনের দুটি প্রধান ধর্ম্ম—জীবন বা আয়ু ও মৃত্যু বা মরণ। আয়ুর গতি দীর্ঘ হোক—এই কামনাই ছিল জীবনের ধর্ম্ম। আয়ুর বহুবচন আয়ব। মানব ও আয়ব —একই শব্দ-পরিভাষা, মানুষ ও আয়ুকে এক গোত্রজ করেছে।

আবার ঋ ধাতুর অর্থ গতি। আর "মা" হল নিষেধ বা বাধা। সেই গতিতে যখন বাধা আসে তখন হয় মা+ঋ অর্থাৎ গতিতে বাধা অর্থাৎ—নেই তার গতি তাই মৃত্যু বা মরণ।—গতিশীল যে মানুষ, আয়ুস্ গতিরোধে তার মৃত্যু বা মরণ।

তারপর বুঝি গতিধর্ম্মকে দেখা যায় ধর্ম্ম বা সাধনায় ঈশ্বরে। ইন্ বা ই ধাতুও গতিবাচক। অধিক কিছু বোঝাতে গেলে তার দ্বিত্ব করা হয়। ইন্+ইন্ হলেন তিনি, যিনি গতির অধিকারী। 'গু' অর্থেও

শীঘ্রতা। ইন্+ইন্+শু এবং শ্ব বা 'ইর' অর্থেও গতি। তার মানে গতিতে শীঘ্রতা এনে যিনি শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছেন তিনি—ঈশ্বর ইন্+ইন্+শু+অর=ঈশ্বর। এই হ'ল ধর্ম্মের মাধ্যমে গতিশীলতার প্রকাশ।

তাহলেই বেদোক্ত শব্দ নিয়ে, বেদ-অভিধান যাস্কের নির্ঘণ্টু দেখে আমরা অনুভব করতে পারি যাযাবর আর্য্য সেদিন নিজদেশ, জাতি ও ধর্ম্মে গতিরই প্রাধান্য দিয়েছেন। এছাড়াও গতির প্রাধান্য দেখি 'গো' ধাতুগত সব শব্দে। তাদের প্রাধান্য ধন গো সম্পত্তি গো ধাতু থেকে, গতি নিয়ে যেখানে থাকে তারা সেই জগৎ—'গা' ধাতু থেকে, গণ বা গোত্রটিও ঐ 'গা' ধাতু থেকে। সেদিন দেশ, জাতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সম্পত্তি, দেবতা, ভুবন—সব কিছুতেই যেন তাদের ঐ গতির প্রকাশ। এই গতি নিয়ে তারা প্রথমে যাযাবর। তখন তাদের না আছে উপনিবেশ, না আছে গৃহ, না করে যজ্ঞ—ঘোরে শুধু জঙ্গলে।

এই জাঙ্গল-যুগে যাযাবরগণ যে দুটি প্রধান জিনিসের সন্ধান পেল, আজও জগৎ তাদের ভুলতে পারেনি। আজও জগতকে সমান ভাবেই তারা কল্যাণ দিয়েই আসছে। সেটি হ'ল আগুন ও পশু-পালন প্রথা। তারা আগুন দেখলো প্রথম প্রাকৃতিক বাজের মধ্যে। বাজ পরে আগুন জ্বলতে, আগুন জ্বলে ধ্বংশ করতো সব—এইটুকু তারা জানতো। অগ্নির রুদ্র রূপ দেবাসনেও তাদের মনে জেঁকে রইল। কিন্তু সেই অগ্নিকে নিজে সৃষ্টি করে দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য নিয়োগ করলেন আঙ্গীরস, যাকে আজও আমরা প্রবরের মধ্যে স্মরণ করি।

আগুনের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তারা পশু-পালনও করতো। গরুর দুধ, গাছের ফল আর কাঁচা মাংসে যারা জীবন ধারণ করতো। এখন তারা আগুনে মাংস পুড়িয়ে, চাল সিদ্ধ করে খেতে সুরু করলো। ঠিক এই ব্যাপারটা বেদে অন্যভাবে বলা হয়েছে। ঋগেদে আছে আর্য্য-গণের 'প্রজাপতি'—সৃষ্টির সময় বহু বার গর্ভপাতের পর যখন ভীত হলেন, তখন পশু-দুগ্ধে সৃষ্টি রক্ষিত হ'ল—জীবন এল ফিরে—তারপর এগারটি পশু অগ্নিদগ্ধ করে তিনি সৃষ্ট-জীবের খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন।

এই কাহিনীর মাধ্যমেই বুঝতে পারি যে জাঙ্গল-যুগে যাযাবররা যেদিন আগুনের সন্ধান পেল, যেদিন তারা পশু মাংস খেতে সুরু করলে, পশু চামড়ায় নগ্নদেহ ঢাকলে—পশু সংগ্রহে শীকার সুরু করলো, পশু সম্পত্তি নিয়েই পথে পথে ঘুরতে লাগলো– সেইদিন যেন যুগটা একটু পাল্‌টাবার পথে।

দেবযাজী—সেই সন্ধি যুগে—যাযাবর ভবঘুরের দল নব আবিষ্কৃত আগুনে যজ্ঞ সুরু করলো—পশু দিয়ে প্রজনন, দুগ্ধে হবি প্রকৃতির দেওয়া মাটিতে কৃষি সুরু করলো। দিকে দিকে 'বাস' স্থাপনের ব্যবস্থা করলো। তারপর হ'লো আশ্রমবাসী—তখন হ'ল সমাজ গঠন, উপনিবেশ স্থাপন। যারা এ উন্নতির পথে এগিয়ে এল, তাঁরা হলেন দেবযাজী। প্রকৃতিকে তারা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দেবজ্ঞানে পূজা করলেন, যজ্ঞে দেবতার তৃপ্তি সাধন করলেন—হবিদানও সেই উদ্দেশ্যে করা হলো—হলো হোতা বা গণপতি, ব্রহ্মা বা ধারক কিংবা নায়ক।

নহুষ– যারা তাতে রাজী নয়—তারা যাযাবরই রইল—তাদের অসুর নামই রয়ে গেল– সবাই তাদের বললে ওরা নহুষ।

যযাতি সেই সন্ধিযুগের প্রতীক। যাযাবর থেকে আর্য্যরা তখন আশ্রমবাসী হচ্ছে—দেবযাজী হচ্ছে, আর নহুষরা যযাতির কাছে মুক্তি পাচ্ছে এই যে পরিবর্ত্তন, এরই মধ্যে প্রকাণ্ড কাহিনী হয়ে যদু, তূর্বশ, অনু, দ্রুহ্যু ও পুরু থেকে পঞ্চ উপনিবেশের পত্তন হয়েছে।

এখন পুরাণের কাহিনীকে যদি বৈদিক সূক্ত-তত্ত্ব দিয়ে পরিষ্কার ক'রে —কল্পনার রংটুকু বাস্তবের রূঢ়তায় ঘুচিয়ে দিই তবে ঐ যযাতির নিকট পিতা নহুষের প্রেতাত্মার মুক্তি-কাহিনীতে পাই একটা যুক্তি।

'যা' ধাতুর সনন্ত বিপ্সাত্মকে গতির বিপরীত। অর্থেই যযাতি শব্দ। 'য' বা গতিতে যার এল বাধা সে যযাতি, অর্থাৎ যারা ছিল যাযাবর— সে হঠাৎ তার বৃত্তি রুদ্ধ করে যজ্ঞশীল হয়ে গৃহস্থাপনে ব্যস্ত হ'ল। এখন তাদের সুখ দেখে প্রাচীন যাযাবরের আত্মা চাইল নব পথের সৃষ্টিকর্ত্তা যজ্ঞশীল জাতির কাছে মুক্তি। নহুষ চায় যযাতির কাছে মুক্তি।

তারপর কাহিনীতে আছে, যযাতি পুত্রদের কাছে চায় আপন জরার বিনিময়ে যৌবন। শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে যযাতি যৌবন হারায়, কিন্তু পুত্র পুরু নিজের দেহে জরা নিয়ে পিতাকে দেয় যৌবন।

এ কাহিনীও একটু বিচার ক'রে দেখলে, বেদোক্ত সূক্তের ধাতুগত অর্থে দাঁড়ায় অন্যরূপ। যাযাবর বৃত্তি বা গতি ধর্ম্ম হারিয়ে ফেলাটা। প্রায় যৌবন হারাবারই সামিল হ'ল সংসার-ধর্ম্মী যযাতির কাছে। সে যেন স্থিতি চায় না, স্থিতি যেন জরাত্ব,--গতি যেন যৌবন। তাই সে যেন ফিরে যেতে চায় যৌবনে—যজ্ঞশীল যযাতি সংসারধর্ম্মী হয়েও যেন চায় আবার ফিরে যেতে ঐ যাবাবর ধর্ম্মে- প্রকৃতির কোলে ছুটে ছুটে বেড়াতে। এই যে মন-টানাটানি এইটাই যযাতি-উপাখ্যান।

ছেলে পুরু স্থবিরত্ব নিল, অর্থাৎ পুরোপুরি যজ্ঞশীল, স্থিতিশীল হলো কিন্তু পিতা যযাতি নিল আবার যাযাবর বৃত্তি—অন্য ছেলেরাও তাই। অবশ্য ছেলেরা পরে আবার যজ্ঞশীল যা যযাতি-ধর্ম্মী হয়।

ঋগ্বেদে চতুর্থ মণ্ডলে একথা আছে—তুর্বশ ও যদু স্নাতক না হলেও বিদ্বান শচীপতি তাদের উদ্ধার করেন। তুর্বশগণ পুরোডাস দ্বারা যজ্ঞ করেন। অর্থাৎ শেষে আবার তারা যজ্ঞশীল হ'ন। যাস্ক নির্ঘণ্টুতে— পুরু, যদু, তুর্বশ, অনু, ও দ্রুহ্যু এই পাঁচটি শব্দই মনুষ্যবাচক। মানুষের পাঁচটি সম্প্রদায়। 'পঞ্চ'—এই সম্প্রদায়ভুক্ত পঞ্চ গণ থেকেই উদ্ভূত।

এমনই গণ সৃষ্টি ক'রে তাদের মধ্যে একজনকে গণপতি ক'রে সেদিন নতুন সমাজ সুরু হ'ল। তারা নতুন সম্প্রদায় গড়লো—যজ্ঞ সুরু করলো, কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করলো, উপনিবেশ বসালো—শাসন-দণ্ডের ব্যবস্থা করলো। সবই পাই বেদে।

প্রথম মণ্ডলে আঙ্গিরসের মুখে মায়ি এবং ২য় মণ্ডলে ঋষি গৃৎসমদের মুখে পণীদের নাম শুনতে পাই। বারবার বলেছে বেদ যে পণীরা অরণী কাষ্ঠে আগুন না জ্বালিয়ে-পাথর ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে থাকে—সাগর বক্ষে অর্ণব পোতে ব্যবসাবাণিজ্য করে বেড়ায়।

এই ভাবে আমরা মনুসংহিতায় যে সব জাতির উল্লেখ দেখি সেই

পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত দরদ বা খশ জাতিরাও ঐ 'নহুষ' বা নাস্তিক যাযাবর দলেরই ক্রমবিকাশ। যাঁরা যজ্ঞাদি নিয়ে রইলেন—তাঁদের বংশধররাও অবশ্য গেলেন বাইরে এবং ধীরে ধীরে হয়তো ঐ কিরাতরাই কিলাট বা কেল্ট হলেন,আঙ্গিরসের গোত্রজ যাযাবর দল আঙ্গিলস বা ইঙ্গলিস বা ইংলিশও যদুগণ 'যুট হলেন অনুবংশ থেকে হ'ল হুনদের সৃষ্টি। গোত্রের সব নাম নিয়েই হয়তো তাঁরা সাগর পারে দেশ বসালেন। বর্ত্তনি বা ব্রিটেন, আর্য্যভূমি বা আয়রল্যাণ্ড, শর্ম্মন বা জর্ম্মন দেশ, হুন-গৃহ থেকে হুন-গৌর বা হঙ্গেরী। এমন কি বেদোক্ত সূক্তে হরিয়ুপীয়াই যে ইউরোপ— এ বিষয়েও যেন অনেকে স্থির। ঋগ্বেদে ভরদ্বাজ ঋষি বলছেন—'বৃচিবতো যৎ হরিয়ুপীয়ায়াং.... .

এ দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যাযাবর বৃত্তি ও যজ্ঞ—কৃষি বৃত্তির যে সন্ধি-যুগ—সেই যুগেই বহু আর্য্য-বংশধর সাগর পারে আর এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়লেন। আজ তারা বিদেশী, বিধর্ম্মী বিজাতি।

মহান ভারতে যাঁরা রইলেন আমরা তাদের কথা নিয়েই মহান ভারতের আলোচনা করবো।

যাযাবর যুগে তাঁরা যে রণপ্রিয়তা, দেহের বলিষ্ঠতা বা গতির ক্ষিপ্রতায় —পশুবধের প্রথা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করত, বৈদিক যুগে তাই ধর্ম্মের পথে দেখা দিল। রণ তখন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হ'লো, হ'লো রণক্ষেত্রেই বেদান্তের চর্চা, দেহের বলিষ্ঠতার জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রত হল পুণ্য, গতির পরিবর্ত্তে স্থিতিশীলতা প্রভৃতি সুরু হলো—আশ্রম হ'ল, গৃহ হ'ল, কৃষি হ'লো—আর হ'লো যজ্ঞ, উৎপাদন বা প্রজনন।

বৈদিক যুগ—এই সময়টা থেকেই পূর্ণ বৈদিক যুগ সুরু। যজ্ঞ তাদের প্রধান ধর্ম্ম, কৃষি হল প্রধান কর্ম্ম। আশ্রম, উপনিবেশ স্থাপন, জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম বিভাগ—শিল্প, শিক্ষা, সমিতি, সমাজ—সব সুরু হ'ল এই যুগে—পরিণতি তার পৌরাণিক যুগে।

বৈদিক যুগের প্রধান সম্পদই এই অগ্নি—কারণ তাইতো তাঁদের

মহান আবিষ্কার। সমাজের শ্রেষ্ঠ দ্রব্য বলেই অগ্নির নাম রাখলেন 'বিশপতি'—বিশ মানেই বস্তী বা মণ্ডলী। শুধু আগুন নয়, হাড় দিয়ে অস্ত্র তৈরী হ'ল—প্রমাণ দধীচির অস্থি, অগ্নি জ্বালিয়ে বিনাশ সুরু হ'ল বজ্র তার প্রতীক।

সাম্য সংঘ—যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে স্থিতিশীল হবার জন্য যাঁরা এগুলেন, প্রথমেই তাঁরা রাজা, শাসক বা শাসন গড়ে তুলতে পারলেন না। তাঁরা একটা সংঘ বা গোত্র তৈরী করলেন। এক এক দল, এক এক গোত্র নাম নিয়ে এক এক দিকে, এক এক যজ্ঞবেদী বসালেন ও যজ্ঞ করে লোক সংগ্রহ করে তাঁরা নতুন দেশের সন্ধানে ছুটতেন বটে, কিন্তু গোত্রের, সবাই ঐ যজ্ঞে একত্রে সাম্য ভাবে, সমান ভাগে, সমান ব্যবহারে খাওয়া-দাওয়া সব করতেন। তাই যাযাবর বৃত্তির পরই দেখি গণতন্ত্র বা সাম্য সংঘভুক্ত নূতন সমাজের সৃষ্টি।

বৈদিক সাহিত্যেরও সেই অংশে দেবতার পূজাপার্ব্বণ ছিল না, ছিল না রাজা বা রাজ্য-শাসন। মনে হয় সে সব তখন আসেই নি—শুধু যজ্ঞ ও সাম্য সংঘের গণতান্ত্রিক কথাতেই যেন দেশ ভরা।

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে একদিন ভীষ্মদেব বলেছিলেন—

"ন বৈ রাজ্যং ন রাজ্যংসীবনদ্ধস্তান দণ্ডিকঃ
ধর্ম্মেনৈব প্রজা সর্ব্বারক্ষাংতি স্ম পরস্পরম্।"

কেউ রাজা ছিল না, কোন রাজ্য ছিল না, দণ্ডদাতা ছিল না, ছিল না কোন দণ্ডিত ব্যক্তি—কেবল আপন আপন অস্তিত্বের নিয়ম নিয়ে একজন আর একজনকে রক্ষা করতেন। প্রধান অনুষ্ঠানই ছিল যজ্ঞ।

এই যজ্ঞ কি আর কি ক'রে তার সৃষ্টি হ'ল—এনিয়ে একটা গল্প পাই আমরা বেদের—'ত্রিরাত্র-ক্রতু'র গল্পে।

গল্পটা এই যে—প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে যে দেবগণ সৃষ্টি করলেন—তাঁরা তিনটি সংঘেরঅধিপতি।

এই যে ব্রহ্মা ইনি ব্রহ্ম নন, আর হয়তো ব্রহ্মাও নন। পৌরাণিক ব্রহ্মা, হয়তো ছিলেন একজন প্রজাপতি - অর্থাৎ সংঘের নেতা। নেতা

সংঘটাকে তিন ভাগ করে দিলেন। তিন ভাগের তিন নায়ক বা দেবতা হলেন—বসু, রুদ্র ও আদিত্য। এ আদিত্য সূর্য্য নয়, ঐ রুদ্রও মহাদেব নন—তিনটি দলই হয়তো ঐ নাম পেলেন তাঁরা হলেন 'গণ।'

প্রজাপতি তিন গণকে তিনটি অগ্নি দিয়ে পূজা করতে বললেন।

অগ্নি মানে ঠাকুর নয়—অগ্নি মানে অগ্নিস্থালীতে যজ্ঞের আগুন। গল্প বললে, তাঁরা আগুনের সাধনা করে পেলেন একটি গরু।

সংঘপতি—সংঘে গণের পোষণের জন্য দিলেন অগ্নি আর পশু।

গল্পে—প্রজাপতি প্রথমে ঐ একটি মাত্র গরু দিলেন বসুগণকে। বসুগণ ঐ একটি গরু থেকে ৩৩৩টি গরু উৎপাদন করলেন। তখন প্রজাপতি প্রথম গরুটি ফিরিয়ে নিয়ে দিলেন রুদ্রগণকে। তাঁরাও তৈরী করলেন ৩৩৩টি গরু। প্রজাপতি আবার সেই প্রথম গরুটি দিলেন আদিত্যগণকে—তাঁরাও প্রজনন মাধ্যমে করলেন ৩৩৩টি গরু। মোট ৯৯৯টি আর মূল গরু একটি—এই হাজার গরু নিয়ে তিনটি গণ বা সাম্য সংঘ এগিয়ে চলেন গণতন্ত্রের ধর্ম্ম আচরণে। সংঘের যজ্ঞই হলো ধর্ম্ম—ঐ পশু পালনই হলো কর্ম্ম।

এই যে যজ্ঞ—একে তখন বলা হত সত্র। যতদিন যজ্ঞ ছিল সমাজকে পালন করার নীতি নিয়ে ততদিন সে ছিল সত্র-যজ্ঞ। যেদিন তা হয়ে দাঁড়াল শুধু ধর্ম্ম—তখন শুধু যজ্ঞ নামই হ'ল তার পরিচয়।

প্রথম দিকে 'সত্র'তে সবাই যারা সম্মিলিত হতেন—সেই গণসংঘের লোককে বলা হ'ত ঋত্বিজ বা যজমান।

সত্রতে যজ্ঞফল সমান ভাবে পেত সবাই। শ্রমে বা ফল লাভে ভেদাভেদ ছিল না। সোমযাগ বা অগ্নিষ্টোমে সোমরসের পাত্র 'সমাখ্যা' থেকে সমান ভাগে সবাই সোম রস পান করতো আর ঐ সূত্রে যারা আসতো—তারাই হত এক গোত্র। শ্রেষ্ঠ একটি লোককে সবাই মিলে করতেন গোত্রপতি।

এই গোত্রপতি বা গোত্র শ্রেষ্ঠই হয়তো পেতেন ব্রহ্মার

পদ। ইনিই হতেন যজ্ঞের জন্য নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যিনি যজ্ঞের সব দেখা শোনা করবেন, আর তিনিই হলেন ব্রহ্মা।

উপনিষদের ব্রহ্ম হলেন নির্গুণ, যোগ সাধনে ধ্যেয়—কিন্তু বেদোক্ত এই ব্রহ্মা যেন সগুণ ও কর্ম্মকাণ্ডেরই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

সাম্য সংঘে এই যজ্ঞের ছিল বিরাট আয়োজন। সংঘের সবাই এক সঙ্গে থাকতেন এক জায়গায়—নিজেদের পশু সম্পত্তি নিয়ে।

জায়গাটা হয় তো হিংস্র পশুদের হিংসা থেকে রক্ষা করবার জন্য বড় বড় পাথর দিয়ে ঘেরা হ'তো। বড় বড় বস্তী গড়ে উঠতো এই পাথর-ঘেরা জায়গার মধ্যে—নাম তার "অশ্মব্রজ"। 'সমিধ' বা জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ ক'রে রাখতো তারা। প্রায় ৪৮×৩৬ ফিট লম্বা চওড়া হ'ত সেই হোমকুণ্ড। পাশেই থাকতো একটা ভাণ্ডার,—দুধ, দই, ঘি, চাল ও শস্যে ভরা। অন্যত্র সোমরস তৈরী করার জন্য থাকত সোমলতা ও অন্যান্য উপকরণ। চারিপাশে ছোট ছোট 'চত্বল' বা 'চৌতারা' তৈরী, আর মাঝখানে ১০৮ ফিট লম্বা ও ৯০ ফিট চওড়া এক বেদী তৈরী হ'তো সকলের বসবার জন্য। হোতা সকালবেলা থেকেই সবাইকে ডাকতেন যজ্ঞে মিলিত হতে। তাঁরা সকলে এক এক কাজের ভার নিতেন মাথায় বস্ত্র বা ঘাসের উষ্ণীষ বেঁধে। কেউ সংগ্রহ করতেন সমিধ, 'দুহিতা' গোদুগ্ধ দোহন করতেন, 'শমিতা' করতেন মাংস তৈরী। লোহার অস্ত্র না থাকায় ঘোড়ার হাড় থেকে মাংস কাটার অস্ত্র তৈরী হতো। উদ্‌গাতারা গাইতেন গান। যজ্ঞে হবি দান হ'তো দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য। তারপর মহাবেদীতে সবাই মিলে সেই হবি দুগ্ধ, সোমরস, মাংসাদি খেতেন—সবাই সমান ভাগে, সমান ভাবে। মনে হয় তখন এই আগুনেই 'পুরোডাস' বা রুটি তৈরী করা হতো সকলের জন্য এক সঙ্গে।

মাপ ক'রে আহার দিতেন যিনি, অথবা প্রজননের ব্যবস্থা করতেন যিনি তিনি ('মা' অর্থ মাপা+ত্রু) মাতা, শিকার বা পো অর্থে সুরক্ষা করতেন যিনি তিনি 'পিতা'—মণ্ডলী বা বস্তীবাসী হতেন 'স্তয়ী'—

দম্পতি হলেন 'পুস্ত্য' এবং তা থেকে পৃথকভাবে হলো 'পতি' ও 'স্ত্রী'।

সে যুগে যজ্ঞই ছিল প্রধান কর্ম্ম। যে আগুন ছিল তার প্রধান উপকরণ—আজ তা এসে দেশালাই বাক্সে বা ইলেকট্রিকে ঠাঁই নিয়েছে। আজ অস্ত্র হয়েছে নানা—জানা হয়েছে জীবন যাত্রার নানা পথ, তাই সেদিনের সত্র-যজ্ঞ আজ শুধু যজ্ঞ—সংসারে গৃহীর কর্ম্ম হয়েছে, আশ্রমে ঋষি সাধনায় হয়েছে ধর্ম্মের অঙ্গ। কর্ম্মকাণ্ডের একটা বিরাট অনুষ্ঠান ধর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছে। শুধু আহুতি বা সত্রকার্য্য ছাড়াও যজ্ঞের মানে করেন অনেকে অন্যভাবে। তাঁরা বলেন যজ্ঞ একটি শব্দ নয়—বাক্য। য+জ+ন নিয়ে হলো যজ্ঞ। য অর্থে যাওয়া বা গতি, জ অর্থে জন্মান বা প্রজনন আর ন প্রত্যয় দ্বারা অন বা অন্তের ন্যায় অন্য পুরুষগণ বোঝায়। এইভাবে যজ্ঞ কথাটি সাক্ষ্য দেয়—সবাই মিলে একত্রে গতি বা প্রজনন করা অর্থাৎ নিজ সংঘকে বলশালী করা।

বৈদিক যুগের এই যজ্ঞশীল জাতি পৌরাণিক যুগের কোঠায় এসে রাজ্য, প্রজা, নগর, রাজধানী, শম, দম, দণ্ড ও শাসন, বা ব্যসন সুরু করলো বটে কিন্তু দেবপূজায়, গণসেবায়, গণপতিকে সামনে করে রাখলেনই। আর তারই প্রমাণ সর্ব্বাগ্রে গণপতির পূজা। রূপ নেই তার, রাজ্য বা ব্যক্তিরূপে শুধু বলশালী হস্তীর অবয়ব, তেজস্কর অগ্নির রং, চতুর্দ্দিকের শক্তি আহরণে চতুর্ভুজ—শক্তিজাত গণের ঈশ বা শ্রেষ্ঠ গণপতি।

গণ-প্রচলনে ও গণ বা সম্প্রদায় অনুসারে বিভিন্ন সমাজ ও দেশের সৃষ্টি আমরা পাই পুরাণের কয়েকটি গল্পে।

যাযাবর যুগের পর স্থিতিশীল যুগের প্রতীক যে যযাতি, সে প্রথমে স্থিতিশীল হয়েই গণকে পাঁচভাগে ভাগ করলেন। নিজ সন্তানের পরিচয়ে—যদু, তুর্ব্বশ, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু এদের দ্বারাই হলো যাদবগণ, তুর্ব্বশুগণ, দ্রুহ্যগণ, আনবগণ ও পৌরবগণ। আবার এমনই এক বিভাগ দেখি বলি পত্নীর গর্ভজাত দীর্ঘতমা ঋষির পাঁচসন্তানের বিভাগে—

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম। এই গণ বিভাগই যেন রাজসত্তা বা রাজতন্ত্রের প্রথম উন্মেষ। নইলে আগে সব কিছু ছিল সকলের। সবই ছিল সমান—তাই নাম হল সমিতি। এমন কি জাত কুলও হয়নি তখন পৃথক।

"জাত্যাচ সদৃশা সর্বে কুলেন সদৃশাস্তথা
নহি বিত্তেষু প্রভুত্বং জায়তে কস্যচিত্তদা।"

তারপর সেই গণতন্ত্রে প্রথমেই বুঝি এল বর্ণবিভাগ। আর সেটা শুধু শ্রম-বিভাগ নিয়ে। লোক বেশী হলো—প্রজনন সুরু হলো, হলো যজ্ঞ, মৃগয়া, কৃষি ও অন্যান্য সেবা কার্য্য। তাই হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তারপর ধীরে ধীরে চার বর্ণের জন্য নানা কাজের হলো ভাগ।

আর তারপর এল প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যের প্রশ্ন—তা থেকেই বুঝি দেখা দিল প্রথম গণপতি। তারপর রাজসভা, শাসনতন্ত্র, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যজয় বা সাম্রাজ্য স্থাপন। কেমন করে তা হলো?

যত সাম্যভাব নিয়ে লোকের পর লোক এক জায়গায় থাকুক—একদিন স্থানের হবে অকুলান, তারা অন্য জায়গায় ছুটবেই—তাই হবে নূতন উপনিবেশ। সবাই তো যাবে না, যাবে এক একটা দল—আর যেখানে যাবে সেখানে থাকতো যারা—তারা উঠবে গর্জে, দেবে বাধা, হবে সংঘর্ষ, ছোটখাট যুদ্ধ। জয়ী হবে যারা তাদের একটু বিজয়ের মোহ আসবেই, হবে গণতান্ত্রিক ভাব চঞ্চল, তারা নিজেদের মনের মতন নিয়ম করবে—হবে নতুন শাসন—নতুন নীতি—নতুন রীতি।

অগ্নিষ্টোম—নতুন দেশ ও উপনিবেশের জন্য এই যে যাত্রা তার সময়টা সাধারণতঃ নির্ব্বাচিত হ'ত বসন্ত কাল—যখন প্রকৃতি হত সৌন্দর্য্যময়ী—পথ হ'ত সুগম, পশু দিত সন্তান—বৃক্ষ দিত ফুল, ফল, শোভা। সেই সময় যূথবদ্ধ গণ থেকে একদল লোক বেরিয়ে পড়তো নতুন দেশের সন্ধানে, আর তারই নাম অগ্নিষ্টোম। তিথিটি হতো পূর্ণিমা বা অমাবস্যা। অমাবস্যার পরই রাতের পথ

হবে চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল, পূর্ণিমার পর কিছুদিন থাকবে উজ্জ্বল। ঋত্বিজ এসে প্রথমেই নির্দ্দিষ্ট করে দেয় কে বা কারা কোন গণ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে নূতনতর গণ-সংগঠনে বা নিবেশ-স্থাপনে। যারা যাবে চ'লে, তাদের দিত গণসঙ্ঘ নতুন কাপড়, মালা, চন্দন এবং সর্বশেষে দীক্ষা বা মন্ত্রোপদেশ। সঙ্গে দিতে গৃহস্থালীর নূতন দ্রব্য সামগ্রী—আসব অন্ন, বস্ত্র, বাসন সব গো-শকটে, সঙ্গে দেওয়া হতো গরু বা অন্য পশু। অন্য শকটে দেওয়া হতো 'অগ্নি'—নূতন উপনিবেশ স্থাপনের জন্য।

তারপর চলতো যাগ, হবন, উৎসব, ভোজ—এবং সর্ব্বশেষে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে মিলে—নূতন জায়গায় নূতন জীবনে তারা থাকবে পবিত্র—এই প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়ে পড়তো অজানার উদ্দেশ্যে, অস্ত্রাদিতে পূর্ণভাবে সজ্জিত হ'য়ে।

নিয়ম ছিল—একদিন পরে যেখানে পৌঁছুবে সেখানে তারা বিশ্রাম নেবেই—কারণ সেখানে তারা স্থির করে নিত কোন দিকে কি ভাবে তারা এগুবে।

ষড়রাত্র—নতুন জায়গায় অগ্নিস্থাপন করে তারা ষড়রাত্র বা সারস্বত সত্র পালন করতো। তারপর নূতন সমীদণ্ডে আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে পুরোভাগে সেই জ্বলন্ত অগ্নিদণ্ড হাতে দিয়ে এক এক গণকে এক এক দিকে পাঠাতে থাকতেন।

তখন এক এক দল এক এক দিকে এগিয়ে যেত—পথে বাধা দিত সেই স্থানের অনার্য্য, অসভ্য দস্যুর দল—হ'তো সংঘর্ষ। জয়ের পর বিজয় উৎসব হতো। পরাজিত দলকে এনে করতো আবার যজ্ঞ—নূতন উপনিবেশ, নূতন ভাবে নিজেদের অগ্নিস্থাপন ক'রে।

ব্রাত্যস্তোম—বিজিত লোকদের মধ্যে যারা তাদের গণে থাকতে চাইত বা থাকবার উপযুক্ত মনে হতো—তাদের ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ ক'রে দলভুক্ত করা হতো—আর মেয়েদের গণের 'গণিকা' ক'রে দলভুক্ত করা হ'তো।

অশ্বমেধ—এই পরিক্রমায় যে ঘোড়াটি থাকতো আগে—

উপনিবেশ স্থাপনের পর অনুষ্ঠিত যজ্ঞে সেই ঘোড়াটিকে যূপকাষ্ঠে বেঁধে হতো উৎসব। সুরা ও মাংস ভোজনের পর নর নারী একত্রে করতো নৃত্য।

তারপর সেই অশ্বকে স্নানাদি করিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বলিদান করে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হ'তো।

ব্রহ্মমেধ—আর এক যজ্ঞ হ'তো ব্রহ্মমেধ বা **পুরুষমেধ**। যারা সে সংঘর্ষে মারা যেত—তাদের যেমন হ'তো অগ্নি সংস্কার বা ব্রহ্মমেধ, তেমনই পরাজিত পুরুষদের যূপকাষ্ঠে বেঁধে আবার হ'তো উৎসব এবং বলির মতনই সব ব্যবস্থা হ'তো। অতি আদিম যুগে হয়তো বিজিতদের হত্যাই করা হ'তো, কিন্তু পরে যজ্ঞোৎসবের পর নরহত্যা না ক'রে যারা গণভুক্ত হতে চাইত তাদের ব্রাত্যস্তোমে নিজেদের করে নিতো। যারা তা চাইত না তাদের দল থেকে দূরে বিতাড়িত করে দেওয়া হ'তো অথবা বিজিত সে দস্যু—অনার্য্যদের তারা করে নিত দাস—সেটাই হ'তো মানবতার চরম হত্যা।

তারপর লুণ্ঠিত, বিজীত বা প্রাপ্ত যাবতীয় দ্রব্য, খাদ্য বা অস্ত্রাদি তারা সকলের মধ্যে ভাগ ক'রে নিত—যজ্ঞের সেই প্রথাটিই হ'তো 'দান।' দক্ষিণা বা দানরূপে প্রাপ্ত দ্রব্যের বণ্টন ছিল যজ্ঞের শেষ ফল।

এই ভাবে নূতন স্থানে নূতন উপনিবেশ স্থাপন ক'রে—তাঁরা নূতন গোত্র নূতন প্রবরের প্রতিষ্ঠা করতেন। ক্রমে যাঁরা সিন্ধুদেশ থেকে শিবালিকা পার হয়ে—ব্রহ্মর্ষিদেশে, ব্রহ্মাবর্ত্তে, আর্যাবর্ত্তে, দাক্ষিণাত্যে, এবং সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়লো, আর পরে দেশ বিদেশে ছড়িয়েপড়ে তাঁরা সমাজ বাঁধতে সুরু করলেন।

সামাজিক জীবনের প্রধান বন্ধন যে বিবাহ, মানুষের দল তখনও কিন্তু সেই বন্ধন মানলো না, কোন নীতি বা রীতি তাদের কোন ঘরের কোণে ধরে রাখতে পারলো না—কোন আচার ব্যবহারের সংস্কার তাদের করলো না উন্নত। তাই প্রথম যুগের মানুষ তখন বিবাহকে

কোন আইনের কোঠায় ফেলেনি। তারা দৈহিক-বৃত্তি পূরণের জন্যই আহারাদির মতনই করতো স্ত্রী সম্ভোগ।

মনে হয় প্রথম যুগে মাতা পুত্র, ভ্রাতা, ভগ্নী কারও মধ্যেই যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হ'তে বাধা হতো না—তখনই দুটি মাত্র জন—নর ও নারী—পুরুষ ও স্ত্রী। আদিম মানবের মধ্যে যে পশু-প্রবৃত্তির সাড়া দিত নারী সম্ভোগ বা যৌন আচার ছিল তারই একটা দিক।

কিন্তু সমাজ বাঁধতে গিয়ে হয়তো তাদের মনে হয়েছিল পিতা ও কন্যা, পুত্র ও মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যে বিবাহ অসম্ভব। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস বা বৈদিক ও পৌরাণিক ইতিকথায় সে সব বিবাহেরও নজীর দেখা যায়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে— মূল প্রজাপতি সৃষ্টির সময় নিজ কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। বায়ু বা মৎস্য পুরাণেও একথা বর্ণিত। এ ছাড়া হরিবংশেও বশিষ্ঠ প্রজাপতি কন্যা শতরূপাকে পত্নী করেন। অন্যত্র মনু ইলা বা ইড়াকে বিবাহ করে আবার জহ্নু কন্যা জাহ্নবীকে স্ত্রী করেন। তাছাড়া—ঐ হরি বংশেই আছে দশম প্রচেতার পুত্র সোম। সোমের মেয়ে মরীষা। পিতামহ দশমপ্রচেতা ও পিতা সোম সকলে ঐ মরীষার সঙ্গে যৌন সম্বন্ধ করায় দক্ষ নামে যে পুত্র জন্মায়—তাঁর যে সাতাশটি মেয়ে হয়, তাদের আবার সোমের সঙ্গেই দেন বিবাহ! এই দক্ষ আবার অন্যত্র ব্রহ্মার পুত্র এবং দক্ষ-কন্যার গর্ভে ব্রহ্মার ঔরসে হয় নারদের জন্ম। হয়তো এর মধ্যে অনেক কল্পনা আছে—আছে কাহিনীর বৈচিত্র্য, কিন্তু এটা ঠিকই যে তখনকার সমাজে বিবাহের কোন গোত্র, জাতি বা সম্পর্কের বাঁধন ছিল না—আর ছিল না বলেই ব্যভিচার দোষে তা কলঙ্কিত হতো না। আর তাই সে কল্পনা সম্ভব হয়েছে।

জন্মেজয় যখন পুরাণের সব কাহিনী শোনেন বৈশম্পায়ন বা ব্যাসের কাছে, তখন তিনি এইসব বিবাহের কথা শুনে একটু বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন—এ অনাচার কি সম্ভব?

উত্তরে ব্যাসদেব বলেছিলেন, ইতিহাসে সৃষ্টির এ ধারা সত্য বলেই মানতে হবে!

শুধু পুরাণ নয়—বেদেও এমন ঘটনা তো কম নেই!

ঋগ্বেদে আছে যম ও যমী দুই ভাই বোন। যমী চায় যমের প্রণয়, যম নারাজ—বিরোধ হয় এই ভয়ে যে বরুণ ক্রুদ্ধ হবেন।

এর অর্থ—তখন এ বিবাহ চলতো বটে কিন্তু আপত্তি দেখা দিয়েছে। তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণে আছে প্রজাপতির মেয়ে সীতা-সাবিত্রী। সে নিজের ভাই সোমের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী। কিন্তু সোম অন্য বোন শ্রদ্ধাকে চায়। পিতার নির্দ্দেশে সোম সীতা-সাবিত্রীরই পতি হয়। পুরাণের সীতা বা সাবিত্রী তখনও কিন্তু হয় নি অথচ ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ-প্রথা তখনই প্রচলিত। তাছাড়া পৌরাণিক যুগে ৬০ জন ছিলেন দক্ষ-কন্যা। দক্ষ-ভ্রাতা ধর্ম্মের বিবাহ হয় দশ জনার সঙ্গে। মরীচী পুত্র কশ্যপ করেন বিবাহ খুড়তুতো বোনদের ১৩টিকে এইভাবে।

বৈদিক বা পৌরাণিক যুগের বহুপূর্বে এ সব গোত্র-বিবাহে কোন বাধা ছিল না। এমন কি বিবাহিত-পত্নী বা নিজের মাতার সঙ্গে অন্যের সহবাসেও সে যুগে কেউ ব্যাভিচারের অনাচার অনুভব করে নি। স্ত্রীলোক হলে ভোগ করা যেন খেলার মতই একটা ব্যাপার ছিল। পুরাণে পাই সে ব্যাপারটা প্রথম ঘোচালেন—উদ্দালক। একদিন ছেলে আর পিতা শ্বেতকেতু মার কাছে বসে। অন্য এক ঋষি এসে পিতার সামনেই মাকে নিয়ে গেলেন চলে। ছেলে প্রশ্ন করলেন বাপকে—এ মাতৃহরণ কেন? পিতা বললেন, এমনই হয়। সমাজে এই আচার চলে। নারী সকলের। পুত্র সহ্য করলেন না, নিজের সাধনায় সব দেবতা, ঋষি, রাজা, প্রজা সকলের মতে বিবাহ-অনুষ্ঠান প্রচলন করলেন—সেদিন থেকেই সমাজে স্বামী ও স্ত্রীর বন্ধনের এই প্রথা চলে আসছে, স্বামী ও স্ত্রী সমাজের যোগ্য মর্য্যাদা সেইদিন থেকেই পেয়েছে। 'গণিকা' নামে পত্নীত্ব নিয়ে যারা থাকতো এক বা বহুর হয়ে, অথবা যখন ধীরে ধীরে এক এক জন এক এক জন গণিকাকে খানিকটা স্বাতন্ত্র্য নিয়ে নিজের সঙ্গে রাখত—সুসংবদ্ধ বিবাহ প্রথার পর সেই গণিকার দলই রইলো দূরে—হলো উপেক্ষিতা।

তাইতো সর্ব্বপ্রথম যে গণ-বিভাগ হয়েছিল, পিতৃ-পরিচয়ের স্থির না থাকায় তা হ'লো মাতার নামে। মহাভারতে আছে ১৮টি গণের নাম— আর মাতার নাম থেকেই তাদের নামকরণ। অদিতি থেকে আদিত্যগণ, দিতি থেকে দৈত্যগণ, দনু থেকে দানব, কাল থেকে কালকেয়। সেই ভাবেই বিনতা—বৈনতেয়, কদ্রু—কদ্রুবেয়, মুনি—মৌনেয়, প্রাধা থেকে প্রাধেয়। কপিলা—কাপিল, কৃত্তিকা—কার্ত্তিকেয়, সিংহিকা—সৈংহিকেয়, পুলোম—পৌলমেয়, বসু—বাসব, বিশ্বা—বিশ্ব, মরুমতি—মরুমন্ত, ভানু—ভানব, মুহূর্ত্ত—মৌহূর্ত্তেয়, সধ্যা—সাধ্য। এই আটাশটি গণই সেদিন প্রথম দিকে ছুটলো সাম্যবাদের মন্ত্র নিয়েও—স্বাতন্ত্র্যের মোহে—নূতন উপনিবেশ বা ভূখণ্ডের জন্য।

বিভিন্ন দেশে গিয়ে গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে হলো তাদের বিভিন্ন বর্ণ—হলো বিভিন্ন গোত্র, গোত্র থেকে প্রবর। আর গোত্রজ সন্তানের কিন্তু মায়ের নামে পরিচয়ের গৌরব রইল বহুদিন পর্য্যন্ত এই ভারতের বুকে।

বিবাহের প্রথা একটা হলেও পুরোপুরি তা তখন সকলে মানতো দেশ, কাল, বা পাত্র ভেদে। তাই নিয়োগ বা গান্ধর্ব্বাদি নানা প্রকারের বিবাহ সেদিন প্রচলিত ছিল। পাণ্ডুর ছিল রোগ, তাই কুন্তী অসম্মত হওয়ায় পাণ্ডুই তাকে বলে দেন—এ বিধি অন্যায় নয়। কৌরব বংশের পূর্ব্বজ বিচিত্রবীর্য্য নিজের পত্নীতে ব্যাসদেবকে নিয়োগ করেন। বলিরাজার স্ত্রীতে দীর্ঘতমা ঋষির নিয়োগ বা শরদাণ্ডায়নের পত্নীতে অজ্ঞাত এক পথিকের নিয়োগ পুরাণের এবং বিখ্যাত নীল বংশের এক এক বিচিত্র ঐতিহাসিক কাহিনী। আর সম্ভবত এই সব কারণে কাল ও পাত্র বিবেচনা করেই যাজ্ঞবল্ক্য বিধি দিয়েছিলেন—

"ব্যাভিচারাৎ ঋতৌশুদ্ধিঃ গর্ভ-ত্যাগো।বধিয়তে"

ব্যাভিচারে অপবিত্রা নারী ঋতু অন্তে বা গর্ভত্যাগেই শুদ্ধ হয়।

এটা নিছক আদিম ব্যবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান ব্যবস্থার একটা রক্ষা মাত্র।

এর পরও আমরা অন্যান্য প্রকার বিবাহ পাই—

(১) বহু পত্নীত্ব, যেমন—কৃষ্ণ দশরথাদি বহু নৃপতিং।

(২) বহু পতিত্ব, যেমন - দ্রৌপদীর বহু পতিত্ব।

(৩) গন্ধর্ব্ব বিবাহ—গোত্র বা বংশের বিচারহীন বিবাহ, যেমন—মেনকা, শকুন্তলা-দুষ্মন্ত, জরুকার-মনসা।

সাময়িক যুগ্ম বিবাহ—সন্তান প্রজননের পর পতি পত্নীতে বিচ্ছেদ এবং পুত্র মাতার সম্পত্তি, যেমন—হিড়িম্বা-ভীম, অর্জ্জুন-উলুপী, অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদা।

মহাভারতে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করছেন পত্নী গর্ভে অপরের নিয়োগে যে ক্ষেত্রজ পুত্র সে কি নিজ সন্তান, না যার বীর্য্য তার পুত্র?

উত্তরে আছে—অপরের পত্নীর ক্ষেত্রে যদি অপর পুরুষের ঔরসে পুত্র হয় তবে সন্তানের পিতা হবেন তিনি, যার ঔরসে সে সন্তানের জন্ম। সন্তানকে বলা হবে অযুধ। তবে সে যদি সন্তান গ্রহণ না করে, তবে সন্তান মার—কর্ত্তৃত্ব তারই বজায় থাকে।

মনুও বলেছে প্রায় একই কথা—

ভর্ত্তুঃ পুত্রং বিজানন্তি শ্রুতি দৈধংতু কর্ত্তরি
আহুরুৎপাদকং কেচিদপরে ক্ষেত্রিণং বিদুঃ।

আবার বলেছেন—

"সর্ব্বং ভূত প্রসূতির্হি বীজা লক্ষণলক্ষিতা"

অতি স্পষ্ট ভাবে পরাশর সংহিতা বলেছে—

"ওধবাতাহৃত বীজং যস্যক্ষেত্রে প্ররোহতি
সক্ষেত্রী লভতে বীজং ন বীজী ভোগমর্হতি"

অর্থাৎ মাতার নামেই সন্তানের পরিচয়—মাতাই প্রায় সর্ব্বত্র সন্তানের মালিক। এক্ষেত্রে মাতৃসত্তাটাই যেন প্রবল। ধীরে ধীরে মাতৃসত্তা উল্টে গেল—প্রজনন যার সে হ'ল শুধু বৈদিক লেখকের ভাষায় 'জনী'—জনতার দাসী, নইলে স্ত্রীতেই শুধু নয় কন্যা বা ভগ্নীতেও এমনই অপর কোন এক বা একাধিকের দ্বারা প্রজনন করার ইতিকথায় পুরাণ পূর্ণ। দেখতে পাওয়া যায় মহাভারতেই আছে—ঋষি গালবের

গুরুদক্ষিণা দিতে হবে—গুরু বিশ্বামিত্র চাইলেন প্রভূত অর্থ। গালব—রাজা যযাতির কাছে চাইলেন ভিক্ষা। যযাতি দিলেন নিজ কন্যা মাধবীকে। গালব ঐ কন্যা তিনবারে তিনজন রাজার কাছে দুইশত অশ্বের পরিবর্ত্তে ভাড়া দিলেন। তারা কন্যা মাধবীকে ভোগ করলো ও গালবকে দুইশত হিসাবে ঘোড়া দিল। এই ভাবে তিন রাজার ঔরসে তিন সন্তান হোল মাধবীর। শেষে মাধবী ও ৬০০ ঘোড়া দিলেন গালব গুরু বিশ্বামিত্রকে। বিশ্বামিত্র ঘোড়া নিলেন, কন্যাও ভোগ করলেন। হ'লো আর এক সন্তান। গালব মাধবীকে যযাতির হাতে ফিরিয়ে দিলেন। যযাতি মাধবীকে তখন দিলেন ভার—স্বয়ম্বরে পতি নির্বাচন করতে। কন্যাতো জানতো কি ভাবে তার নারীত্ব হয়েছে নির্য্যাতীত। মাধবী সবাইকে প্রণাম করে বনবাসিনী হলেন। ঐ যুগেই নারী ক্রমে এই পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল অথচ এই নারীই একদিন ছিল পূজ্যার্হা।

নারীর প্রাধান্য দেখি সে যুগে—সোমযাগে নারী-দেবতা অদিতিকে মণ্ডলীর কেন্দ্রে স্থাপনা নিয়ে।

পঞ্চদেবতা—পথ্যাস্বস্তি, অগ্নি, সোম, সবিতাকে রাখা হয় চারিদিকে—মধ্যে রাখা হয় শ্রেষ্ঠ সম্মানে অদিতিকে—আর তাঁকেই দেওয়া হয় আজও শ্রেষ্ঠ হবি বলি।

:—"নারী যেথা সম্পূজিতা সেথা সদা দেবতা বিচারে।"

যুগ ভেদে বিবাহ প্রথা—এই ভাবে একদিন আদিম যুগের গণ, যূথ বা গোত্র বিবাহ, ক্রমে যুগ্ম বিবাহের পথ ধরে গন্ধর্ব্ব বিবাহ পৈশাচী বিবাহ, স্বয়ম্বর বিবাহ প্রভৃতির নিয়ম মেনে এসে পারিবারিক বিবাহে বা গোত্রান্তর বিবাহে পর্য্যবসিত হলো। বিবাহ বা যৌন সম্বন্ধের এই বিভিন্ন স্তরের বিষয় মহাভারতে—ভীষ্মদেব যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ-বিধির পরিবর্ত্তনের কথা বলে গিয়েছেন এবং তা চার যুগের উপযোগী বলেই মন্তব্য করেছেন যেমন—

সত্যযুগে সংকল্প, ত্রেতায় সংস্পর্শ, দ্বাপরে মৈথুন ও কলিতে দ্বন্দ্ব।

সংকল্প সেই যুগের যৌন সম্বন্ধে—যে যুগে মনে সংকল্প বা ইচ্ছা হলে যে কোন নরনারী অবাধে সহবাস করতে পারে—এ সত্য যুগে বা আদিম যুগেই ছিল। মাতৃসত্তাই তখন প্রবল।

সংস্পর্শ হচ্ছে—পরবর্ত্তী কালে বা ত্রেতায় যখন ঐ গণ বা গোত্র বিবাহ, গোত্রান্তর বিবাহে পর্য্যবসিত হ'লো—বাপ, ভাই, পুত্র-কন্যা, ভগ্নী বা মাতার সঙ্গে—এমন কি কোন স্বগোত্রের সঙ্গেও সহবাস করতে পারতো না। সংস্পর্শে এলো বিচার।

তারপর দ্বাপরে বা পরবর্ত্তী কালে এল মৈথুন। গোত্রান্তর বিবাহ থাকা সত্ত্বেও যুগ্ম বিবাহের বন্ধন বহুপতিত্ব বহুপত্নীত্ব ঘোচেনি। এক পতির পরও স্ত্রী অন্য পতি নিয়োগ করেছে, করেছে গন্ধর্ব্ব বিবাহ, পৈশাচী বিবাহ, স্বয়ংম্বর বিবাহ প্রভৃতি।

কিন্তু আজ-আধুনিক যুগে বা কলিযুগে দেখা দিল দ্বন্দ্ব বিবাহ—এক পুরুষ আর তার এক স্ত্রী এবং স্ত্রী যেন পুরুষের দাসী। মাতৃসত্তা একেবারে লুপ্ত—পুরুষ সর্বময় কর্ত্তা—নারী হলো দাসী ও সন্তান প্রজননের যন্ত্র মাত্র। তবু আজ সেই বিবাহ মনুসংহিতার সুর ধরেই আমরা বহাল রেখেছি—যে মনুসংহিতাই পুরুষ ও স্ত্রীর সমান অধিকার, ব্যভিচারে সমান দোষ বলে গেছে। বলেছে—মানুষের সমাজে পত্নী পতিকে অতিক্রম করলেই তার মহাপাপ হবে, আবার পতিও পত্নী বর্ত্তমানে তাকে অতিক্রম করে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে মহাপাপের দায়ী হবে।

বিবাহ-বিধি—পূর্বে ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ কন্যা বা নিম্নবর্ণজাতা কন্যাকে বিবাহ করতে পারতেন কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বিবাহ হ'ত তাদেরই বর্ণের মেয়ের সঙ্গে। তবে সর্বত্র সবর্ণা কন্যা বিবাহই প্রশস্ত ছিল। মনু এমন কথাই বলে গেছেন।

তাছাড়া মাতামহকুলের সঙ্গে যার সাতপুরুষ সম্বন্ধ কেটে গেছে—যেখানে কন্যা ও পাত্রের এক প্রবর বা গোত্র নয়। যেখানে মাতৃকুল পিতৃকুলে পাঁচ পুরুষের রক্ত সম্বন্ধে কেটে যায় সেখানেই

বিবাহ চলবে, নচেৎ নয়।

এমনই কঠোর নিয়ম হলো প্রথম কন্যা নির্ব্বাচনে। তারপর তো উৎসব করা হ'ল বিয়ের—তারপর হবে সংসারাশ্রম।

সংসারাশ্রমে এসে সবাইকে ভাবতে হবে—দেব ঋণ শোধ দেবো যজ্ঞে, ঋষি-ঋণ শোধ দেব ব্রহ্মচর্য্যে আর পিতৃঋণ শোধ দেবো পুত্র সৃষ্টি ক'রে, কারণ পুত্রের পিণ্ড পিতৃ-পুরুষকে উদ্ধার করবে।

বিবিধ প্রকার বিবাহ—ভারতে বিবাহ ছিল আট রকম। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য্য, প্রজাপত্য, আসুর, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। এর মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য্য ও প্রজাপাত্য এই চার রকম বিবাহই সুন্দর। কন্যার পিতা বরকে সাদরে এনে যৌতুকাদি দিয়ে কন্যা দেন। এই যৌতুকাদির ভেদে ও যজ্ঞাদির আচার ভেদই এই চারটি রকম বিবাহের প্রচলন। কিন্তু যেখানে বর কন্যা পক্ষকে পণ দিয়া বধূকে গ্রহণ করেন, সেটা আসুর বিবাহ। যেখানে বর-কন্যা পরস্পরে ইচ্ছানুসারে নিজেরাই বিয়ে করে সেটা গন্ধর্ব্ব-বিবাহ। আর যেখানে কন্যাকে হরণ করে নিয়ে জোর ক'রে বিয়ে করা হয়, সেটা রাক্ষস বিবাহ। কিন্তু এর চেয়েও হীন হ'ল পৈশাচ। অত্যাচার ক'রে—সুপ্তা, প্রমত্তা বা অসহায়া কন্যাকে গ্রহণ ক'রে অনাচার হ'ল পৈশাচ বিবাহ।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা জ্যেষ্ঠা ভগ্নী থাকতে ছোট ভাই বোনের বিয়ে হলে হ'তো অপরাধ। তাকে বলা হ'তো—'পরিবেদন দোষ।'

বিবাহের সময় কন্যার রোগ, বংশের ক্ষয়াদি রোগ, অথবা আচারহীন কুল এবং যে কুলে পুরুষ বান্ধব নেই সেই কুল—এসব বর্জ্জন করেই সবাই বিয়ে করতো। সে যুগেও বর কন্যা অপেক্ষা বড় হবে—এই নিয়ম ছিল। তবে বয়সটা অনুপাতে ছিল একটু অন্য রকম। কারণ তখন খুব ছোট মেয়েদেরই বিবাহ হতো। মেয়েকে বড় করা হ'তো না। তা নিয়ে নানা আইন ছিল মনুর, ঋতুবতী হওয়ার আগে বিবাহ না দিলে পিতৃলোকের নরক হ'তো। আজ আর তা চলে না। তবে সে যুগেও বলে গেছে উত্তম বর না পেলে কন্যা অবিবাহিতা রাখাও ভাল।

তখন কন্যাকে কেউ পণ নিয়ে বিয়ে দিত না। সেটা কন্যা বিক্রয়ের সামিল হ'তো। যে তা করতো তার হ'ত নরক ভোগ।

সে যুগে নারী পতিকে দেবতা জ্ঞানেই সম্মান করতো। নিজেকে স্বামীর দাসী মনে করতো এ সত্য, কিন্তু পুরুষও নারীকে কম সম্মান দেয়নি। বলে গেছেন—"যেখানে নারীর পূজা সেখানে দেবতা।"

ছায়ার মত পতির অনুসরণ করলেও সে যুগের নারীর উপরেই থাকতো আয়-ব্যয়ের ভার—অতিথি ও দেবসেবার ভার বা অধিকার।

বাৎস্যায়ন কামসূত্রই বলেছে—স্বামী অতিব্যয় বা অসদ্ব্যয় করলে গোপনে বোঝাবে। ভৎসনা করতে হলে যখন তিনি একা থাকবেন বা কেবল বন্ধুগণের মধ্যে থাকবেন তখনই করবে।

অসচ্চরিত্রা, বন্ধ্যা বা বিশেষ প্রকার পীড়াদি না হ'লে স্ত্রী ত্যাগও সে যুগে ছিল অসম্ভব ও ঘোর অন্যায়। বহু বিবাহ তখন প্রচলিত ছিল বটে তবে তেমন প্রশংসার ছিল না। বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু শিষ্টাচার সম্মত ছিল না, কারণ বিবাহঘটিত বৈদিক মন্ত্রে বিধবা বিবাহের কোন উল্লেখ নেই। তবে কেবল বাগ্‌দান, সূত্রবন্ধন, বা মন্ত্রে দান হয়েছে অথচ কুশণ্ডিকা, সপ্তপদী হয় নি এমন অবস্থায় পতির মৃত্যু হলে কন্যার আবার বিবাহ হতে পারতো। তা ছাড়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণকারী, রুগ্ন, ক্লীব বা মহাপাতক রোগগ্রস্ত পতির অক্ষতযোনী পত্নীর বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

বিবাহকে তারা এমনভাবে ধর্ম্মী-সংস্কার বলে ভাবতে পেরেছেন যে দম্পতির যৌন-বিহারও তারা ত্রিবর্গ সাধনেরই মাধ্যম ধরেছেন।

প্রধান যৌন-শাস্ত্র বাৎস্যায়নের কামসূত্রে নানা রতিজ ইঙ্গিত থাকলেও সর্ব্বাগ্রে গ্রন্থারম্ভের শ্লোকটি দেখলেই বোঝা যায়, বিষয় কামজ হলেও দৃষ্টি তাঁদের কোথায়। প্রথমেই বলেছেন—

ত্রিবর্গ মানেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম। তাদের প্রতিটিকে করি প্রণাম—আর তারও অতীত যিনি, তাঁকে করি কামসূত্র বর্ণনার আগেই নমস্কার।

অর্থাৎ কামাতীতের পদপ্রান্তে আগেই জানাইলেন প্রণতি।

গোত্র ও প্রবর

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—জাবালপুত্র সত্যকাম মাতা জাবালাকে বলেছেন— "……'কিং গোত্রেঽহমস্মীতি·… …"—আমি কোন গোত্রের।

অতএব সে যুগেও গোত্র ছিল এবং হয়তো সাধারণতঃ পূর্ব্ব পুরুষের পরিচিতি অথবা গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতেই গোত্রের পরিচয় দেওয়া হত। অনেকে বলেন—সেই পরিচয়ের অধিকারও ছিল শুধু ব্রাহ্মণের—

কিন্তু আধুনিকযুগের মত --

বিবাহ প্রথাতেই ক্রমে গোত্র ও প্রবরের প্রাধান্য এল, কর্ম্ম অনুসারে বর্ণ হলেও গোত্র বা প্রবরই হলো ঠিক সাম্যবাদী সম্প্রদায়ের প্রথম ভাঙ্গন। গুণ-কর্ম্ম বিভাগে বর্ণ বিভাগ হয়তো মানা যায় সাম্যবাদের কাঠামোতেও, কিন্তু গোত্র বা প্রবর যেন একটা বেশ বিশিষ্ট দল সাজিয়ে দিল। এক এক জায়গায় যাযাবর দল নিজ নিজ গতিপথে, গো-সম্পত্তি নিয়ে যে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় সৃষ্টি করলে সম্ভবত তাই হ'লো 'গোত্র।'

শাস্ত্রে বলে সে যুগে কশ্যপ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, গৌতম, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ২৪ জন গোত্রপতি ঋষি ছিলেন।

আর সেই গোত্রে যাঁরা প্রধান প্রধান "বর" বা শ্রেষ্ঠ গুণ নিয়ে পৃথক পৃথক শ্রেণী গঠনের একটা ব্যবস্থা করলেন তাঁরই হলেন 'প্রবর'।

হ'লো সবই কিন্তু কোথায় যেন ফাটল দেখা দিল, গণযুগের সাম্যভাবে যেন কারও দায়িত্ব নেই—যেন নেই কারও স্থিতি-প্রবৃত্তি।

পরবর্ত্তীকালে প্রসিদ্ধ অর্থশাস্ত্র প্রণেতা কৌটিল্য 'বৈরাজ্য' বলে গেছেন। বলেছেন—এমন রাজ্যে দায়িত্ব কিন্তু কারও থাকে না—যে কেউ যে কোন খেয়ালে প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশ অন্যের দখলে দিয়ে দিতে পারে।

দাস-প্রথা

আজ হয়তো সমাজের অনেকে বলবেন প্রাচীন সভ্য ভারতে দাস-প্রথা ছিল না। কিন্তু নারদীয় পুরাণে, মহাভারতের বা মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে দাস-প্রথা সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায়।

মনুস্মৃতিতে পাই সাতরকম দাসের নাম। বিস্তৃত ভাবে তার আলোচনা দেখি নারদীয় পুরাণে।

গৃহজাত, ক্রীত, লব্ধ, অকালের দুঃখে আসা স্বামীদের অহিতকারী হয়ে আসা, যুদ্ধে পাওয়া, পণ্যে পাওয়া, ভক্ত, আত্মবিক্রীত, অস্ত্র-পরাজিত প্রভৃতি পনের রকমের দাস ছিল।

দাসদের পীড়নের কাহিনী পাই বৌদ্ধ জাতকেই বেশী। ভাড়াও দেওয়া হত দাসদের, আবার দাসদের মুক্তি দেওয়া হত—এক উৎসবের প্রথা করে।

রাজতন্ত্র

পূর্বে যাই থাক—মহাভারতীয় যুদ্ধটিকেই অনেকে বলেন গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের সংঘর্ষ—দাসত্ব ও প্রভুত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

প্রথমেই দেখা যায় যে হিন্দুর অপভ্রংশ থেকে যে হিন্দু ও হিন্দুস্থানের উৎপত্তি, হিন্দু গণসঙ্ঘের রাজ্যে সহসা সে 'ভরত' থেকে ভারতবর্ষ আখ্যা পেল কেন?

এই এক-সম্রাটত্ব ও তাঁর নামে দেশের নামই সম্ভবতঃ দেশের ভাগ্যে রাজতন্ত্রের তিলক এঁকে দেয়।

রাজতন্ত্রের বিধি

প্রথমেই দেখা যায় রাজতন্ত্রে রাজাই হবে প্রধান। সে রাজা হবে কেমন, কেমন হবে মন্ত্রী, কেমন হবে তার বিচার?

রাজা—মনুসংহিতায় আছে-

রাজা হবেন ক্ষত্রিয়—আপন রাজ্যের প্রভু, মন্ত্রী ও অমাত্যগণ নিয়ে করবেন শাসন, প্রজার পালন, সন্ধিসর্ত্ত দিয়ে করবেন অন্য রাজার সখ্যতালাভ, ধনভাণ্ডারে থাকবে অতুল ঐশ্বর্য্য—মণি মুক্তায় পূর্ণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শতেক রাজ্য থাকবে পরিখায় ঘেরা—দুষ্টের শাসনের শিষ্টের পালনে হবেন তিনি রাজা, তিনি অরিকুল-হন্তা, দেবসম পূজ্য, প্রজার ভাগ্য-নিয়ন্তা।

মন্ত্রী—সেই রাজার মন্ত্রী হবে সত্যাশ্রয়ী ধার্ম্মিক, বিদ্বান, সদাচারী।

তখন ব্রাহ্মণকুলই ছিল এ বিষয়ে সেরা তাই ব্রাহ্মণরা হতেন মন্ত্রী অবশ্য বৈশ্য বা শূদ্রও মন্ত্রী হতো। কিন্তু তাকে যথার্থ উপযুক্ত পাত্র বলা হ'তো না। তবে এক এক রাজাকে এক এক বিষয়ে মন্ত্রণা দেবার জন্য বিধিমত সাত আটজন মন্ত্রীও থাকতেন। রাজার মতন রাজা দশরথের মন্ত্রী ছিলেন সুমন্ত্র। সত্যিই সুমন্ত্রী না হলে শাসন চালাবে কে? যার যে বিষয়ে অধিকার তিনি সেই বিষয়ে মন্ত্রণা দিয়ে রাজাকে সাহায্য করতেন। আজ সে নিয়ম আবার এসে দেখা দিয়েছে। আমরা ভাবি ওপারের দান এটা।

রাজা সবিনয়ে সিংহাসনে বসে করতেন বিচার. শাসন। অন্ততঃ তিনটি মন্ত্রী তাকে উপদেশ দিতেন, তখন তারা সাধারণ মন্ত্রী। কিন্তু যেদিন রাজা থাকতেন অনুপস্থিত সেদিন প্রধান মন্ত্রী করতেন তাঁর কাজ। তাঁর উপাধি ছিল 'প্রাড্‌বিবাক'। আবার তার অভাবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় মন্ত্রী কাজ করতেন। বিচারের সময় সমাগত হ'লে প্রজাদের মতামত নেওয়া হ'ত। এমনকি তা নিয়ে পরস্পর আলোচনাও হ'ত। তবে নির্দ্দিষ্ট একজন বিচারক রাজার পাশে বসে বিচারের রায় দিতেন। বিচারকেরও সন্দেহ মেটাবার জন্য সঙ্গে থাকতেন কয়েকজন। বিচারকদের অপরাধের বিচার যে কে করতেন তা' ঠিক বোঝা যায় না। তবে মনে হয় রাজা স্বয়ং তাঁদের বিচার করতেন—ব্রাহ্মণই ছিলেন সবচেয়ে উপযুক্ত বিচারক। এর কত কথাই জানতে পারি আমরা কাত্যায়ন সংহিতায়।

বিচারক বা ধর্মাধিকরণকে আসামী বা অপরাধীর কথা বুঝিয়ে দিয়ে যাঁরা সাহায্য করতেন তাঁদের নাম ছিল 'ব্যবহার জীব'—আমরা এদেরই আজ উকীল, এটর্নি বা ব্যারিষ্টার বলি।

রাজ-দূত—সে যুগে দূতকেও এক প্রকার মন্ত্রী বলা হ'ত। দেশান্তর বা রাজ্যান্তরে রাজার সঙ্গে সখ্যভাব বা অরি-ভাব রাখা নির্ভর করতো এই দূতের উপর। তাই অতি উচ্চ বংশজ হতে হ'ত এই দূতকে। আজ এদেরই আমরা বলি এম্বাসেডার।

এ ছাড়া রাজা বা রাজ্যের প্রশংসা প্রচারের জন্য হলো সুত ও মাগধ। নানা উপাখ্যানে ভীষ্মদেব মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে এই প্রকারে—চর ও দূত নিয়োগ, রণ ও রাজনীতির নানা কথা বলেছেন।

সেনাপতিও ছিল অন্যতম মন্ত্রী। তার হাতেই থাকতো সৈন্যবল আর দণ্ডনীতি।

এদের সকলের উপরে, সব কিছু দেখার দায়িত্ব নিয়ে যিনি রাজা ও প্রজার হিতকল্পে আত্মনিয়োগ করতেন. তিনি হলেন কুল-পুরোহিত। তিনি হতেন ত্রিবেদবিৎ। কারণ পুরের হিত করতেই তিনি থাকতেন অটল।

এ ছাড়া যার যে বিষয়ে দক্ষতা, তাদের এক এক জনকে চিকিৎসা, খনিজ, অন্তঃপুরের ব্যবস্থা, পূর্ত্ত. শিল্প, সর্ব্ববিষয়ে—এক এক বিভাগে মন্ত্রীরূপে নিয়োগ করা হ'ত। আজও এক এক বিষয়ে পৃথক পৃথক মন্ত্রী নিয়োগ – এই নীতি থেকেই উদ্ভূত।

বিবাদ ও বিচার

যত বিষয় নিয়ে বিবাদ সম্ভব তা মোটামুটি আঠার ভাগে ভাগ করেছিলেন প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ। মনু সংহিতায় আছে—ঋণ গ্রহণ, নিক্ষেপ (ধার দেওয়া ও নেওয়ার গণ্ডগোল) অস্বামি-বিক্রয় (নিজের জিনিস নয় তবু তা মালিক সেজে বেচে দেওয়া) সম্ভূয় সমুত্থান (সমবায় ব্যবসায়) দত্তা-প্রদানিক (দিয়ে আবার ফেরৎ নেওয়া) সংবিদ্ব্যতিক্রম (চুক্তিভঙ্গ) ক্রয় বিক্রয়ানুশয় (দাম স্থির করার পর ক্রয় বিক্রয়ে অনিচ্ছুক বা ব্যতিক্রম) স্বামিপাল বিবাদ (পশুর মালিক ও পালকের বিবাদ) সীমা বিবাদ (সীমানা সংক্রান্ত) বাক পারুষ্য ও দণ্ড পারুষ্য (ঝগড়া ও মারামারি) স্তেয় (চুরি) সাহস (ডাকাতি) স্ত্রীসংগ্রহ (পরস্ত্রী গ্রহণের চেষ্টা) স্ত্রী পুং ধর্ম্ম (স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নীতিগত কলহ) বিভাগ (সহোদর প্রভৃতির মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে কলহ) আহ্বয় (পশু পক্ষীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেরা কলহমান হওয়া)

এই আঠার রকম বিবাদের কারণ নিয়ে সাধারণতঃ সব বিচার হতো।

প্রাচীন কালে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হলেই প্রথমতঃ পঞ্চায়েৎ তার বিচার করতেন, সেখানে মীমাংসা না হলে বিচার হতো রাজকীয় আদালতে। তবে সর্ব্বত্রই বিচারে বিবাদ-বিষয়ের বিচার হ'ত আগে। পূর্ব্বে বাদী ও প্রতিবাদী প্রভৃতি ছিল তবে প্রথমতঃ বিচার সাধারণ গ্রামে বা দশজনকে নিয়েই করা হ'ত। তারপর হ'ত তার বিচার বিচারালয়ে।

দশজন যখন বিচার করতো তখন নানা রকমের শপথ বা দিব্যি খাওয়ান প্রথা ছিল। বিচারালয়ে ব্রাহ্মণকে শুধু প্রশ্ন করা হতো 'তুমি কি জান'—জানা ছিল সে সত্য বলবেই। ক্ষত্রিয়কে বলা হ'তো 'সত্য বল।' বৈশ্যকে গরু বা শস্য হাতে নিয়ে সত্য বলানো হতো আর শূদ্রকে শপথ করান হতো দেবতার নামে, ব্রাহ্মণ স্পর্শে বা সোনা রত্ন ছুঁইয়ে।

বিচারালয়েও যে বিচার হত, তা হত ব্যবহার কাণ্ডের চার ভাগে—পূর্ব্ব পক্ষ, উত্তর পক্ষ, ক্রিয়া পক্ষ, আর নির্ণয়পক্ষ। বাদীর কথা পূর্ব্ব পক্ষ, প্রতিবাদীর কথা উত্তর পক্ষ, সাক্ষী ক্রিয়াপক্ষ, আর নিষ্পত্তি হল নির্ণয় পক্ষ। এমনই করে ব্রাহ্মণ বিচারক অন্য সভ্যদের নিয়ে বিচার করতেন। যদি সে বিচার ভুল বা অন্যায় হত—বিচার তো আবার হতই, প্রথম বিচারক পেতেন তার জন্য শাস্তি।

কিন্তু সর্ব্বত্র ধর্ম্ম, সত্য, এসব ছিল বিচারের সত্যিকার রূপ। ফাঁকির প্রমাণ আর কথার ভেল্কীতে তখন বিচার হত না। সে যুগে বিচার প্রার্থনায় কোন ব্যয় ছিল না।

তাছাড়া সাক্ষী গ্রহণেরই বা কত নিয়ম ছিল সে যুগে! অজ্ঞতা হেতু শিশুর, মিথ্যা কথা বলা স্বভাব বলে মেয়ে মানুষের, জাল করেন যাঁরা তাদের আর বন্ধুজন হয়েও যারা শত্রু—তাদের সাক্ষ্য অনুপযুক্ত বলে ধরা হত। যে সাক্ষী বিচারালয়ে মিথ্যা বলতো তার হতো গুরুতর শাস্তি। মনু এও বলেছেন যে—

"যে বিচারালয়ে ধর্ম্ম অধর্ম্মের দ্বারা, সত্য অসত্যের দ্বারা, অথবা বিচারক সাক্ষীদের মিথ্যা কথার মোহে যথার্থ বিষয়টি না বুঝে ভুল বিচার করেন—সে বিচারক ও বিচারালয় মিথ্যা পাপে বিদ্ধ হন।"

মনুসংহিতা প্রথমেই সাক্ষীকে সেই সব কথা বলাতে বলেছেন যা আজও সাক্ষীকে বলান হয়। আর সাক্ষীকে জানান হয় যে—হে ভদ্র, জন্মাবধি তুমি যে পুণ্য করেছ, তা তোমার সব যাবে যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দাও—সব হবে কুকুরের বৃত্তিতে পরিণত!

অপরাধীর দণ্ড—তারপর আর এক অপরাধ জালিয়াতি। এরও দণ্ড ছিল ঠিক ঐ চুরি বা অন্য কোন অপকার্য্যের মতন।

জালিয়াতির দণ্ড যেমন ছিল ভীষণ, চুরি করারও শাস্তি ছিল যেমন রাজপুরুষের হাতে, তেমনই যে কোন ঋষি, মুনি বা ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ অপরাধ জনক কোন কাজ করলে তারও ছিল ধর্ম্ম-বিচার বা প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা।

প্রায়শ্চিত্ত তবে শুধু রাজকীয় বিচারেই শাস্তি ছিল না—আত্ম-অনুতাপে প্রায়শ্চিত্তও ছিল অপরাধীর অপরাধে এক দণ্ড।

কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করা, নিন্দিত কার্য্যের আচরণ এবং ইন্দ্রিয় দমন না করা—এই ত্রিবিধ পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত ছিল। প্রায়ো নামক উপবাস দ্বারা নিশ্চিত চিত্ত শুদ্ধির নাম প্রায়শ্চিত্ত!

প্রাড্‌বিবাক—কৃতবিচার ভুল প্রতিপন্ন না হলেও আবার বিচার করা বা বিচারের রায় দেওয়া হতো। প্রাড্‌-বিবাক তা' করতেন।

যদি কেহ মনে করতো যে বিচার সঙ্গত হয়নি তখন আবার পুনর্বিচারের ব্যবস্থা ছিল—আজকালকার আপীলের মতন।

সামান্য বিষয়ের বিচার না করে ছেলে, স্বামী, স্ত্রী, মা এইসব প্রিয়জনের অঙ্গ স্পর্শ করে শপথের নিয়ম ছিল। কারণ মিথ্যাকে সবাই এমনই করতো ঘৃণা।

বিচারে যে পক্ষ জয়ী হতেন, তিনি পেতেন 'জয়পত্র'। এই জয়পত্রে বিচারের সর্ব্ববিষয়, বাদী প্রতিবাদী তাদের বক্তব্য,

বিচারকের রায় এবং সেই রায় কোন্ যুক্তির উপর তাও লিখে সে জয়পত্র তুলে দেওয়া হত বিজয়ীর হাতে।

গ্রাম ও গ্রামীন্— আর্য্যরা যখন ব্রহ্মাবর্ত্তে, ব্রহ্মর্ষি দেশেও আর্য্যাবর্ত্তে—পরে ভারতের সব জায়গায় জুড়ে বসলো তখন একটি ছোট জায়গায় কিছু লোক নিয়ে গড়ে তুললো সেই এক একটি গ্রাম আর গ্রামের দেখাশুনা করার জন্য **গুল্ম** বা পঞ্চায়েৎ থাকতো। সব শাসনের ব্যবস্থা করতে সেই **মণ্ডলী**। রাজার পক্ষে থাকতো একদল সৈনিক। ঐ মণ্ডলীর আদেশ অনুসারে তারা শাসনে সাহায্য করতো।

বেতন— সে যুগে বেতনভূক কর্ম্মচারী বৃদ্ধ বয়সে বা রোগে অসমর্থ হলে চিরকাল বেতন পেতেন।

"আর্ত্তস্তু কুর্য্যাৎ স্বস্থঃ সন্ যথাভাষিতমাদিতঃ
সদীর্ঘস্যাপি কালস্য তন্নভেতৈব বেতনম্।"

যে সব প্রজারা নিয়ে আসতো অন্ন, শস্য, কাষ্ঠ প্রভৃতি, তাই নিতেন কর রূপে ঐ মণ্ডলী। তাদের অন্য বেতন ছিল না কিছু। আয় ছিল ঐ শস্য, অন্ন সব যা প্রজারা দিত।

দশখানা এমনি গ্রাম থাকতো এক একজন দশ গ্রামীনের অধীনে। তেমনই রাজসৈন্য থাকতো তাদের আদেশ মানতে। চার বৃষের দ্বারা যতটুকু জমি কর্ষণ করা যায় তাকে বলতো এক হলা ভূমি। এমনি তুই হলা ভূমির নাম কুলভূমি। তার আয় পেতেন ঐ দশগ্রামীন তার বেতনরূপে। অন্য কোন আয় তিনি আর নিতে পারতেন না। সব রাজকর যেত রাজ সরকারে।

এমনি করে দশগ্রামীন বিংশতীশের অধীনে থাকতেন। বিংশতীশের আয় ছিল পঞ্চ কুল ভূমি অর্থাৎ ৪০টি বৃষের হল কর্ষণ ভূমি।

বিংশতীশ ছিল শত-গ্রামশতাধ্যক্ষ্যর অধীন। তিনি পেতেন একখানি গ্রামের সব শস্য। গ্রামশতাধ্যক্ষ থাকতেন সহস্র গ্রামাধ্যক্ষের অধীনে। তারও ছিল একখানি বড় গ্রামের আয়।

এদের প্রত্যেকের অধীনে থাকতো রাজসৈন্য। আর সবার উপরে

থাকতেন একজন "সর্ব্বার্থ চিন্তক।" অসাধ্য কাজের মীমাংসা করতেন তিনি, ঠিক এ যুগের এক এক প্রদেশের গভর্ণরের মতন তিনি যদি কোন অপরাধ বা অন্যায় করতেন, তবে তাকে শাস্তি দিতেন স্বয়ং রাজা।

কর ও কোষাগার—সে যুগের রাজা অন্যায় করে শুল্ক নিতেন না। প্রতি ব্যবসায় শুল্ক নির্দ্ধারিত করে দিতেন—প্রতি প্রজারও কর ছিল নির্দ্ধারিত। দ্রব্যের মূল্যও নির্দ্ধারিত করতেন রাজা, তিন বছরের মতন প্রজার খাওয়া চলে এমন শস্য থাকতো জমা রাজার ভাঁড়ারে।

জিনিসের দাম পাঁচদিন পরে বা ১৫দিন পরে নির্দ্ধারিত ক'রে দেওয়া হ'তো। বাজারের মানদণ্ড প্রতি বৎসরে ছবার পরীক্ষা করা হ'তো। রাজকার্য্যের আয়-ব্যয় রাজা নিত্য দেখতেন। এমনই সব প্রত্যক্ষ ব্যবস্থায় চলতো রাজ্য-রক্ষা ও রাজ্য-শাসন।

মনুসংহিতা বলে সে-যুগেও প্রতি লোকের উপরই কর নির্দ্ধারিত ছিল, তবে দরিদ্রকে বা বিশেষ বিশেষ পাত্রকে কর মাপ করা হ'তো। কোষাধ্যক্ষই সে সব ব্যবস্থা করতেন, আর তিনিও একজন মন্ত্রী বলেই সম্মান পেতেন। ব্রাহ্মণদের পুণ্যভাগের ষষ্ঠাংশ পেতেন রাজা তাই ব্রাহ্মণকে কর দিতে হ'ত না, বরং তাদের ভরণ-পোষণের জন্য রাজাই দিতেন তাদের সব। তবে অন্ধ, জড়, মূক, কুব্জ, আতুর, সত্তর বৎসরের বেশী যার বয়স, স্থবির, অনাথা, স্ত্রী, অপোগণ্ড, বালক, ভিক্ষুক ও সংসারাশ্রম ত্যাগী—এঁরা ছিল রাজকর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

সাধারণ শস্যাদির ষষ্ঠাংশ বহুমূল্য দ্রব্যাদির এক বিংশতি অংশ কর রূপে রাজা নিতেন। আর গুপ্তনিধি বা যে সব জিনিসের মালিক নেই কেউ, তার সবই যে পেত তারই হ'ত। তবে রাজা তার ভাগ পেতেন। আর রাজা যা কিছু পেতেন, অর্দ্ধেক দেব-দ্বিজের কার্য্যে দিয়ে বাকি অর্দ্ধেক নিজ কোষাগারে তুলে ফেলতেন।

প্রতি নগরে বা গ্রামে গোচারণের ভূমি ছেড়ে দিয়ে তবে জমি বিলি করা হ'ত। কৃষকরা সেইভাবেই জমি পেত। কৃষকের বয়স, কর্ম্ম-শক্তি,

ব্যয়, অজন্মা বা বিপদ-আপদ বিবেচনা ক'রে বার ভাগের এক ভাগ থেকে ছয়ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত শস্য রাজা কর হিসেবে নিতেন। কাঁসারি, সূত্রধর, নাপিত, তন্তুবায়, তৈলিক, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকার, শঙ্খকার, চিত্রকর সকলেই মাসে একদিনে রাজসেবা ক'রে আপনাপন কর থেকে মুক্ত হ'তো। ব্যক্তিবিশেষের কর এইভাবেই রাজা প্রায় নিতেন না—নিতেন তাদের শ্রম।

ঠিক এইভাবেই ব্রাহ্মণরা করমুক্ত ছিলেন, কারণ রাজার মঙ্গল চিন্তা ও ধর্ম্মকার্য্য তাঁরাই করতেন। এমন কি শ্রাদ্ধের সময়ও প্রতি ব্রাহ্মণ আগে ভূস্বামীকে শ্রাদ্ধের ভাগ নিবেদন করতেন আপন পিতৃ-পিতামহের সঙ্গে।

কর গ্রহণের নিন্দাটুকুও প্রাচীনশাস্ত্রে করেছে স্তুতিগানের ছলে। বলেছেন রাজা জোঁকের মতন ধীরে ধীরে অল্প অল্প কর নিতেন বলে প্রজা সে রক্ত-শোষণটুকু টের পেতেন!

প্রকৃত পক্ষে রাজা কর না নিলে যে অনেক ভাল কাজও করতে পারেন না—তাই প্রাচীনযুগে কর গ্রহণ বিধিসঙ্গতই ছিল।

তবে রাজা কর নিতেন বটে, কিন্তু তার বিনিময়ে কি করতেন সেটাও দেখবার মতন ব্যাপার। সে রকম নাম করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় অনাথশরণ বা অপ্রাপ্ত বয়স্কের জন্য ব্যবহারাশ্রমের কথা।

অনাথ-শরণ—উন্মত্ত, জড়, মূক, অন্ধ, আতুরদের জন্য রাজার এক আশ্রম থাকত। বিনা শুল্কে বা কিছুই না নিয়ে তাদের ভরণপোষণের জন্য রাজাই দায়ী থাকতেন। তদ্ব্যতীত যে নারী বন্ধ্যাত্বের জন্য স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, যার নানা রোগ, যার স্বামী নিরুদ্দেশে, যার স্বামী বিদেশে স্ত্রীর কোন খোঁজ করেন না, যে বিধবার কোন কুলে কেউ নেই তারা যদি সচ্চরিত্রা হয় তবে রাজাই নিতেন তাদের ভার। শুধু যার বিষয় আছে—অথচ সে নাবালক তার বিষয়াদির ভারই যে শুধু রাজা নিতেন তা নয়, যার কেউ নেই অথচ অপ্রাপ্ত বয়স্ক সেই সব অনাথ শিশুদের ভরণ-পোষণ শিক্ষা দীক্ষা সব ভার ছিল রাজার।

রাজার কোষাগার ছিল তাদের জন্য খোলা। ব্রাহ্মণ সন্তানরা তো সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত রাজার ব্যয়ে গুরুগৃহে থাকতেন। এর পরই কি ক'রে সম্পত্তি বাপ ছেলেকে দিত, রাজা গুণীকে দিত— তারও প্রথা দেখি, তাম্রলিপি, প্রস্তর ফলক বা কাষ্ঠ ফলকে লিখিত ব্রহ্মোত্তর দান পত্রে বা বৈষয়িক দানপত্রে।

পত্র ও লেখ্য—এছাড়া রাজা যদি কারও গুণে বা বীরত্বে খুশি হতেন, তার চিরজীবনের জন্য কোন আয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিতেন লিখিত কোন পত্রে তার নাম ছিল 'প্রসাদ পত্র।'

কেনা-বেচার দলিলকে বলা হ'ত 'সম্পত্তি লেখ্য'। আর বন্ধকী বা কবুলিয়তের নাম ছিল 'আধিলেখ্য।'

ঋণ ও কুশীদ—এর পরই আর এক আয় রাজা বা ব্যবসায়ী বৈশ্যের ছিল—তার নাম কুশীদ বা সুদ। 'কুশীদ' শব্দটার অর্থই হচ্ছে 'মন্দ'। প্রয়োজনে কেহ ঋণ বা ধার দিলে সে হ'ত উত্তমর্ণ। যে ঋণ নিত সে অধমর্ণ। মূল টাকার উপর মাসিক, দৈনিক বা বার্ষিক কিছু কর বা লাভ দিতে হ'ত তারই নাম বৃদ্ধি। মানে অর্থ বৃদ্ধি হ'ত। কিন্তু সেটা ছিল সকলের ঘৃণার—অতি মন্দ তাই না নাম হ'ল কুশীদ। তা ছাড়া সুদকে 'কালিমা' বলা হ'তো। আগে থেকে ঠিক না থাকলে চক্রবৃদ্ধি হারে কেউ সুদ নিতে পারতো না। অবশ্য মহাত্মা বশিষ্ঠের ব্যবস্থা যে বিনা বন্ধকে যদি কেউ ঋণ নেয় তবে প্রতিমাসে শতকরা ৮০ ভাগের একভাগ সুদ নিতে পারবে। অথবা প্রতিমাসে শতকরা দুই পণ সুদ গ্রহণ করলে সাধু অনুসরণ হবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলে গেছেন—পুত্র না থাকলে যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো সেই ঋণ পরিশোধ করতো।

তা ছাড়া গরু, ভৃত্য, বা অন্য ব্যবহার্য্য জিনিস ব্যবহার করবে এই সর্ত্তে ঋণ নিলে তার সুদ নেওয়া চলবে না, ক্রয়-বিক্রয়ও চলবে না।

তবে আবার এও বলছে, ভূমির অধিকারীর সামনে তার সম্পত্তি কেউ দশ বছর অবাধে ভোগ করলে তা ভোগীর হয়ে যাবে—মালিকের সত্ত্ব থাকবে না।

অর্থ দণ্ড—সে যুগে অজ্ঞানী হাতুড়ে চিকিৎসক চিকিৎসা করতে পারতোনা। রাজপথ কেউ অপরিষ্কার করতে পারতো না। ফড়েদের দৌরাত্ম্য ছিল না—কারণ তারা ভেজাল চালাতে ওস্তাদ। অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য কেউ খেতে পারতো না। এসব যারা করতো অথবা গর্ভিনী, রোগী, বালক ছাড়া কেউ যদি পথকে ময়লা করতো সে শাস্তি পেতো।

অচিকিৎসকের চিকিৎসায় পশু মরলে দ্বিতীয় সাহস দণ্ড বা ৩১৫ কাহন কড়ি জরিমানা হতো; মানুষ মরলে হত ৬৩০ কাহন।

উপাধি বিতরণ শুধু শাস্তি বা বেতন নয়, শুধু অনাথশরণ নয়, গুণী জনকে উপাধি সম্মান দিতেন সে যুগের রাজা।

এ ত গেল সাধারণতঃ রাজ সরকারের কাজ আর তার সঙ্গে এটুকুও জানতে হবে যে রাজা প্রজার অপ্রিয় হলে প্রজা কর্তৃক বিনষ্ট হত—আর প্রিয় ব্যক্তিকে প্রজাই রাজপদে বসাতেন।

ব্যবসা ও বৃত্তি—এর পরই সমাজ সে যুগেই দৃষ্টি ফেরাল ব্যবসায়ের দিকে। এমন কি তারা বৈশ্যদের উপর সে ভার দিয়ে দিলেও 'সম্ভুয় সমুত্থান' বা সমবায় ব্যবসা চালাতেন। এর প্রমাণ শাস্ত্রেই আছে—

সমবায়েন বাণিজ্যং লাভার্থে কর্ম্ম কুর্ব্বতাম্
লাভালাভৌ যদা দ্রব্যং যথা বা সমৃদ্ধা কৃতৌ।

সমবায় ব্যবসায়ে বর্ণবিশেষে সকলের মিলিত প্রচেষ্টা পূর্ব্বে ছিল।

অমরকোষের 'কর্ণধারস্তু নাবিকঃ' দ্বারা প্রাচীন সমুদ্র যাত্রা ও পোতাদির বিষয় প্রমাণিত হয়। তখন সমুদ্র যাত্রা ও বিদেশে নানারূপ মণিমাণিক্য ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসার প্রসার ছিল।

আর শাস্ত্রেও কথা প্রসঙ্গে আছে—'সাংযাত্রিকঃ পোত বণিক বা'

পূর্ত্ত বিভাগ—এছাড়া সে যুগে পূর্ত্ত কার্য্যেরও কম প্রসার হয়নি। মহাভারতে, রঘুবংশে এর বহু প্রমাণ পাই। বনবাসকালে রাম ব্যগ্র হয়ে ভরতকে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি প্রজাদের বীজ দাও কি না? ঋণ দাও কি না? ভোজ্য দাও কিনা? মরুদেশ ও শুষ্কস্থানে পুকুর কেটে দিয়েছ কি না?

রঘুবংশে আছে দিলীপ যখন যাচ্ছেন বশিষ্ঠের আশ্রমে তখন রাজপথের দুইপাশে বৃক্ষ, ফল, শস্য দেখে দিলীপ মুগ্ধ হন।

আবার রঘু চলছেন যুদ্ধ-যাত্রায়—দেখলেন, অগাধ জলপূর্ণ নদীগুলির জল পয়ঃপ্রণালী দ্বারা শুষ্ক ভূখণ্ডে পড়ছে। নদীর উপর চমৎকার সেতু। যুদ্ধযাত্রায় যেখানে দেখলেন মহারণ্য—ফিরবার সময় দেখলেন সেখানে সুগম্য পরিষ্কৃত পথ।

প্রাচীনকালে জলাশয় দান, বৃক্ষরোপণ, প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ, পঙ্কোদ্ধার, জীর্ণসংস্কার, পান্থনিবাস, বাঁধাঘাট ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা বা অতিথিশালা প্রভৃতি পূর্ত্ত কার্য্যের উৎকর্ষতার প্রমাণ।

এই পূর্ত্ত বিভাগ (public works) সম্বন্ধীয় পথ, ঘাট, মন্দির, পুষ্করিণী, বন, উপবন, শস্যক্ষেত্র, রাজপথ, পয়ঃপ্রাণালী প্রভৃতির রক্ষা কার্য্য সাধারণতঃ শূদ্রদের উপর ন্যস্ত থাকত। যাদের 'সেবাই ছিল ধর্ম্ম 'ভূদান, গোদান, পাদপ-রোপণ প্রভৃতি আজকের উৎসব নয়—এ কর্ত্তব্য তখন ধর্ম্মরূপেই ছিল।

আহার্য্য—ভোজ্য দ্রব্যের মধ্যে আজ যত বিধি-নিষেধ দেখি সেদিনে তত ছিল না। তবে ব্রাহ্মণদের খাদ্য বিষয়ে ছিল অনেক সংযম—ভোজনে অসংযত ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হত।

তবে শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞে বা দেবযজ্ঞে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের মৎস্য মাংস ভোজন করান হত। তার মধ্যে শশক, শল্লকী, গোধা, কূর্ম্ম, গণ্ডার, ছাগল, মেষ ও হরিণের মাংসই বিধেয় ছিল। মাছের মধ্যে পাঠিন, রোহিত, মাগুর প্রভৃতি পবিত্র।

এ ছাড়া—ছাগ, মহিষ বা গরুর দুগ্ধ প্রচলিত ছিল।

উদ্ভিজ—তরকারি, শাক সব্জীর মধ্যে বা শস্যে ডাল প্রভৃতির মধ্যে কিছু নিরামিষ আবার কিছু মাছ মাংসের মতন অশুদ্ধ বলা হত। তবে সব কিছুই ছিল স্বাস্থ্যের উপর নজর রেখে।

শিল্প-কলার দিক দিয়েও তখন চিত্র-নৈপুণ্য প্রধান ছিল। তাছাড়া নাটক, রঙ্গমঞ্চ, প্রস্তর-শিল্প, মৃৎশিল্প, বস্ত্রশিল্প, সঙ্গীত,

অভিনয়—সব প্রমাণই পাই। দশরথের রাজ্য-বর্ণনায় বাল্মীকি তো পঞ্চমুখ। মহাভারতেও এবিষয়ে বহু প্রমাণ আছে।

শিক্ষা ও দীক্ষা— এরপরই শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যুৎপত্তির জন্য আর্য্যরা করলেন চতুষ্পাঠী। গুরুগৃহে আশ্রম হলো, তারপর হলো, নগরে নগরে বিদ্যালয় পাঠাগার। রাজা আপন সভায় রাখতেন বড় বড় ধুরন্ধর পণ্ডিত ঋষি ও জ্ঞানতপা মহাত্মাদের। তাঁদের কাছে শুনতেন নানা উপদেশ—শোনাতেন সব প্রজাকে নানা উপদেশের বাণী। সে যুগে ছিল না ছাপাখানা, ছিল না গ্রন্থ। হয়তো দু'একখানা পুঁথি হয়েছে—তাল পাতার বুকে বা ভূর্জ্জপত্রে।

এরপর ধীরে ধীরে দেখা দিল বেদ, উপনিষদ স্মৃতি; শ্রুতি, গণিতশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও শিল্পকারু। তবে সেটা ঠিক বৈদিকযুগের শেষ দিকে সন্ধিযুগের পর—উপনিবেশ বা রাজ্যাদি গঠনের পরবর্ত্তী যুগে।

কিন্তু তার আগে সমাজের আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বিচার বা শাসনের প্রথম পর্য্যায়ে যে সব পৌরাণিক ঘটনা ঘটে গেল তার কথা খানিকটা বলা দরকার।

পৌরাণিক কাহিনী তো দশবিশটা নয়—হাজার হাজার। তার মধ্যে আবার শতশত অসম্ভব অস্বাভাবিক ঘটনা এসে জড়ো হয়েছে। দেব-লীলায়, মহামানব বা অতি মানবীয় গুণে যাঁরা তৃপ্ত বা শ্রদ্ধা-ভরে অবনত, তাঁরা সে সব অচিন্তনীয় ক্ষমতা ব'লেই বিশ্বাস কর্ত্তেন। হিন্দুর পারমার্থিক উপদেশও তাই—যুক্তি ও কারণ দিয়ে অতিমানবীয় প্রতিভার বিচার তাঁরা কোনদিনও করেননি. তবে যাঁরা করেন তাঁদের জন্যও সেসব ঘটনার একরকম ব্যখ্যা করা যায় বৈকি! প্রামাণ্য ইতিবৃত্তের নিকষ পাথরে হয়তো তা যাচাই করে নেওয়া চলে কিন্তু ভক্তি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা বা প্রেমের অমৃতধারা নিখিল জনগণকে যে অতি-প্রাকৃত শক্তির কথা স্মরণ করায় এবং পুলকিত করায়—বিচার-বিভ্রাটে তা ঘোলাটে হয়ে যাবেই। তবু আমরা সেই ভাবেই অলৌকিক দুএকটী পৌরাণিক ঘটনার বিচার করে দেখি।

পৌরাণিক সমাজের বিচিত্র কাহিনী—

সমাজ বলো, পুরাণ বলো বা ইতিহাসই বলো বেদই আদি। সেই বেদে ইতিবৃত্তের প্রথম উন্মোচনই হয় বাহৃতি ত্রয়ে। "গায়ত্রী" মন্ত্র উচ্চারণ করে তাই আমরা সেই ব্যাহৃতি মন্ত্রকেই জ্ঞানের প্রধান ও প্রথম পথ বলে মেনে নিয়েছি। এই ব্যাহৃতিত্রয় হচ্ছে—ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ। এর প্রধান্ অর্থে এই ভুবন, তদূর্দ্ধে ভুবলোক ও তারও ওপর স্বর্গ; আর তাতেই পেয়েছি স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের ইঙ্গিত।

আজ অনেকে দক্ষিণে বহির্ভারতীয় দ্বীপকেও পাতাল বলে।

পুরাণে এই পাতালের কল্পনাতেই বলা হয় সংকর্ষণ রুদ্র বা বলরামের কথা—অথবা বিষ্ণুর "শেষ-নাগ"রূপ।

বিচারে দেখা যায়—পাতালের আগ্নেয় গিরি বা দক্ষিণভারতে বা দক্ষিণদিকের বহির্ভারতের অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি দেখেই সেসব কল্পনা হয়তো হয়েছে।

বায়ু পুরাণে আর ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে যে সব দ্বীপের বিবরণ দেখি তাতে বোর্ণিও বা মালয়দ্বীপের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে। অঙ্গদ্বীপ, যবদ্বীপ, শাল্বদ্বীপ, কুশদ্বীপ, বরাহদ্বীপ নামে হয়তো ঐসব দ্বীপপুঞ্জেরই উল্লেখ হয়েছে। সে দেশের লোকের বর্ণনায় আছে—

দীর্ঘশক্রুধরাস্মানো নীলামেঘ সমপ্রভাঃ
জাতমাত্রাঃ প্রজাস্তত্র অশীতি পরমায়ুষঃ

সেখানকার লোক জন্মবামাত্র বা জাতমাত্র লম্বাদাড়ি, নীল মেঘের 'রং আশীবছর পরমায়ু, বানরের ন্যায় ফলমূল-ভোজী আর গোধর্ম্মী (অর্থাৎ গম্যাগম্যবিচারহীন) কু-আচারী হয়।

জন্মাবামাত্র লম্বাদাড়ী বা ৮০ বছর বয়সের সন্দেহটা চট্ করে মিটে যায়, যদি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আবার এই শ্লোকটি দেখি। তাতে আছে জাতমাত্র নয়—'জানুমাত্র' অর্থাৎ তাদের দেহের পরিমাণ, আমাদের জানুমাত্র অর্থাৎ বেঁটে। আর সব বর্ণনা তো সত্য হতেই পারে। বহু দ্বীপেই হয়তো সেদিন মানুষের বন-মানুষের স্বভাব ছিল।

এই ত্রিলোক বা ত্রিযুগের কথা বলবার আগে আর্য্য ভারত—পৃথিবীর উৎপত্তি ও ভগবৎ লীলায় দশাবতার প্রকাশের যে কীর্ত্তন করেছে—আধুনিক মতবাদও নিজের বিচারে তা সমর্থন করে গেছে।

পৃথু ও পৃথিবী—কিন্তু পৃথ্বি কথাটি পুরাণে এল যে পৃথু থেকে—তারও গল্পে আছে যে অদ্ভূত উপাখ্যান, তারই পরখ করি এবার আমরা। বিষ্ণুপুরাণে আছে—অত্যাচারী বেণ রাজা প্রজার রুদ্ররোষে প্রাণ হারাবার পর পুত্র পৃথুই করে পৃথ্বীর উন্নতি। তার আগে ছিল না কৃষি, ছিল না গ্রাম, নগর, পশুশালা, ছিল না স্বার্থবাহী বণিকের দল—বানিজ্যের পথও ছিল না—পৃথুই করলেন সব তাই নাম হলো পৃথিবী।

গল্পটি মহাভারতে আছে চমৎকার ভাবে—ভীষ্ম বলছেন, কি করে হলো গণতন্ত্রের পর রাজতন্ত্র প্রথম রাজা। তখন রাজা বা রাজ্য কিছু ছিল না—বিষ্ণু এক সন্তান সৃষ্টি করলেন বিরজা। নামটির মধ্যে রাজ্যহীনের ইঙ্গিত। তারই বংশে একপুরুষ হলেন বেণ।—বেণ অধার্ম্মিক ও অত্যাচারী ছিল, তাই ঋষিরা কুশাঘাতে তাকে শেষ করলেন—অর্থাৎ জনতা তাকে করলো বধ। তখন তার এক এক অঙ্গ থেকে সৃষ্টি করলেন ঋষিরা এক এক মানুষ। দক্ষিণ উরু থেকে হলো নিষীদ বা নিষাদ জাতি। সত্যই পৃথ্বী বা ভারতের দক্ষিণ দিকেই অসভ্য, অনার্য্য, নিষাদ জাত ছিল। আর দক্ষিণ হস্ত থেকে অর্থাৎ উর্দ্ধাঙ্গ বা উত্তরাঙ্গে হলো পুণ্যবান পৃথু। সবাই করলেন তাকে রাজা। এই রাজাগিরির প্রারম্ভ। শুক্রাচার্য্য হলেন পুরোহিত, বালখিল্যরা হলেন বিভিন্ন মন্ত্রী। সুত, মাগধ সব সৃষ্টি হ'লো।

পৃথিবীর পরই আমাদের কাছে ভারত। অনেকেই বলেন, পূর্ব্বে এরই নাম ছিল জম্বুদ্বীপ। তার কাহিনীও অপূর্ব্ব।

জম্বুদ্বীপের কাহিনী—গন্ধমাদন পর্ব্বতে এগারশ' যোজন উর্দ্ধে ছিল এক জম্বুবৃক্ষ বা জামগাছ। এক একটি ফল হ'ত তার হাতীর মতন—সেই ফলের রসে হলো জম্বুনদী। সে নদী বয়ে গিয়ে তটস্থ বালুকে করতো সোনা। এখন বর্ত্তমান বুদ্ধি নিয়ে অনেকে বিচার

করে বলছেন জম্বু মানে অম্বুতে জাত, জল মধ্য থেকে জাত মাটি—পৃথ্বী বা ভারত। অনেকে বলে জম্বু ফল মানে তুষার-চাপ আর তারই রস বা নদী-ধারাই হয়তো তুষার নদী বা গ্লেসিয়ার। তা থেকে নাম জম্বু—যার অপভ্রংশ জম্মুই আজ কাশ্মীর বা কশ্যপ মেরুর প্রধান রাজধানী। হয়তো গন্ধমাদন ঐ কারাকোরাম পর্ব্বত। ঐ পার্ব্বত্য নদীর তটে স্বর্ণ নাকি পাওয়া যায় আজও। অতএব সেদিন হয়তো এই ভূখণ্ডের নাম ছিল জম্বুদ্বীপ— আর তাই পরে হলো ভরত থেকে ভারতবর্ষ।

সূর্য্য ও সংজ্ঞা—বিশ্বকর্ম্মার ভ্রমিচক্রে সূর্য্যরশ্মি চেঁচে ফেলার কথা। বিশ্বকর্ম্মার মেয়ে সংজ্ঞাকে করেন সূর্য্য বিবাহ। এখন সংজ্ঞা সূর্য্যের বিপুল তেজ সহ্য করতে না পেরে ঘোটকী রূপ ধরে চলে যান তপস্যায়। অর্থাৎ পালাতে চান। তাই বিশ্বকর্ম্মা মেয়ের জন্য—সূর্য্যকে রাজী করিয়ে ভ্রমি-চক্রে তুলে চাঁচতে সুরু করেন। ৭ ভাগ চেঁচে ফেলে ১ ভাগ রাখেন, তাই হয়ে থাকে অক্ষয়।

গল্পটা কি সম্ভব? প্রথমেই তো বলতে হবে আকাশের সূর্য্য কি এসে সংজ্ঞাকে বিয়ে করবে? এই সেই সূর্য্য নামের 'বিবস্বান'—প্রথম মনু। তারপর ধীরে ধীরে অষ্টম মনু পর্য্যন্ত হয়। কিন্তু সংজ্ঞা থাকতে চায় একজনকে নিয়ে—তাই বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বনিয়মে পরবর্ত্তী সাতজন মনুকে ভবিষ্যের গর্ভে বা ইতিবৃত্তের পাতায় রেখে দিয়ে এক সূর্য্যকেই বিবস্বানের প্রতীক করে সৃষ্টি রক্ষা করেন। সাতকে ছেঁটে এক বিবস্বানের প্রাধান্য রক্ষাই হয়তো এ কাহিনীর উদ্দেশ্য। তারপর অন্যান্য গল্প—

পত্নী সংজ্ঞা পালাল তারই মতন এক নারী-ছায়াকে সূর্য্যের জন্য রেখে। ছায়া মানেই এক রকম চেহারা। সূর্য্য চিনতে পারেনি তাকে—সংজ্ঞাই ভেবেছেন—তার গর্ভে হলো এক ছেলে। তার নামও মনু—তবে অন্য মনুর সহোদর নয়—স্ববর্ণ, তাই নাম হলো সাবর্ণি—ইনি অষ্টম। অন্য পুরাণে এই সন্তানের নাম শনি।

দীর্ঘ আয়ু—পুরাণে দীর্ঘ আয়ুর যে কথা আছে সে সবই কল্পনার অত্যুক্তি মাত্র। এর প্রমাণও দেখান যেতে পারে। ন্যায়শাস্ত্রে প্রশংসায় বাড়িয়ে বাড়িয়ে যা বলা হয় তাকে বলে 'উপলক্ষণ। বিষ্ণুপুরাণে কার্তবীর্য্যার্জ্জুনের বয়স—পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর।

তিনি অব্যাহত বল ও শ্রীসম্পন্ন হয়ে বিরাট পরাক্রমে ৮৫০০০ হাজার বৎসর রাজত্ব করেন।

এখন ৮৫ বৎসর রাজত্ব করাও একটা বিশেষ কথা—তার ওপর হাজার গুণটা যদি বর্ণনার বাড়াবাড়ি হয় তবে তো মিটেই গেল। আর হচ্ছেও তাই—কারণ পরের শ্লোকেই বিষ্ণুপুরাণে তার প্রমাণ আছে।

যঃ পঞ্চাশীতি সহস্রোপলক্ষণে কালাবসানে, ইত্যাদি।

অর্থাৎ পঞ্চাশীতি সহস্র উপলক্ষণ কাল গত হলে নারায়ণাবতার পরশুরাম তাকে নিহত করেন। এই 'উপলক্ষণ' তখন লেখা হ'তো কল্পনা বা আশীর্ব্বাদে। "হাজার বছর পরমায়ু হোক"—"শতেক চাঁদের লাবণি মাখিয়া"—"কোটি চন্দ্র সম প্রভা" এসব অত্যুক্তি। বরং "শতংজীব" এইটাই ছিল চরম আশীর্ব্বাদ। তবে অনেক ক্ষেত্রে এ দিয়ে ইতিহাসও হয় স্পষ্টতর, প্রমাণ রৈবত ককুদ্মীর কাহিনী।

রৈবত ককুদ্মী—বিষ্ণুপুরাণে আছে কুশস্থলীর রাজা ছিলেন রেবত। তার একশত পুত্র। বড়টির নাম ককুদ্মী—পিতৃপরিচয়ের পদবী নিয়ে পুরো নামটা হলো রৈবত ককুদ্মী। তার ছিল এক মেয়ে। মেয়ের উপযুক্ত পাত্রের খোঁজে মেয়েকে নিয়ে তিনি চল্লেন ব্রহ্মার কাছে। পথে হা হা, হূ হূ নামক গন্ধর্ব্ব দ্বয় গান করছেন। গানের ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার সুর শুনে তন্ময় হয়ে গেলেন রাজা ককুদ্মী। যখন চেতনা এলো—এসে বললেন, মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। ব্রহ্মা বললেন—কাকে কাকে তার পছন্দ । সব শুনে রাজা অনেকেরই নাম বল্লেন। ব্রহ্মা তো হেসেই খুন। বললেন, এরা তো আজ কেউ'বেঁচে নেই—এমন কি অনেকের বংশও আর নেই। তুমি যাত্রা করেছিলে সত্যযুগে—আজ কলিযুগ আগত। চারটে যুগ পার হয়ে গেছে তোমার ঐ গান

শুনতে শুনতে। তাকিয়ে দেখে সত্যই কন্যার অঙ্গে দীর্ঘ দিনের ছাপ। চঞ্চল হয়ে ওঠেন পিতা। পিতামহ ব্রহ্মা বল্লেন, যাও এখন—এর বর হলো বলদেব। যাও, তার হাতে কন্যা দাও।

রৈবত ককুদ্মী বলরামের হাতে দিলেন এসে রেবতীকে।

দীর্ঘ দিনের ছাপ রেবতীর অঙ্গ থেকে তিনি হল দিয়ে নামিয়ে নিলেন। রেবতী হল যুবতী—পতি হল বলরাম।

এখন বিচারে দেখা যায়—বৈবস্বত মনুর পুত্র কুশস্থলীর রাজা শর্য্যাতি মারা যান সন্তান আর্তিকে রেখে। তাঁর ছেলে রেবত—আর তারই ছেলে ককুদ্মী। এরপর বহুদিন আর তাদের বংশে কোন প্রধান ব্যক্তি হয়নি—২০০০ বছর পর দ্বাপরের শেষে বলরামের বিবাহ। হয়তো রৈবত বংশ রাজ্যহারা হয়ে অরণ্যে কান্তারে গন্ধর্ব্বাদির মধ্যে সঙ্গীত-কলা নিয়ে দিন কাটাবার পর আবার কেউ রাজ্য লাভ করলেন এবং নাম নিলেন নিজ বংশের উপাধিতে রৈবত। তার মেয়ে রেবতী।

বলরামের বংশ একটু হীন হলেও—অর্থাৎ দক্ষিণবাসী হলেও তিনি নিজ বীরত্বে কন্যাকে খর্ব্ব করে নিলেন—এই হোলো হল দ্বারা দীর্ঘ দিনের ছাপ অপসরণ। কাহিনী ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেল।

হলধর—বলরামকে বর্ণনা করা হয়েছে সংকর্ষণনামা রুদ্র রূপে। তিনি তার হল-মুখে সব আকর্ষণ করে ওলোট-পালোট করে দিতেন, দুমড়ে শেষ করতেন—রসাতলে বা সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে দিতেন।

বৃন্দাবনে যমুনা—পুরাণের গল্পে আছে বলরাম মদিরা পানে বিহ্বল হয়ে বৃন্দাবনে বসেই যমুনায় স্নান করতে চাইলেন। অনেকের ধারণা বৃন্দাবন যমুনার তীরে—কিন্তু আজ তা নয়, প্রাচীনেও তা ছিল না। আজকের প্রমাণ তো দেখাই যায়,—প্রাচীনকালের প্রমাণ কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে অক্রুর যখন মথুরায় যান তখন বেগগামী অশ্বের রথে যাত্রা করেও মধ্যাহ্নে পৌঁছিলেন যমুনা তীরে। এ বিষ্ণুপুরাণেই আছে। তাহ'লে অন্ততঃ ৫ ঘণ্টায় ৪০ মাইল গিয়ে রথ যমুনা তীরে পৌঁছেচে। এখন গল্পে আছে বলরাম চাইলেন

যমুনা এতটা এগিয়ে আসুক—যমুনা রাজী নয়, তখন হলধর হলদ্বারা যমুনাকে এমন আকর্ষণ করলেন যে মাটি বেঁকে, তুমড়ে নীচু হয়ে গেল, যমুনাকে বৃন্দাবনের বন-প্লাবন করিয়ে ছাড়লেন। গল্পে আছে—তখন যমুনা বললেন, 'হে হলায়ুধ, আমাকে এবার ত্যাগ কর।' তখন ছাড়লেন। অর্থাৎ ধীরে ধীরে কালের চক্রে যমুনা নিজস্থলে হলেন প্রবাহিতা।

শ্রীকৃষ্ণের ছেলে শাম্ব দুর্য্যোধনের মেয়েকে করেন অপহরণ। বীরদের পক্ষে তখন এ ছিল শ্লাঘ্য প্রথা। দুর্য্যোধনরা তাকে করলেন অবরুদ্ধ। বলরাম শুনে এলেন, ও পদতল-প্রহারে পৃথ্বীকে বিদারিত করতে উদ্যত হলেন। সবদিক উঠলো কেঁপে—বিকট শব্দ হলো, হল-মুখে হস্তিনাপুর আকর্ষিত—আঘূর্ণিত হ'লো—তখন কৌরবগণ শাম্বকে ফিরিয়ে দিয়ে হলধরকে করলেন শান্ত। বলরাম হস্তিনাপুরকে সেদিন গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়ে দেবেন বলেছিলেন—এবং অঘূর্ণিত করেও ছিলেন। বলরাম-শৌর্য্যে এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনকেই বর্ণনা করেছেন স্বয়ং পরাশর উপলক্ষণ ও প্রবাদ রূপে।

যুধিষ্ঠিরের সাতপুরুষ পরে নিচক্ষুর সময় সত্যই হস্তিনাপুর গঙ্গা গর্ভে যায়। নিচক্ষু রাজধানী নিয়ে যান কৌশাম্বী। পরে যা সম্ভব হয়েছে পুরাণকার আগেই তার ঘটনাকে কল্পনায় এঁকেছেন মাত্র।

রাম-সীতা—মাটি নিয়ে গল্প বুঝি পরিপূর্ণ রূপ নিল রামপ্রিয়া সীতার জীবনে। জন্ম তাঁর মাটিতে, হল-মুখে—লয় তাঁর পাতাল প্রবেশে।

রাজা জনক হল-মুখে সীতাকে পেলেন। নিমি ছিল ইক্ষ্বাকুর এক ছেলে। কোন যজ্ঞে নিমি আর পুরোহিত বশিষ্ঠের হয় মতান্তর। কলহ ও অভিশাপ দুজনেই দিলেন দুজনকে। মৃত্যু হলো দুজনেরই। তবে বশিষ্ঠ নিজ যোগ-বলে মিত্রাবরুণের অংশ নিয়ে আবার জীবিত হলেন। আর নিমির সংকল্পিত যজ্ঞ তখনও শেষ হয়নি—সহস্র বৎসরে শেষ হবে, তাই নিমির মৃতদেহ তেলে ডুবিয়ে রেখে ঋষিরা যজ্ঞ শেষ করলেন এবং যজ্ঞান্তে তাকে বর দিতে চাইলেন পুনর্জীবন। নিমি নিতে রাজী নয়। বললেন, না আমি দেহ চাই না। কিন্তু চিরকাল

থাকতে চাই প্রতি দেহে। তাই হলো। নিমি রইলেন নিজ অশরীরি প্রভাবে প্রত্যেকের 'নিমেষে'—চক্ষুর পলকে। পুত্রহীন ছিলেন নিমি। তাই ঋষিরা তেলে ডোবান ঐ দেহ মন্থন করেই তার সন্তান সৃষ্টি করলেন। প্রয়োজনে—অন্যের ঔরসে-জাত পুত্র তখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হ'ত।

জনকের দেহ থেকে জাত পুত্র—তাই তাকে ডাকা হতো 'জনক' বলে। কিন্তু পিতা তাঁর বি-দেহ তাই রাজ্যের নাম দিলেন পুত্র বিদেহ রাজ্য। বংশের নাম হলো বৈদেহ তার সীতাকে বৈদেহীও বলা হতো। আবার—মন্থনে হলো পুত্র তাই জনকের অন্য নাম মিথি—আর রাজ্যের নাম মিথিলা।

এখন আধুনিক বিচারে বলবো নিমি বিদেহ অবস্থায় ছিলেন সহস্র বৎসর, কারণ যজ্ঞ চলছিল—তার মানে নিমির পর প্রায় হাজার বৎসর কোন প্রসিদ্ধ লোক হয়নি। নিমির ভাই বিকুক্ষি—সেই বংশেই হলেন রাম। দেখা যায় বিকুক্ষির ৬০ পুরুষ পরে রাম। কিন্তু নিমির পর সীতা ২২ পুরুষ পরে তবে এই ৩৮ পুরুষ বা হাজার বছর লোপ হ'লো কিসে? অর্থাৎ খ্যাতিপ্রাপ্ত কোন রাজা তাবৎ হয়নি। অখ্যাত ৩৮ পুরুষ বা হাজার বৎসর পর হলো অন্য এক নিমি। তাহলেই রাম ও সীতা হতে পারেন সমসাময়িক।

অতএব নিমির ছেলে যে জনক সে জনক সীতার জনক নন। জনক উপাধি হলো তার বংশের নাম—প্রকৃত নাম তার সীরধ্বজ। সীর মানে 'হল'। তখন প্রতি বীর বা রাজা নিজ নিজ পতাকায় বা ধ্বজদণ্ডে একটি চিহ্ন আঁকতেন। আজ যেমন ভারতের জাতীয় পতাকায় সিংহ চতুষ্টয়ের মূর্ত্তি—যা অশোকের ছিল। অর্জ্জুনের ছিল কপিধ্বজ। সীরধ্বজের ধ্বজ ও পতাকায় মূর্ত্তি ছিল সীর বা 'হল'। সীরধ্বজ সন্তান লাভে যজ্ঞ করলেন— তাই থেকে কবি-কল্পনা হলো সীরে পাওয়া সীতা। সীতার পাতাল প্রবেশও হয়তো তেমনই সাময়িক ভূমিকম্পের ফল। সে রামচন্দ্রের পাপেই হ'ক—বা প্রকৃতির অনমনীয় ব্যথাতেই হ'ক।

আয়ুর্ব্বেদ

তন্ত্রের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদকেও অনেকে পঞ্চমবেদ বলেন। তাছাড়া বেদের মধ্যে ঋগ্বেদে এবং অথর্ব্ববেদেও কিছু চিকিৎসা প্রণালী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে দেখা যায়। সেইসব কথা—চিকিৎসার প্রণালী ও প্রাকৃতিক ঔষধাদির বিবরণ নিয়ে এক লক্ষ শ্লোকে প্রথম আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হচ্ছে "ব্রহ্মসংহিতা"। তারপর সেই অতি প্রাচীন কালেই সেই ব্রহ্মসংহিতাকে ভিত্তি ক'রে আরও কয়েকটি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ গড়ে ওঠে।

হয়তো প্রাগৈতিহাসিক যুগেও তেমন গ্রন্থের অভাব ছিল না। মানুষ যতদিন হয়েছে রোগও ততদিনের এবং তার নিরাময় চেষ্টাও নিশ্চয়ই ততদিনের। তা সভ্য বা অসভ্য যুগের যে পথ ধরেই চলে আসুক।

প্রকৃতির বিপ্লবে, যা তাদের দেহের বিকারে রোগ যন্ত্রণা হতই—আর তাই গাছ, পাতা, রসের সাহায্যে তারা তা থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করতো। বনৌষধি আবিষ্কারের এটাই মূলসূত্র।

ঋগ্বেদে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের স্তবেই আছে যে তাঁরা বিধিবৎ চিকিৎসায় অন্ধের দৃষ্টি দিতে পারতেন, খোঁড়াকে পারতেন হাঁটাতে। বেদেই পাওয়া যায় বিশপ‌লা নামের একটি মেয়ের পা কেটে যাওয়ায় লোহার পা তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন অশ্বিনীকুমার।

তাই প্রাকৃতিক গ্রহাদি বা অগ্নি বায়ু যেমন আমাদের দেবতা—স্বাস্থ্যদানকারী মৌলিক পদার্থ বনৌষধি বা বৃক্ষলতাও তেমনই আমাদের দেবতা। আমরা তুলসীকে জানি দেবী বলে—সোমলতার করি পূজা।

যখন অন্ধকারেই ছিল অন্যান্য দেশ প্রচ্ছন্ন তখনই ভারতে বেদোদ্ভাসিত দীপ্তির মধ্যে আয়ুর্ব্বেদও ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। ভারতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কাছে ঋণের এই স্বীকৃতি আজও কোলব্রুক প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার ক'রে গেছেন।

বর্ত্তমান যুগেও ভারতে ও নেপালে প্রাচীন মৌলিক আয়ুর্ব্বেদের প্রায়

সহস্রাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দেখতে পাই, এক্‌স-রে বা রঞ্জন-রশ্মি প্রভৃতি কয়েকটি আধুনিক পদ্ধতি বাদ দিলে ঔষধ প্রয়োগ ও অস্ত্রোপচার পদ্ধতি এমন কোন নতুন কথা বর্ত্তমান বিজ্ঞান বলেনি—যা হাজার হাজার বছর আগেই এই ভারতে প্রচারিত না হয়েছে।

এমন কি কঠিন অস্ত্রোপচার—শল্য চিকিৎসা, বেদোক্ত টীকা (ভ্যাক্‌সিনেসন) দেবার প্রণালী, নিদান, ঔষধ-প্রস্তুতি, শরীর ব্যবচ্ছেদ, শরীর-বিজ্ঞান, শিশু-চিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা, বিষতন্ত্র বা রসায়ন শাস্ত্র কোনটাতেই প্রাচীন ভারত অনভিজ্ঞ ছিল না।

এখন আমরা সেই বিশ্বের প্রাচীনতম চিকিৎসা-বিজ্ঞানে চিকিৎসা ও ঔষধাদির বিষয় একটু সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করবো। রোগ-চিকিৎসার জন্য প্রাচীন বেদে ও তৎপরবর্ত্তীয় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে প্রধানতঃ রোগের তিন রকমের চিকিৎসা পাই এবং রোগের কারণও পাই ত্রিবিধ। চিকিৎসার প্রধান বা প্রথম প্রক্রিয়া যোগ—প্রাণায়াম, আসন ও মুদ্রা, দ্বিতীয় প্রক্রিয়া উদ্ভিজ বনৌষধি, তৃতীয় ধাতব ঔষধ বা রসায়ন। এছাড়া অথর্ব্ব বেদ বা তন্ত্রাদিতে মন্ত্রশক্তি বা নানা প্রক্রিয়ার কথাও আছে। চিকিৎসার এই কটি পদ্ধতির বিষয় কিছু বলার আগে বলতে হবে, রোগ কি এবং রোগ হয় কেন।

সুশ্রুতে একটি শ্লোক আছে—

"বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলো যথা
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলস্তথা।"

অর্থাৎ সোম, সূর্য্য ও অনিল এই ত্রিদেবতা যেমন বিশ্বসৃষ্টি এবং বিশ্ব রক্ষা ও পোষণ করেন, তেমনই এই ত্রিদেবতাই দেহ-বিশ্বকে পালন ও পোষণ করেন। দেহস্থ এই ত্রি-দেবতার নাম—বায়ু, পিত্ত ও কফ। বায়ু অনিল সদৃশ, পিত্ত অগ্নি সদৃশ, এবং বরুণ জল সদৃশ।

এখন এই বায়ু, পিত্ত ও কফের একটী, দুটি বা তিনটি দূষিত হলেই হয় ব্যাধি। তাই আমরা এই তিনটি বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করি।

বায়ু—বায়ুরায়ুর্বলং বায়ুর্বায়ুর্ধাতা শরীরাণাম্—বায়ু দেহের আয়ুস্বরূপ,

বায়ুই দেহের বলস্বরূপ, বায়ুই শরীরের বিধাতা অর্থাৎ চালন-কর্ত্তা। সেই বায়ু আবার পঞ্চ অঙ্গে পাঁচ রকম।

প্রাণবায়ু—হৃদয়ের শ্বাস গ্রহণে ও ত্যাগে হৃদ্‌যন্ত্রকে সবল কোরে আহার্য্য বস্তুকে উদরে পাঠায় এবং ধমনী সাহায্যে সর্ব্বাঙ্গে রক্ত প্রবাহিত ক'রে শিরা ও স্নায়ুকে নিজ নিজ কাজ করায়।

অপানবায়ু—গুহ্যদেশে অপান বায়ু প্রাণ বায়ুকে আকর্ষণ করে। শ্বাস প্রশ্বাসই মলমূত্র শুক্র প্রভৃতিকে গতিপথে নিয়ে যায়, জল শোষণ ও রজঃ নিঃসরণেও সহায়তা করে।

সমান বায়ু- নাভি দেশ থেকে পেটের পাচক পিত্তকে কাজ করায়। তাছাড়া প্রাণ ও অপান বায়ুর সাহায্যও হয় এই সমানবায়ুতে।

উদানবায়ু—কণ্ঠ দেশ থেকে মানুষের শব্দোচ্চারণে সহায়তা করে বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি সব পুষ্ট হয়, উদানবায়ুতে-যোগতান্ত্রিক পথে প্রধান সহায়।

ব্যান বায়ু—এ থাকে সর্ব্ব শরীর জুড়ে। সমস্ত শরীরে রক্ত সঞ্চারণ সহ পচন ও প্রসারণ, মাথায় রক্ত চালনা—সবই ব্যানবায়ুর কাজ আর শাস্ত্র বলেছে—ঐ ব্যানবায়ু কুপিত হলেই সর্ব দেহে রোগ উৎপত্তি হয়—পঞ্চবায়ুই কুপিত হয় ও মৃত্যু এসে দেখা দেয়।

পিত্ত—পিত্তও পাঁচ রকমের। পাচকপিত্ত, রঞ্জকপিত্ত, সাধকপিত্ত, আলোচকপিত্ত, ভ্রাজকপিত্ত। পাচকে পাচনকার্য্য করা, রঞ্জকে খাদ্য-রসকে করে শোষণ, সাধকে উদ্যম ও উৎসাহ আনে, আলোচকে দৃষ্টি শক্তির সহায়তা করে, ভ্রাজকে আনে কীর্ত্তি, পুষ্টি ও দীপ্তি। 'বিদগ্ধ চাম্লমোহ'—পিত্ত কুপিত হলেই অম্ল হয় ও দেহ বিষময় হয়ে ওঠে।

কফ—কফও পাঁচ রকম--(১) ক্লেদশ্লেষ্মা অন্ন ক্লিন্ন বা গলিত করে। (২) অবলম্বন শ্লেষ্মা সর্বদেহে থাকলেও বিশেষভাবে হৃদয়ে থেকে যন্ত্রগুলো যাতে মরচে না পড়ে তারই কার্য্য করে যায়। (৩) রসনশ্লেষ্মা আশ্রয় করে থাকে রসনা। (৪) স্নেহন বা তর্পক শ্লেষ্মা রস-স্রাবে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের করে তর্পণ—যোগগ্রন্থে একেই বলে সোমধারা।

আর (৫) শ্লেষণ শ্লেষ্মা দেহের অস্থির মধ্যে থেকে তাদের সংঘর্ষ হ'তে দেয় না। এর ব্যতিক্রমেই বাত জাতীয় রোগ সৃষ্ট হয়।

ত্রিদোষ—এখন এই ত্রিবিধ ধাতুর একটি কুপিত হলে তখন এক দোষজ রোগ হয়—তা' অল্পতেই আরোগ্য হয়। যে কোন দুটি কুপিত হয়ে দ্বিদোষজ রোগ হয়. তা' আরোগ্য হতে কিছু বিলম্ব হয়। কিন্তু ত্রি ধাতু বিকৃত হয়ে যে রোগ হয় তা থেকে আর নিস্তার নেই।

এর পর আবিষ্কৃত হয় রোগ বীজাণু-সংক্রমণ। তাতেও প্রাচীন শাস্ত্র বলেছেন—"ক্রিময়শ্চ দ্বিধা প্রোক্তা বাহ্যাভ্যন্তর ভেদতঃ।"

বাইরের ও ভেতরের কৃমি দুরকম। চুলে, চামড়ায় বা শরীরের যে কোন অংশে হয় বাহ্য কৃমি উকুন বা পোকা। 'আভ্যন্তর-কৃমি' হয় দেহের মধ্যে—তাও তিনরকম—কফজ, রক্তজ ও পুরীষজ। এই কৃমি আলোচনা করেই রোগ-বীজাণু পর্ব্বের চূড়ান্ত করে গেছেন প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র।—নাড়ী বিজ্ঞানেও ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এতই দক্ষতা প্রচার করে গেছেন যে যন্ত্র না নিয়েও মাত্র নাড়ী জ্ঞানে এই ধাতু ও বীজাণুর বিকৃতি সম্বন্ধে তাঁরা জানতে পারতেন। রোগতো দুনিয়ায় কত রকমের। তার মধ্যে মূলকারণ এই ত্রিধাতু-বিকৃতি আর তার নিরাময়েও ত্রিধাতুর সম-ভাব-রক্ষা করানই চিকিৎসকের প্রধান কাজ।

প্রথমতঃ যোগ-ক্রিয়ায় তা শুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন সাধকরা। তার মধ্য প্রথম প্রধানই হচ্ছে প্রাণয়াম। শ্বাস ও প্রশ্বাস অবরোধে বা দৈনিক আহ্নিকাদির মধ্যে প্রণায়াম-অভ্যাসে বা ভ্রমণাদি প্রাণায়ামে নানা রোগের উপশম হয়। তারপর আছে নানা রকম আসন ও মুদ্রা। তারই আনুসঙ্গিক ভাবে ধৌতি ক্রিয়াও রোগ উপশমে অনেক সাহায্য করে। তেমনি রৌদ্র স্নানও দেহকে সজীব করে। মাসে অন্ততঃ একাদশী পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপবাসে দেহকে কফহীন করে। পাচক যন্ত্রকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম দিতেই হবে। স্নানও একটি দেহ সুস্থ রাখার প্রকৃষ্ট পন্থা।

এরপরই আসে উদ্ভিজ ও ধনৌষধিতে ভিষকগণের চিকিৎসা।

শত প্রকার রোগের শত প্রকারের বনৌষধি প্রয়োগ এবং ঔষধ প্রস্তুতের নানা প্রণালী সেই প্রাচীন আরণ্য-যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত চলে এসেছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চিকিৎসা জগতে বিজয়ীর গৌরব নিয়েছে রাসায়নিক দ্রব্যনিচয়।

ঋগ্বেদে বা ব্রহ্মসংহিতায় যে বনৌষধির প্রাবল্য ছিল—অথর্ব বেদে তা থেকে মত বদলে গেল। তখন মন্ত্র, তন্ত্র, উচাটন বশীকরণ ও সঙ্গে সঙ্গে নানা ধাতব দ্রব্যে শরীর গঠনের হিড়িক পড়ে গেল।

তবু আপস্তম্ব, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মনীষিগণ অথর্ব্ববেদকে বেদের সম্মান দেননি—তাই সেইসব চিকিৎসকরাও সে যুগে তেমন শ্রদ্ধা পাননি। অথর্ব্ববেদেই আমরা পাই রসায়ন শাস্ত্রের গোড়ার কথা। সীসক প্রভৃতির গুণ-ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ—যা আজ আলকিমি রূপে পরিচিত—তা আমরা পাই অথর্ব্ববেদের বিভিন্ন সূক্তে।

কিন্তু তাহলেও অথর্ব্ববেদ অপাংক্তেয় হয়ে তো রইলই না বরং তার মন্ত্রশক্তি, মারণ-উচাটন বা ইন্দ্রজাল বিদ্যার মোহ অথর্ব্ব বেদকে দৃঢ়ীভূত তো করলোই, সঙ্গে সঙ্গে আগত তন্ত্রকেও স্বাগতি জানালো।

অবশ্য অথর্ব্ববেদ ও চরকের মধ্যে একটা যুগ কেটে গিয়েছে—অন্তত হাজার বছরের বেশী হয়তো তা। তবে চরকই বর্ত্তমান প্রচলিত গ্রন্থের মধ্যে আদি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ।

অনেকে বলেন, চীনা ত্রিপিটকেও চরকের নাম পাওয়া যায়।

চরক নিয়েও নানা মতবাদ। প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে তাঁর যে পরিচয় পাই—তাতে তিনি অনন্তদেব। বেদোদ্ধারের পর অথর্ব্ববেদান্তর্গত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রচারে, তিনি রোগ ও শোক থেকে মানুষকে বাঁচাতে ধরণীতে বিচরণ করেন 'চর' রূপে, তাই তার নাম হ'লো চরক।

পরবর্ত্তী ইতিবৃত্ত এই প্রসঙ্গ নিয়েই বলেছে—অনন্ত দেবই এক মুনির গৃহে জন্ম নেন বেদ-বেত্তা পণ্ডিত রূপে আর তিনিই চরক।

বর্ত্তমান ইতিহাসে পাই বৌদ্ধযুগে রাজা কনিষ্কের গুরু ছিলেন চরক।

কিন্তু ২০০ খৃঃ পূর্ব্বে অর্থাৎ তার ৪০০ বছর আগে পতঞ্জলী টীকা লেখেন চরক সংহিতার, সে হিসেবে চরক আরও আগে অর্থাৎ প্রায় ২০০০ বছরেরও আগে। হয় তো সেই চরকই ছিলেন অনন্ত দেবের প্রভাবে প্রভাবিত ব্যক্তি।

তবে চরকের গ্রন্থে মাত্র বেদমন্ত্র বা বেদোক্ত দেবদেবীর নাম দেখে মনে হয় তিনি বৈদিক যুগেরই লোক। পরবর্ত্তী কনিষ্ক-গুরু বা চীনা ত্রিপিটকের চরক পৃথক ব্যক্তি।

তবে যাই হোক—চরক অথর্ব্ববেদের অনেক পরে। এবং অথর্ব বেদোক্ত শাস্ত্রের সার নিয়ে অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, হারীত ও ক্ষার-পাণি যে সব গ্রন্থ লেখেন তারই সার সঙ্কলনে চরক সংহিতার উদ্ভব।

তার মধ্যে চরক অগ্নিবেশকেই ভিত্তি করেছেন, চরকের চিকিৎসা-শাস্ত্রের সুত্র ও ঔষধ বা রোগ-বিভাগের রীতি অপূর্ব্ব।

প্রথমেই তিনি বলেছেন ঔষধ দুরকম—(১) সুস্থের জন্য (২) অসুস্থের জন্য। সুস্থের স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্য যে প্রণালী তাতে তিনি হয়তো রসায়ণকেই লক্ষ্য করেছেন। তবে ভেষজ ঔষধের মধ্যে তুঁতে হীরা কষ প্রভৃতির মিশ্রন-জাত ঔষধেরও তিনি উল্লেখ করে গেছেন। কিন্তু ভেষজ লতা-বৃক্ষের উপরই তার আসক্তি বেশী। তিনি ঔষধ প্রণালীর প্রারম্ভেই রসনার ছয়রকম স্বাদ—মিষ্ট, কটু, লবণ, টক, তিক্ত, কষায় নিয়ে জান্তব, ভেষজ ও ভূমিজ ঔষধ নির্ণয় করেছেন।

জান্তবের মধ্যে—মধু, গোরস, পিত্ত, চর্বি, মজ্জা, রক্ত, মাংস, মল, মূত্র, চর্ম্ম, শুক্র শিরা, নখ, ক্ষুর, কেশ সব ধরেছেন।

ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি আর ভূমিজ বলতে বলেছেন বালি, চুণ, সেঁকো বিষ প্রভৃতি। এসব ব্যবহার করলেও বনৌষধিতেই তাঁর চরম অবদান। বাৎসায়নের কাম সূত্রে বা শুক্রচার্য্যের শুক্রসারে ধাতুবাদ রৌপ্যরত্নপরীক্ষা বা মণিরাগাকরজ্ঞান প্রভৃতিকে যেমন চৌষট্টি কলায় মধ্যে ধরেছেন চরকও সেই কলা-চাতুর্য্য দেখিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে।

চরকসংহিতাকে তিনি—সুত্র, নিদান, বিমান, শারীর, ইন্দ্রিয়, কল্প, চিকিৎসা ও সিদ্ধিস্থান প্রভৃতি আট ভাগে ভাগ করেছেন।

তবে বনৌষধি বা তার সার ও মূল যে সদ্যফলপ্রসূ তার প্রমাণ যেমন আছে প্রাচীন জ্যোতীষ শাস্ত্রের মূল বা শিকড়ধারণে, তেমনই এ যুগের হোমিওপ্যাথি বা হাকিমী ঔষধে। তবে চরকের পর তারই প্রচলিত নাম ও প্রণালি অনুসরণ করলেও সুশ্রুত অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই আয়ুর্বেদের প্রচার করেন। তাঁরই গ্রন্থে শল্য চিকিৎসার হয় চরম পরিণতি যেমন পরম উন্নতি হয় তান্ত্রিকযুগে রসায়ণ শাস্ত্রের।

এখন তন্ত্রশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের রসশাস্ত্র বিচিত্র ভাবে মিলে গেল—নাগার্জ্জুনের রসরত্নাকর তন্ত্রে বা শিবতন্ত্র রসার্ণবে যেন হিন্দু ও বৌদ্ধ মত এক হ'য়ে গিয়ে রসবস্তু বা দ্রব্যগুণের প্রতি আস্থা প্রদর্শন ক'রে বসলো। ফলে ধীরে ধীরে পারদ বা অন্য রসবস্তু বা রাসায়ানিক প্রক্রিয়া হয়ে উঠলো তন্ত্র-সাধনার এক প্রধান মাধ্যম। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের পর নাগার্জ্জুন এই রসায়নশাস্ত্রে এমনই উন্নতি এনে দিলেন যেন সে এক নূতন যুগের উদয়। তাঁর নাম তখন এতই খ্যাত যে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়ানসাং তাকে বল্লেন পৃথিবীর চতুঃসূর্য্যের অন্যতম।

এখন তন্ত্রে রসায়নের চর্চ্চা কিভাবে এসেছে জানলেও, কি ভাবে হয়েছে তা একটু জানা প্রয়োজন।

রসার্ণবে আছে—"বিশিষ্ট সাধকেরা জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য-পূরণে যাহা আহরণ করেন তাহাই পারদ।"

শিবের উক্তিতে আছে "হে দেবী আমার অঙ্গ থেকে উৎপত্তি তাই পারদ আমারই সমান এবং আমার দেহ-ধর্ম্ম বলেই এর নাম রস।

রসহৃদয়ে আছে—হর গৌরীকে, বললেন "অভ্র তোমার বীজ এবং পারদ আমার বীজ। দুটির সংমিশ্রণে জাত ঔষধ মৃত্যু-নাশক।"

রুদ্রযামলতন্ত্রেও দেখি বর্ত্তমান কেমিষ্ট্রী বা রাসায়নিক নানা কথা।

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থাদির আলোচনা করলে দেখা যায়—বিভিন্ন বিষয়ে আয়ুর্বেদ যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে গেছে সাধারণতঃ তা আট

ভাগে বিভক্ত—শল্য (Major Surgery)শালাক্য(Minor Surgery) কায়-চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা (Demonology) কৌমার ভৃত্য (শিশু-চিকিৎসা) অগদতন্ত্র (Toxicology) রসায়ন তন্ত্র (Elixirs) বাজীকরণ (Aphrodisiacs)। ১০০০ বছর আগেকার লেখা এই সব বিভিন্ন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ আজও পাওয়া যাচ্ছে।

আজ অনেকের ধারণা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানই আমাদের অস্ত্র-চিকিৎসার পথ দেখিয়েছে অথচ অতি প্রাচীনকালে ভারতে সুশ্রুত বলে গেছেন —'শব ব্যবচ্ছেদ ভিন্ন চিকিৎসা বিদ্যা শেখাই যায় না।'

"শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় হবে না—হাতে-নাতে প্রমাণ নিয়ে যে শিক্ষা হয় তাই যথার্থ শিক্ষা" এ বহু প্রাচীন কথা। আজকের লেবরেটারীতে প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাসেই শুধু সে শিক্ষা হয়না—ঢুণ্টুকনাথের উক্তিতে তা বলা আছে। তিনি বলেছেন, 'যারা শিক্ষনীয় বিষয়গুলি পরীক্ষাদ্বারা হাতে-নাতে প্রমাণ করে দেখাতে পারে তিনিই শিক্ষক— যারা শিখে অধ্যয়নের কাজে লাগাতে পারে তারা প্রকৃত শিক্ষার্থী— যারা তা পারে না সেই শিক্ষক ও ছাত্র রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা মাত্র।"

এর পরই পাই বাগভট্টের 'অষ্টাঙ্গ-হৃদয়' চরক, সুশ্রুত ও বাগভট্টকেই 'বৃহত্রয়ী' নাম দিয়েছে।

যে ভারতে প্রায় ২৫০০ বছর আগে তক্ষশিলাতে সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবক কুমার ভট্ট আত্রেয় মুনির কাছে চিকিৎসাবিদ্যা শিখেছেন সেখানে আজ ধাত্রীবিদ্যা নাকি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার নিদর্শন। অথচ এই কুমার ভট্ট উপাধিটিই প্রাচীনতার প্রমাণ। কুমার ভট্ট মানেই হলো কৌমারভৃত্য। কৌমারভৃত্য আয়ুর্বেদের অষ্টম শাখা, এবং বর্ত্তমান নার্সিং বা ধাত্রীবিদ্যার প্রকৃত রূপ।

পরবর্ত্তী যশোধর প্রণীত রসপ্রকাশ সুধাকরে পাই কর্পূর রসের (calomal) ব্যবহার—তিনি বহুবিধ প্রক্রিয়া করে বলেছেন 'আমি নিজে পরীক্ষা না করে কিছু লিখছি না।'

পরবর্ত্তী যুগের একখানি অমূল্য গ্রন্থ রসসার। এতেই পাই

অহিফেনের উল্লেখ। তবে তিনি অহিফেনকে বিষ না বলে বিষধর সামুদ্রিক মাছ বলেছেন।

''সমুদ্রে চৈব জায়ন্তে বিষমৎস্যশ্চতুর্ব্বিধাঃ
তেভ্যঃ কেনং সমুৎপন্নম অহিফেনো বিষং যথা।"

হয়ত সে রকম এক গুণ সামুদ্রিক মাছেও ছিল। তবে অহিফেনের উল্লেখ পাই ১৩০০ খৃষ্টাব্দের লেখা এই গ্রন্থে।

পরবর্ত্তীকালে রচিত প্রসিদ্ধ-গ্রন্থ-'শার্ঙ্গধর সংগ্রহ'। এতে সপ্তধাতুর কথাও আছে। কাঁসা, পিতলের উল্লেখ নেই শুধু দস্তার কথা আছে।

আধুনিক যুগে—রসেন্দ্রসার, রসমঞ্জরী, রসমঙ্গল, রত্নাকর, রসামৃত প্রভৃতি বহুগ্রন্থ ভারতীয় রাসায়নিক বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে গেছে।

এরপরই এলো ১৫০০ খৃষ্টাব্দের কাল-প্রবাহ-ধরে ফিরিঙ্গী পর্ত্তুগীজরা ভারতের বুকে—নিয়ে এলো এক নূতন রোগ। রসপ্রদীপ নামক গ্রন্থে এই রোগ ফেরঙ্গ নামে অভিহিত হলো। ভারতের আয়ুর্ব্বেদ ঔষধও স্থির করে ফেল্লো। আজ সেই রোগকেই সবাই বলে 'সিফিলিস।'

এই রোগের যে ঔষধ দানে উন্মুখ হলো চীনের ব্যবসায়ী তা হচ্ছে—যবচিনি ও পারদঘটিত ঔষধ—আজ যাকে বলি ক্যালোমেল। তবে অর্কপ্রয়োগে শঙ্খ দ্রব ও পারদ সহযোগে এর ঔষধ প্রথম নির্ণীত হয়। এ অর্ক সূর্য্য নয় সম্ভবতঃ আরবী শব্দ 'আরক' থেকে নেওয়া। এরপর রচিত হলো ভাবপ্রকাশ এবং মাধব-রচিত 'রস কৌমুদী।' এ মাধব কিন্তু নিদান সংগ্রহকার মাধব নন।

ভাবপ্রকাশেই আবার দেখি বনৌষধির পুনঃপ্রচার ও প্রতিষ্ঠা।—

এত প্রাচীন যে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ও রসায়ন ভারতকে গৌরবান্বিত করেছে—বহির্ভারতে তার প্রভাব ও খ্যাতির বিষয় আলোচনা করে এবার আমরা এ বিষয়টি শেষ করবো।

পূর্ব্বেই বলেছি, গ্রীকের বহু পণ্ডিত আরবের মাধ্যমে—আরবে আহূত বহু ভারতীয় পণ্ডিতের কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেছেন—আজও তা গ্রীক-জনগণের মধ্যে প্রবাদ-বাক্যের মতন স্বীকৃত।

তাছাড়া আজও ইংলণ্ডের খ্যাত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী অনুমোদিত nature নামক পত্রিকায় উক্ত হয়েছে যে—'রসার্ণব তন্ত্রাদি পুস্তকে উর্দ্ধপাতন, অধঃপাতন, তির্য্যকপাতন, ধাতু নিষ্কাশন প্রভৃতি বিষয়ে যে সব বর্ণনা আছে তা অপূর্ব পর্য্যবেক্ষণ শক্তিরই সাক্ষ্য। ইংলণ্ডে বেকন যে পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচার করেছেন, ভারতে বহুদিন পূর্ব্বেই তার প্রচলন ছিল।"

মঙ্খ নামক জনৈক ভারতীয় চিকিৎসক একদিন বিশ্বখ্যাত হারুণ-অল্-রসিদের আমন্ত্রণে দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসায় আরবে যান। এবং খলিফার অনুরোধে ও প্রেরণায় সুশ্রুত ও চরকের অনুবাদ করেন।

মহম্মদ বিন ইশাক রচিত কিতাব-অল ফিরিস্ত বা হাজী খলিফা বা ইবন-আবু-উসাইবিয়া ৭০০ বছর আগেই লিখে গেছেন—"বহু হিন্দু পণ্ডিত খলিফাগণের আমন্ত্রণে বাগ্‌দাদে আসেন এবং আরবীয় বৈজ্ঞানিকবৃন্দ তাদের কাছে বিজ্ঞান-চর্চ্চা শেখেন। এমন কি আরবীয়গণ ভারতে গিয়ে বিজ্ঞান চর্চ্চা করলেই পণ্ডিত বলে স্বীকৃত হতেন।

এরই একটি প্রমাণ পাই—ভারত লুণ্ঠনকারী সুলতান মামুদ যখন থানেশ্বর বা সোমনাথের মন্দির ভেঙ্গে সকল ঐশ্বর্য্য নিয়ে নিজের দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন, তখন তারই এক সঙ্গী ভারতের জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চ্চায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ভারতীয় গুরু গৃহ গুরু-পদতলে বসে সাংখ্য বা দর্শন অধ্যয়ন করতে বিজ্ঞান চর্চ্চায় হলেন আত্মহারা। আজও তাঁর চরক-সংহিতার অনুবাদ আরবের এক অপূর্ব সঞ্চয়—যে সঞ্চয় দিয়েই আরব সেদিন পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রচার করে।

সিন্ধু প্রদেশ যখন খলিফা মহম্মদের অধীন তখন—সেই ৭৫৩ খৃঃ পূর্ব্বেই—ভারতীয় 'ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত' 'খণ্ড খাদ্যক' প্রভৃতি গ্রন্থ আরব ভাষায় অনূদিত হয়ে সেখানে যায়। আর সে সব কথা প্রাচীন টলোমির জ্ঞান প্রচারের অনেক আগের কথা। আজ পাশ্চাত্ত্যজগৎ সর্বতোভাবে আয়ুর্বেদ বা রসায়ন বিদ্যার জন্য যে ভারতের নিকট ঋণী এ অস্বীকারের আর উপায় নেই।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলা আছে শুনলেই আমাদের, মন ছোটে অ-দৃষ্ট সেই ভাগ্যের কথা জান্‌তে·যা আছে ভবিষ্যতের গর্ভে। তা যদি কোন রকমে জেনে নেওয়া যায় তবে ঘোড়দৌড় থেকে সুরু করে জীবনের দৌড়টাও কি সহজেই না বুঝে নেওয়া চলে। আমরা কিন্তু সেদিক দিয়ে আলোচনা করবো না—কারণ অ-দৃষ্ট যা, তাকে দৃষ্টের মধ্যে তুলে ধরার দায়িত্ব আর নেবো না।

তবে সে জটিল শাস্ত্রে ফলিত জ্যোতিষের মূলে যে গণিত জ্যোতিষ—তার একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। তবে জ্যোতির্বিদ্যা কতদিনের প্রাচীন এবং ভারতে এর জন্মস্থান কিনা এটা আগে জানা দরকার। গ্রীক, পারস্য, আরব, চীন সকলেই জ্যোতির্বিদ্যার জন্মস্থান বলে পরিচিত হতে চায়। কিন্তু চীনকে যদি বা মানা যায় অন্য আর কোন দেশই যে ভারত থেকে জ্যোতির্বিদ্যায় প্রাচীনতম নয় এর প্রমাণ আমাদের বেদ আর পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের স্বীকারোক্তিতেই আছে।

আমাদের ঋগ্বেদে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ উপগ্রহের স্তুতি ও বন্দনা এবং যজ্ঞাদির কাল নির্ণয়ে গ্রহসংস্থাপনের বিচার পদ্ধতি তৎকালীন জ্যোতির্বিদ্যা অনুশীলনের স্বাক্ষর।

ইতিহাসেও এর বেশ নজীর পাই। ৫০০০ বছর পূর্বে যন্ত্র ব্যতিরেকে ভূয়োদর্শনেই যখন ভারতে তিথি বা গ্রহণাদি নির্দ্ধারিত হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গে পৃথিবীর গোলত্বের উল্লেখ হয়েছে, তার অনেক পরে পাশ্চাত্ত্য জগতের পণ্ডিত শিরোমণি য়্যারিষ্টোটল বলেছেন, "গোলকই সর্বাপেক্ষা সুগঠিত ও সুশৃংখল আকৃতি এবং সেই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-কুশলীর নির্ম্মাণে সুগঠন ও শৃঙ্খলাই স্বাভাবিক। অতএব পৃথিবীর পরিধি গোলাকার।" আবার—"পূর্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখী গতি সর্বাপেক্ষা সম্মান জনক, সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহ সূর্য্যদেব অবশ্যই সেই গতি অবলম্বন করেন"।

এসব উক্তি দার্শনিক বোধের নিদর্শন হতে পারে, কিন্তু যান্ত্রিক-যুগোপযোগী প্রামাণ্য বিচার-সহ মোটেই নয়।

গ্রীসের সুপ্রাচীন জ্যোতির্বিদ টলেমি সেদিনও বলে গেছেন, "পৃথিবী নিশ্চল—সৌরমণ্ডলের গ্রহগণ পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে।" অথচ প্রায় সেই সময়েই এই ভারতে আর্য্যভট্ট স্থির ক'রে গেলেন—"পৃথিবীর নিজস্ব একটি দৈনিক গতি আছে—সূর্য্যের চারিধারে এর একটি বার্ষিক গতি আছে, পৃথিবীর আবর্তনের দ্বারাই গ্রহসমূহের আবির্ভাব ও তিরোভাব সাধিত হয়।" কারণ হিসেবে বল্লেন "প্রবহ-বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া পৃথিবীর এই আবর্তন।"

প্রায় ৮০০ বছর আগে ভাস্করাচার্য বলেছেন বায়ুমণ্ডল ১০ যোজন অর্থাৎ ৫৫ মাইল—আজ যন্ত্র বিজ্ঞানে তা ৫০ মাইল। চন্দ্রের ভগন-ভোগ, সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতানুযায়ী ২৭.৩২১৬৭ আধুনিক যন্ত্র-প্রমাণে ২৭.৩২১৬৬। এর পরও কি বলতে হবে, ভূগোল বৃত্তান্ত পাশ্চাত্ত্যের দান?

এ যুগেও বেলী প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ 'হিন্দুজ্যোতিষ' নামক গ্রন্থে বলে গেছেন—"সম্ভবতঃ খৃষ্টের ৩০০০ বছর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গ্রহগণের গতি পর্য্যবেক্ষণ করা হইত।"

বেদের সংহিতায় ও ব্রাহ্মণভাগের "অধ্যর্য্যুহিঃ পঞ্চভিঃ সপ্তবিপ্রাঃ' উক্তিটি সপ্তর্ষি ও পঞ্চগ্রহকেই বুঝিয়েছে। সাতাশটি নক্ষত্রও বেদের কথা। তাই বেদাঙ্গ রূপেই জ্যোতিষের পরিচয়।

আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ছিল কিনা তার প্রমাণ না থাকলেও ভারতীয় হিন্দুর রক্তে রক্তে যে সংস্কারের ডাক এবং ধর্মনিষ্ঠায় প্রতি কর্ম্মকাণ্ডে যে গ্রহ-নক্ষত্রের স্বীকৃতি তাতে উর্দ্ধলোকে দেবতার সম্মানে ভারতীয়গণ সৌর-জগৎকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

সত্যই তো আমরা নিত্য দেখি, উষায় সূর্য-উদয়, সূর্য্যাস্তের পর চন্দ্রের আবির্ভাব আর পাশে পাশে তারার ঝিকিমিকি। তার মধ্যে আবার দেখি শুক্লপক্ষের ও কৃষ্ণপক্ষের দুই রূপ—আর তা থেকেই হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীতে বসে হয়তো সে যুগের লোকও

সহজেই বুঝে নিয়েছে ঘূর্ণায়মান বলেই পৃথিবীর আবেষ্টনী-পথে কখনও সূর্য্য দেখি, কখনও চন্দ্র দেখি—আবার কখনও দেখিনা।

তিথি, পক্ষ ও মলমাস—

প্রথম দিকে দৃশ্যমান চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলো সহ্য করা যায় বলেই চন্দ্রের গতি-পথ ধরেই হয়তো গ্রহের গতি-গণনা সুরু হয়েছিল। আর সেই জন্যেই সৌরজগতের বা পৃথিবীর মাঝামাঝি একটি জায়গাকে মহাবিষুব কেন্দ্র নাম দিয়ে তার কাছাকাছি কৃত্তিকা নক্ষত্রটিকে চন্দ্রের যাত্রারম্ভের খুঁটি করেছেন। কৃত্তিকা নক্ষত্র থেকে যাত্রা সুরু করে চাঁদ আবার সেখানে ফিরে এলেন সাড়ে সাতাশ দিনে। প্রথম প্রথম পথটাকে তাই আটাশ ভাগ করলেও শেষ পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম হিসেবে পুরো পথটাকে সাতাশ ভাগে ভাগ করে, প্রতি ভাগের নাম দেওয়া হলো নক্ষত্র-লোক। সেই নক্ষত্রলোকের নক্ষত্র-পুঞ্জের মধ্যে যে তারাটি স্পষ্ট বা উজ্জ্বলতর তার নামেই পুরো লোকটা পরিচিত হলো। আর সাতাশটি তারাকে চন্দ্রের সঙ্গিনী করে নিয়ে পুরাণ নানা কাহিনী রচনা ক'রে বসলো।

কিন্তু গোল বাধাল ঐ পূর্ণিমা বা অমাবস্যা। অমাবস্যা অন্ধকার—পূর্ণিমা স্পষ্ট। কিন্তু পূর্ণচন্দ্র দেখলাম ৩০ দিন পরে। হয়তো তাই পূর্ণিমা স্পষ্টতর বলে ত্রিশ দিনে মাস হ'লো। আর পূর্ণিমা অমাবস্যা দুটি পক্ষেরই হিসেব হ'লো ১৫ দিন ক'রে। শুক্লপক্ষে প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া করে ১৪ দিনে চতুর্দ্দশীর পর পূর্ণচন্দ্রে হয় পূর্ণিমা। আবার কৃষ্ণপক্ষে ঐ ভাবে প্রতিপদ থেকে ১৪ তিথি শেষ করে আসে অমাবস্যা, অথচ চন্দ্রের গতি তারার পথে শেষ হয় সাড়ে সাতাশ দিনে। এই ২৭৷৷০ দিনের কমতির আড়াই দিনের হিসেবটা ধরা যায় কি ক'রে?

কম্‌তিটা সূর্য্যের প্রতীয়মান গতির মধ্যে লুপ্ত থাকলেও, বারমাসে বছর শেষ করে চাঁদ থেকে তিথি, মাস, বছর, নির্দ্ধারিত করা হলো এবং পরবর্ত্তী কালে ঐ বাড়তি সময়টা নিয়ে মলমাসের উদ্ভব হলো।

চন্দ্র ও রাশি—

তবে এই গোলমালটা মেটাবার জন্যই অনেকে চান্দ্র মাসের পরিবর্তে সূর্য্য ধরে সৌরমাস ঠিক করতে চাইলেন এবং বারটি ভাগে গতিপথকে ভাগ করে নিলেন। এই বারটি ভাগের নামই হ'লো বারটি রাশি—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

এখন ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে যেমন প্রাচীনতর তিথি বা চান্দ্রমাসই হলো প্রধান—গণনায় কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদগণ—সৌরমাসকেই আশ্রয় করলেন। সূর্য্য যে কটি দিনে এক রাশি থেকে অন্য রাশি অতিক্রম করছে—সেই দিন-সমষ্টিকে বলা হলো সৌরমাস। তিথি হলো চন্দ্র নিয়ে, রাশি হলো সূর্য্য নিয়ে। তবে প্রতিটি রাশিতে দুটি নক্ষত্র ও তৃতীয়টীর এক চতুর্থাংশের অবস্থান হল। যেমন অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকার ¼ অংশ হল মেষরাশিতে আবার কৃত্তিকার ¾ অংশ রোহিণী আর মৃগশিরার অর্দ্ধ নিয়ে হলো বৃষরাশি। এই ভাবে ১২ রাশিতে ২৭ নক্ষত্র বসে রইল।

জ্যোতিষশাস্ত্রের আদি আবিষ্কার এই তিথি বিভাগও যে ভারতের দান এ মানতে অনেকে রাজি নন। বলেছেন চীন বা আরবই এর আদি আবিষ্কারক। কিন্তু আবার বেণ্টলী প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ ধুরন্ধর পণ্ডিতগণ বলেছেন—"চীনবাসিগণ তিথি বিভাগের জন্য প্রধানতঃ হিন্দু জ্যোতিষের নিকট ঋণী" অবশ্য আবার অন্য পণ্ডিতরা বলেছেন—"চীনা কি আরব জ্যোতিষী কেহ কাহারও কাছে ঋণী নয়, তাঁহারা উভয়েই এক তৃতীয়স্থান হইতে এই জ্ঞান লাভ করেছেন।" সে তৃতীয় স্থান কি ভারত নয়?

এইভাবে ভারত-গৌরবকে অপহরণ করতে চেষ্টা পাশ্চাত্ত্য দেশ কম করেন নি। কিভাবে তা যে সম্ভব হয়েছে তাতো আজও সাধারণ স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকে মুদ্রিত ভৌগোলিক বিবরণেই বোঝা যায়।

বিদেশীর গর্ব—পৃথী যে গোল পৃথিবীই যে সচলা এসবই নাকি বিদেশীদের আবিষ্কার কি অপূর্ব মিথ্যা রচনা। আমরা ভূ-বৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে তারও আভাস দিচ্ছি।

পৃথিবীর গতি ও আকৃতি—পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে যখন সভ্যতার ক্ষীণ আলোক প্রবেশ করেনি, তখনই ঐতরেয় ব্রাহ্মণ স্পষ্টতঃ বলেছে 'স বা এষ ন কদাচনস্তমেতিনোদতি।' অর্থাৎ রাত্রি অবসান হইলে প্রাতঃকালে যখন সকলে মনে করে সূর্য্য উদিত হইলেন, বাস্তবিক তখন সূর্য্য আপনাকে বিপর্য্যস্ত করেন। দিবাবসানে লোকে যখন মনে করে সূর্য্য অস্তগত—বাস্তবিক তখন সূর্য্য বিপর্য্যস্ত হইলেন (অন্যের ভ্রমণ দ্বারা অলক্ষ্যে গেলেন) সূর্য্যের সম্মুখভাগ দিবা, বিপরীতভাগ রাত্রি। সূর্য্য উদয় হয় না, অস্তও যায় না।

এই উক্তিটি দেখেই বিখ্যাত পণ্ডিত মনিয়র উইলিয়ম বলেছিলেন "কপারনিকসের জন্মের ২০০০ বছর আগে যে দেশের 'ব্রাহ্মণ' এ কথা বলেছেন তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েই আমাদের তর্ক শেষ করতে হয়।

বিষ্ণু পুরাণে আছে—"নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদা সতঃ
উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ।

এ গেল উদয়াস্ত ও পৃথ্বীর গতি নিয়ে হাজার হাজার বছর আগের কথা—এর দু-চার হাজার বছর পরে কপারনিক্স প্রচার করেন—আবিষ্কার করেন এ বৃত্তান্ত! সেদিন আবার তারও আপত্তির ধুম উঠেছিল—এমন কি পাশ্চাত্ত্য সভ্য জগতেও। ভূ-ভ্রমণবাদ অস্বীকারে সে দেশবাসী এত দৃঢ় ছিলেন যে মহাপণ্ডিত গ্যালিলিওকে পৃথিবীর গতি আছে বলায় প্রাণ দিতে হয়।

ভূ-আকৃতি নিয়েও প্রাচীন ভারতে আর্য্যভট্ট বলেছেন—

'যদ্বৎ কদম্বপুষ্প গ্রন্থিঃ প্রচিতঃ সমন্ততঃ কুসুমৈঃ।
তদ্বদ্ধি সর্ব্বসত্ত্বৈর্জলজৈঃ স্থলজৈশ্চ ভূগোলঃ॥"

বরাহমিহির বললেন—পৃথ্বী বর্ত্তুলাকার—সমুদায় পৃষ্ঠভাগ বৃক্ষ, পর্ব্বত, নগর, সাগর, নদ, নদীতে সমাচ্ছন্ন।

মাধ্যাকর্ষণ—ভাস্করাচার্য্য বললেন—ভূপিণ্ডের কোনও আধার নেই; নিজের শক্তিতেই থাকে দৃঢ়ভাবে। এমন কি পুরাণের কূর্ম্মাদি আধার কল্পনাও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে তিনি সে যুগেই খণ্ডন করেছেন।

তবে অনন্তনাগকে অখণ্ড আকাশরূপেও ব্যাখ্যা হয়েছে সে যুগেই। মাধ্যাকর্ষণের যে কথা নিউটন বলেছেন সপ্তদশ শতাব্দীতে—ভাস্করচার্য্য তা বলেছেন আরও ৫০০ বছর আগে।

সেদিন ভাস্করাচার্য্য বিনা যন্ত্রে শুধু জ্ঞান-লব্ধ দৃষ্টি দ্বারাই বলেছেন "পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি বশতঃ শূন্যস্থিত গুরু বস্তু পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। তখন আমরা মনে করি জিনিসটি পড়িতেছে।"

আবার বলেছেন "সমেসমন্তাৎ ক্বপতত্বিয়ং মে"—গ্রহরা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করলে পৃথ্বীই বা কোথায় পড়বে?

এসব কথা এ যুগের নয় সে যুগের। যান্ত্রিক-বিজ্ঞান নয়, বোধ-বিজ্ঞানের কথা। পুরাণে আছে পৃথ্বী দর্পণের ন্যায় সমতল। ভাস্কর খণ্ডনের জন্য প্রশ্ন করলেন—তবে দূরবর্তী উচ্চ প্রদেশের সূর্যকে মানুষ ভ্রমণ করিতে দেখে না কেন? তিনি বলেছেন—

"সমো যতঃ স্যাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ
পৃথ্বী চ পৃথ্বী নিতরাং তনীয়ান্
নরশ্চ তৎপৃষ্টগতস্য কৃৎস্না
সমেব তস্য প্রতিভাত্যতঃ সা।"

অর্থাৎ পরিধির শতভাগ যেমন সমান মনে হয়—বেঁকা মনে হয় না, তেমন অতি বৃহৎ পৃথ্বীর তুলনায় মানুষের পুরো দৃশ্য সমান মনে হয়।

তবে এসব যুক্তি নিয়েও কত তর্ক কত প্রতিবাদ যে যুগেই হয়েছে পণ্ডিতদের মধ্যে—এমন কি গুরুর বিরুদ্ধে শিষ্যের। বরাহ মিহির বা আর্য্যভট্টরই শিষ্য একযোটে আর্য্যভট্টকে প্রতিবাদে বিপর্য্যস্ত করতে চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্ত্য জগতেও যখন কোপারনিক্স ভূ-ভ্রমণবাদ আবিষ্কার (!) করলেন তখনও টাইকো, ব্রূহি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ করেছিলেন কত না আপত্তি ও শ্লেষ! সে তো মাত্র ১৬০০ খৃষ্টাব্দের কথা অর্থাৎ ৩।৪ শত বৎসর আগের কথা। তখনও পাশ্চাত্ত্যের মহাপণ্ডিতগণ পৃথিবী যে সচল তা মানতে চাননি—যা বলে গেছে হাজার হাজার বছর আগে প্রাচীন ভারত।

সৌরজগতে বিভিন্ন এই গ্রহাদি থেকেই মানুষ তার জীবনের কথা জানতে চায়—তাই তারা প্রথমত অয়ন গ্রহ-গতি নির্ণয় করলো।

অয়নাংশ—অয়ন কথাটির অর্থ হচ্ছে গতি। কিন্তু কার গতি? আসলে ঘুরছে পৃথ্বী বা অন্য গ্রহ—সূর্য্যের চারিদিকে। অথচ আমাদের মনে হচ্ছে সূর্য্য ঘুরছে। আমাদের ঘোরাটা টের পাই না। তাই সূর্য্যের গতি ধরেই আমরা সব বিচার করে থাকি।

সূর্য্যই সব গ্রহণের প্রসবয়িতা—তাই সূর্য্যের নাম সবিতা. আর সূর্য্য তাদের ধারণ বা গ্রহণ করে আছে বলেই তাদের নাম গ্রহ।

এই গ্রহরা আছে সূর্য্য থেকে দূরে দূরে—পরে পরে সাজান—আর তারই মধ্যে পৃথিবী আছে সূর্য্যের ৯ কোটি ৫০ লক্ষ মাইল দূরে। পৃথিবীর পরিধী ২৫০০০ মাইল—ব্যাস ৭৯২৫ মাইল। আকার গোল, দু পাশে চাপা। সূর্য্য পৃথিবীর গতিপথের ঠিক মাঝে নেই, একটু এক পাশে এগোনো—তবু মোটামুটি ডিমের মত পথ ধরে কমলার মতন আকারের পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে পুরো একটি বছরে।

ঋগ্বেদেই পাই পৃথ্বী-গাত্রে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মাঝামাঝি জায়গায় যে কল্পিত বৃত্তরেখা ঘিরে আছে তার নাম নিরক্ষ-বৃত্ত। রেণু ঋষি নাম দিলেন 'বিষু'—তাই তাকে বিষুব রেখাও বলা হয়।

এই রেখা থেকে উত্তর মেরুর দিকে ২৩০°২৮' দূরে দূরে কল্পনা করা হল—বিষুব রেখার পর কর্কট ক্রান্তি আর সুমেরু বৃত্ত।

মেরু থেকে সুমেরু বৃত্ত হল হিমমণ্ডল—সুমেরু বৃত্ত থেকে কর্কট ক্রান্তি পর্য নাতি শীতোষ্ণ মণ্ডল—কর্কট ক্রান্তিথেকে বিষুব রেখা পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম মণ্ডল।

ঠিক এই ভাবেই দক্ষিণ দিকে রইল কুমেরু বৃত্ত আর মকর ক্রান্তি। মণ্ডলও হল—হিম মণ্ডল, নাতি শীতোষ্ণমণ্ডল ও গ্রীষ্ম মণ্ডল।

বেদের ঋকের নানা প্রমাণিত উক্তি দিয়ে এবং 'শুনঃসেফ' নামটি দিয়েই প্রাচীন আর্য্যগণ বলে গেছেন যে পৃথ্বী (শুনঃ+সেফ) একটু হেলান ভাবে শুয়ে ঘুরছে। পথটা হল কক্ষা।

হিমমণ্ডলে তো সূর্য্য ৬ মাসে একবার জাগে।

সূর্য্যর অয়ন পথ হল—ঐ কর্কট ও মকর ক্রান্তির মধ্যে।

সূর্য্যের গতিটিও আবার চার রকমের।

১। আহ্নিক গতি—পৃথ্বী নিজে নিজে ২৪ ঘণ্টায় নিজের কক্ষ পথে যে ঘুরছে—যাতে দিন আর রাত হচ্ছে—তাই আহ্নিক গতি।

২। বার্ষিক গতি—এখানে পৃথ্বী সূর্য্যের চারি ধারের কক্ষ পথে ৩৬৫ দিনে ঘোরায় হচ্ছে একটি বছর।

৩। অয়ন গতি—কর্কট ও মকর ক্রান্তির মধ্যে যে সূর্য্যের যাতায়াত—তাই হল তার অয়ন গতি।

৪। অধিশ্রয়—অন্য মতে সৃষ্টির প্রথমে সূর্য্য ছিল পৃথ্বী কক্ষরে উত্তর অধিশ্রয়—এখন দক্ষিণ অধিশ্রয়ে।

সূর্য্য ঘুরছে এ সবই কিন্তু পৃথ্বী ঘোরার দরুণ বলছি, তবে সূর্য্যর নিজস্ব একটি গতিও আছে। ২৫ দিন আট ঘণ্টা দশ মিনিটে সূর্য্য নিজে নিজে পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে একবার ঘোরে। এ নিয়ে মতবাদও বিভিন্ন। আবার ইংরাজিতে যাকে বলা হয় Anomalistic আমাদের শাস্ত্রে তাকে বলে মন্দোচ্চর গতি। কক্ষ পরিবর্ত্তনের গতি এটি—এতে একবার পৃথ্বী আসে সূর্য্যের কাছে, একবার যায় দূরে। এটা সূর্য্য প্রদক্ষিণ পথের সঠিক মধ্য বিন্দুতে না থাকারই ফল হয়তো।

পৃথ্বী যে ঘুরছে বা সূর্য্যের যে দুরকম অয়ন-গতি—সেই উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে পৃথিবী হেলে থাকার দরুণ কর্কট ক্রান্তিতে যেদিন সূর্য্যের কাছে যায় সেই দিনটি ২১শে জুন—উত্তর গোলার্দ্ধে সব চেয়ে বড়দিন সেদিন, আর সবচেয়ে ছোট রাত। তারপর সূর্যকে দক্ষিণে রেখে পৃথ্বী বিষুব রেখার দিকে এগিয়ে যায়—মনে হয় সূর্য্য দক্ষিণে অয়ন করছে। যত এগোয় দিন ক্রমে ছোট হতে থাকে। যেমনই বিষুব রেখার সামনা সামনি হল—সমসূত্রে বিষুব রেখায়এল সূর্য্য ও পৃথ্বী, সারা বিশ্বে দিন আর রাত হল সমান, সেটা ২৩শে সেপ্টেম্বর। এটাই হল জল-বিষুব সংক্রমণ বা শারদীয় ক্রান্তিপাত।

আবার পৃথ্বী এগোতে থাকে, দিন ছোটই হচ্ছে, রাত হচ্ছে বড়— এই ভাবে যেমনই সে এল দক্ষিণ দিকে মকর ক্রান্তিতে ২৩শে ডিসেম্বর হ'লো সবচেয়ে ছোট দিন, রাত সবচেয়ে বড়। ঐদিনই দক্ষিণায়ণ শেষ। ২৪ ডিসেম্বর আবার বড় দিন বা উত্তরায়ণ হল সুরু। সূর্য্য ফিরে চলেছে উত্তর দিকে; দিনক্রমে বড় হচ্ছে— রাত ছোট। আবার বিষুবরেখার সামনাসামনি আসতেই বিশ্বে দিনরাত হয়ে গেল সমান এইটি মহাবিষুবসংক্রমণ—২১শে মার্চ্চ। বাসন্তিক ক্রান্তিপাত। তখন দিন আরও বড় হচ্ছে--রাত হচ্ছে ছোট। ২১শে জুন উত্তরায়ণ শেষ। সবচেয়ে বড়দিন—ছোট রাত।

মহাবিষুব সংক্রমণের দিনই উত্তর হিম মণ্ডল বা মেরু প্রদেশে সূর্য উদয়—ছ'মাস দিন হয় ছ'মাস রাত। ঠিক তেমনই অন্য ছ মাস দক্ষিণ মেরু মণ্ডলে দিনরাত। উত্তর মণ্ডলের সূর্য্যের এই গতিকে বলা হয়েছে দেব যান, দক্ষিণ মণ্ডলের গতিকে বলে পিতৃ-যান।

সাধারণকে বোঝাবার জন্যই ইংরাজী তারিখ দেওয়া হল, নয়তো এ সব কথা ঋগ্বেদে ১০।৮৯।৪, ৪।২৪।১২ প্রভৃতি ঋকেই পাওয়া যায়।

এই গতি বা অয়নের আরও এক রহস্য আছে। প্রতি গ্রহ ঘুরছে নিজ কক্ষে তাকে ভগন বলে। তারাও আবার প্রদক্ষিণ করছে সূর্যকেও। এই সব কাণ্ডটাই সৌরজগতের লীলা। কিন্তু মোট এই জগতটাও আবার ঘুরছে। কল্পনায় ধরা হয়েছে—ঐ মেরু রেখাটাই বাড়িয়ে দিয়ে দৃষ্টি পরিচ্ছদক রেখা অতিক্রম করে নক্ষত্র লোকের দিকে গেলে--যে কক্ষ পথ হচ্ছে তাকে সূর্য্য ঘুরছে ২৬০০০ বছরে।

পৃথিবীর সৃষ্টি প্রদক্ষিণের পথটাকেই ১২ ভাগ করে নাম দেওয়া হল রাশি। প্রতিটি রাশিতে থাকেন সূর্য্য ১ মাস। যেমন মেষরাশিস্থ ভাস্কর—বৈশাখ মাসে।

পৃথিবীর নিজকক্ষার আবর্ত্তনেও রাশির নামের হিসেব হয়েছে—আর প্রতিদিনেই ২ঘণ্টা করে ১২টি রাশিকে দেখছে পৃথিবীর লোক।

প্রথম দিকে সৌর মাস গণনা তো হয়ইনি চন্দ্রের হিসেবেই হিসেব

হ'ত সব—চন্দ্রের টানেই জোয়ার ভাঁটা ও চন্দ্রই দৃষ্টিসহ—সেকারণ মানুষের ভাগ্য গণনায় গণৎকার হয়তো চন্দ্রকেই প্রধান করলেন এবং চন্দ্র তখন যে রাশিতে তারই হিসেবে গণনা স্বরু করলেন। তবে রাশির সুক্ষ্ম হিসেবে পাওয়া জন্মকালটি হল জাতকের লগ্ন। সূর্য্যের রাশি সংক্রমণের ঠিক মুহুর্ত্তটিই এই লগ্ন। এই লগ্ন, রাশি, চন্দ্র বা অন্যান্য গ্রহের প্রভাব নিয়েই হয় জাতকের লগ্ন বিচার। যদি লগ্নে ২টি রাশির প্রভাব থাকে তবে জাতকের মধ্যে তুরকম প্রভাব লক্ষিত হবে।

রাশি হিসেবে প্রতি গ্রহেরও একটা স্থিতিকাল ও ফল আছে। যেমন সূর্য্য গ্রহের স্থিতি প্রতি রাশিতে ১ মাস। সূর্য্য পিতৃ-রূপী গ্রহ—জ্যোতির্ম্ময়, বীজদাতা, আত্মা-স্বরূপ—কল্যাণই করেন তিনি। বৃহস্পতির স্থিতিকাল ২ বছর। তিনি জ্ঞানমার্গী, নিরপেক্ষ উচ্চপদাধিকারী। শুক্রের স্থিতি ২৮ দিন—কবি, শিল্পী ও প্রেমের দেবতা তিনি কিন্তু শনি-২॥০ বৎসর থাকেন প্রতিরাশিতে আর কূট, বক্রী, কৃপণ তবে শৃঙ্খলতা পরায়ণ।

এমনই ভাবেই মানুষের জন্মলগ্ন ধ'রে, চন্দ্র ঠিক করে রাশি নির্ণয়ের পর গ্রহের প্রভাবে তার ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের বিচার করা হয়। অ-দৃষ্ট জীবনকে দৃষ্টি পথে আনার এ এক অপূর্ব্ব প্রচেষ্টা।

যাঁরা এ বিশ্বাস করেন—তাদের হয়তো সান্ত্বনা আছে, যারা করেন না তারাও তুই দল। একদল বলেন "যা করবার তিনিই করবেন" আর একদল বিশ্বাসই করেন না। তাঁদের বলবো—যুগ যুগধরে যে বিদ্যা ও গণিতের যে অংশ ফলিতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে তাকে অবিশ্বাস করবো কেন? অয়ন গতির জন্য যদি ঋতি পরিবর্ত্তন হয়—জীবনের ক্ষেত্রেই বা কান্না হাসির আলো আঁধার আসবেনা কেন? যদি উদ্ভিজ জগতে সৃষ্টি লয় হয়, তবে মানব জগতে হবে না কেন—চন্দ্রের টানে জোয়ার ভাটা হলে মানুষের জীবনের জোয়ার ভাটাই বা বিশ্বাস করবো না কেন? তবে হিন্দু জ্যোতি-গণনা বা ভাগ্য-নিরূপণ বড় জটিল—তাই অধ্যয়ন ও সাধনা-সাপেক্ষ।

কাল ও ঋতু—চান্দ্র বা সৌরমাসে যেমন হলো একটা কাল নির্ণয়

তেমনই ৩০ দিনে মাস বা বারো মাসে বছরও স্থির হলো। আবার মাসে ৪ সপ্তাহ ও সপ্তাহে ৭ দিন ও তার প্রতিটির নাম দেব নামে নামাঙ্কিত হলো। ওদিকে হলো ১২ মাসে ছ'টি ঋতুর আবির্ভাব। প্রকৃতিতে এসব পরিবর্ত্তন স্পষ্টতঃ অনুভব করা যায়। বৈশাখের খর রৌদ্র ও তপ্তবায়ু, বর্ষায় জল, শীতের শৈত্য, এ সব তো মানতেই হবে—এমন কি অমবস্যায় শরীরটা ম্যাজ মাজ করে—পূর্ণিমায় বিরহ মিলনের স্বপ্ন, শরতে বিশ্বের শোভা আনে—এসব তো সত্য প্রমাণ—অতএব ঠিক সেইভাবে প্রতিটি রাশি, নক্ষত্র—তিথি বা অয়নাংশের বিচারে কাল ও ঋতুর প্রভাব তো আসবেই মানুষের জীবনে।

অতি প্রাচীনকালে বেদের উক্তিতে পাই মাত্র তিনটি ঋতু। গ্রীষ্ম বর্ষা ও হেমন্ত। তারপর কখনও ৭ কখনও ৫ ঋতু হয়ে, শেষ পর্য্যন্ত সকলের যুক্তিতে ৬টি ঋতু দাঁড়ায়। ঠিক তেমনই প্রথমে বর্ষারম্ভের কথায় মনে হয় বর্ষা থেকে বর্ষ সুরুরও একটা সম্বন্ধ ছিল। শব্দটা যেন তারই ইঙ্গিত দেয়। আবার অনেকের মত বসন্ত কালের নাম ধরেই বছর হতো। তারপর দেখা গেল ঋতু অয়ন গতিতে বদলায় তাই বোধ হয় পাকাপাকি বৈশাখ থেকেই হলো সুরু। তবে অনেক মতান্তর ও অনেক বিচার-পদ্ধতি চলেছে এই মতবাদ নিয়ে।

অতি প্রাচীন যে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ তাতে কালের মোটা-মুটি হিসেব বলেছে—৩৬৬ সৌরদিন বা ছয় ঋতুতে বা দুই অয়নে বা বার সৌরমাসে একবৎসর আর ১২ বৎসরে এক যুগ। আবার ৫ চান্দ্র বৎসরেও এক যুগ। তার মধ্যে তিনটি চান্দ্র বৎসরের বারটি চান্দ্র মাস আর ২টি বৎসরের প্রত্যেকটিতে তেরটি চান্দ্রমাস। তাহলেই একযুগ বা পাঁচ বৎসরে যে দুটি চান্দ্র মাস বেশী হয়, তাই মলমাস। কারণ চান্দ্র মাস ১০ দিন ছোট, আমরা ধরি ৩ বছরে এক মলমাস।

এই ভাবে হিন্দু জ্যোতিষ-শাস্ত্র গণনার জন্য প্রহর, মুহূর্ত্ত, কলা বা নিমেষ ভাগ করে নিয়েছে। দিবার ১২ ভাগও প্রাচীন যুগের দান। দৈনিক সময় নির্দ্ধারণে—প্রথমে প্রাচীন ভারতেই সূর্য্য-ঘড়ির আবিষ্কার

করেন। তাতে সূর্য্যের ছায়া পড়ায় সূর্য্যের গতি নির্দ্ধারিত হতো।

কিন্তু রাত্রে তা সম্ভব নয়—তাই হলো জল-ঘড়ি। একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে জলপাত্র থেকে জল পড়তো ২৪ মিনিটে! এই ভাবে ক্রমে বালুকা-ঘড়ি ও ঘড়ির উদ্ভব হয়। বর্ত্তমানের ঘড়ি অবশ্য বৈদেশিক দান—তবে তখনই হিন্দুরা পঞ্জিকা প্রণয়নে—সময়ের এমনই সূক্ষ্ম বিচার করেছেন যে মাস, দিন, দণ্ড পল বলেই শুধু কৃতিত্ব অর্জন করেননি, মানুষের ভাগ্যের কথাও তাঁরা বলেছেন নির্দ্ধারিত জন্ম-লগ্ন দেখে।

এ সবই হিসেব হয়েছে আমাদের ভারতবর্ষে ৩২০০ বছর আগে। তবু বলতে হবে খৃঃ পূঃ ৫০০ সাল থেকে খৃষ্টাব্দ ৫০০ পর্য্যন্ত যে ১০০০ বছর তা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্ধকার যুগ। আজকার সে যুগের প্রামাণ্য গ্রন্থ বড় বেশী পাওয়া যায় না। পরাশর-সংহিতার ছিন্ন-অংশ বলে যে—ও হাজার বছর নয়—তারও বহু পূর্ব্বে. ৫০০০ বছর আগে ভারতে জ্যোতির্বিদ্যার প্রচার ছিল। সে প্রাচীন যুগের একটা হদিস পাই আবুল ফজলের 'আইনী আকবরী'তে। তিনি মহান ভারতের প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যার মহান গৌরব বর্ণনায় সে যুগের ২০ খানা জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত গ্রন্থের কথা বলেছেন—(১) ব্রহ্ম (২) সূর্য্য (৩) সোম (৪) বৃহস্পতি (৫) গর্গ (৬) নারদ (৭) পরাশর (৮) পুলস্ত্য (৯) বশিষ্ঠ (১০) ব্যাস (১১) অত্রি (১২) কাশ্যপ (১৩) মরীচি (১৪) মনু (১৫) অঙ্গিরস (১৬) লোমশ (১৭) পৌলিশ (১৮) যবন (১৯) ভৃগু (২০) চ্যবন। এগুলি প্রায় দুষ্প্রাপ্য।

তবে ঠিক বৈজ্ঞানিক প্রভাব এসে গেল হিন্দু জ্যোতিষে খৃষ্টিয় ৫ম শতাব্দীতে আর্য্যভট্টের সময়। তারপরই বরাহমিহির ভাস্কর, ব্রহ্মগুপ্ত, মুঞ্জাল, শ্রীপতি ও শতানন্দের পর উদয় হলেন ভারতীয় জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের মধ্যমণি, জগতের বিস্ময়—বিশ্ববিশ্রুত ভাস্করাচার্য্য। তাঁর গ্রহ-সিদ্ধান্ত, গোলাধ্যায়, অয়নান্ত নির্দ্ধারণ, লগ্ন নির্ণয় প্রভৃতি প্রতিটি বিষয় সেই যুগেও—৮০০ বৎসর পূর্ব্বে এমনই বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করে গেছেন, যা আজও পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডের বিস্ময়ের বস্তু হয়ে রয়েছে।

কবি ও সাহিত্য

প্রাচীন ভারতের আর্যগণ সেই অতীতের যুগে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলতেন তা ছিল এক এক দিকে একরকম, কারণ সে যুগে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে একই ভাষার প্রচার সম্ভব ছিল না।

তবে তাঁরা যে মন্ত্র দেবতার স্তুতির জন্য রচনা গড়ে তুল্‌লেন, যজ্ঞাদির মন্ত্রোচ্চারণে ব্যবহার করলেন, তাকে বল্লেন দেবভাষা। তবে সেই ৭০০০ বছর আগের লেখা, সংস্কৃত ভাষা হয়নি। কারণ তখন লেখার প্রচলনই ছিলনা। মনে রেখে স্মৃতি ও শ্রুতির সাহায্যেই চলতো সে কাজ। যখন লেখার প্রচলন হলো—তখন মহেঞ্জদারো প্রভৃতি অতীত সাক্ষ্যে যে লিপি মালার নির্দ্দেশ দেয় তাও সংস্কৃত নয়। বৈদিক যুগে বেদ-পাঠ ও বেদ সঙ্কলনের মধ্যে যে ভাষাকে তাঁরা সংস্কার করে একটা নতুন রূপে দিলেন। সংস্কৃতি বা cultureএর সেই যুগেই তখন উৎপত্তি হল বর্ত্তমান সংস্কৃতভাষা। ভাষা হ'লো—কিন্তু লিপি হ'ল না।

লিপিমালা হল পরবর্ত্তী যুগে—নাম হল দেবনাগরী। কেন ?

এর কারণ– সে যুগে কাশী ছিল ভারতীয় শিক্ষাপীঠের কেন্দ্রভূমি। সেই কাশীর নিকটেই পণ্ডিতবর্গের আবাসভূমি ছিল—দেবনগর। সেই নগরে সংস্কৃতভাষার অক্ষরের একটী মোটামুটি চেহারা স্থির হওয়ায় সংস্কার করা সংস্কৃত ভাষাটির অক্ষরের নাম হয়ে গেল দেবনাগরী।

হল ভাষা, হল বহু গ্রন্থ, বহু পণ্ডিতের রচনা সম্পদ নিয়ে, কিন্তু সবাই সব গ্রন্থের হদিস রাখেনা—কারণ তা সম্ভব ছিলনা। কি করে তিব্বতে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের সংবাদ রাখবে কাশ্মীর বা কাশী, তক্ষশিলা বা বৈশালীর লোক। এ জিনিসটা প্রকৃত পক্ষে আশ্রম থেকে নিকটতর আশ্রমে, তীর্থ থেকে নিকটতর তীর্থে বা অনুষ্ঠানে প্রচারিত হ'ত।

রাজর্ষি জনকের রাজসভা, পরিক্ষিৎ এর যজ্ঞস্থল, সনকাদি ঋষির আশ্রম বা নৈমিষারণ্যে শিক্ষার্থী ছুটতো জ্ঞান সঞ্চয়ে, কিন্তু

পুস্তকাকারে কে কোথায় কি লিখলো তা সকলের স্পষ্ট জানার সহজ উপায় ছিলনা, যান-বাহনের অভাবেই।

পরবর্ত্তী যুগে শঙ্করাচার্য্যাদি সাধকের নানাস্থানে পর্যটন, রামানুজ বা চৈতন্যের ভাব-বিনিময়েও গ্রন্থ-প্রচারের প্রচেষ্টা কিছু সার্থক হয়ে উঠেছিল।

এ যুগে যানবাহনের সুযোগ হওয়ায় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সুরু হল প্রাক্তন সংস্কৃত গ্রন্থ-উদ্ধারের চেষ্টা—জার্ম্মান পণ্ডিত শ্লিগন, বিউহ্লার, ম্যাকডোনেল প্রভৃতি এর উদ্যোক্তা। তবে এর প্রেরণা এল মোক্ষমুলার (ম্যাক্সমুলার) প্রভৃতি সংস্কৃতানুরাগীর চেষ্টায়।

সেই ১৮১৯ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল পর্যন্তই আমরা বিভিন্ন বিষয়ে—প্রায় পঞ্চাশ হাজার প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থ পেয়েছি।

সে যুগে গ্রন্থ লেখা হ'ত প্রায়ই তালপাতায়। উত্তরভারতে কালি দিয়ে লিখতো তালপাতায়, দক্ষিণে লিখতো লোহার কলমে—পাতা কুঁড়ে ভুষে কালি বুলিয়ে দিয়ে। কালি দিয়ে লেখা হ'তো যা তাই—লিপি, কুঁদে রেখা করে যে লেখন তাই—লেখা। তারপর ভুর্জ্জপত্র, কাঠের পাটা, চামড়া ও কাপড়, ইট, পাথর, স্তুপ, সোনা, রূপো বা তামার পাত—নানা দ্রব্যেই লেখা চলতো, কারণ কাগজ তখন ছিল না। কাগজ আবিষ্কার করলেন চীন আজ থেকে হাজার দু'হাজার বছর আগে।

এখানে যে কাগজে লেখা বই পাওয়া গিয়েছে তা প্রায় ৭০০ বছর আগেকার লেখা, তবে এশিয়ায় ভূগর্ভে কাগজে লেখা ভারতীয় গ্রন্থ যা পাওয়া গিয়েছে তা প্রায় ১৬০০ বছরের প্রাচীন।

সংস্কৃত সাহিত্য সাধারণত দুরকম—বৈদিক ও লৌকিক সাহিত্য।

বৈদিক ভাষা—বেদেরও এক বিশেষ ভাষা ছিল। তার ছন্দ শুনেই তা শিখেছে সকলে আগে—তাই তাকে বলা হ'ল শ্রুতি-সাহিত্য।

তাছাড়া সূত্রেই সব গাঁথা। সূত্র-যুগেই সূত্রে গাঁথা হলো বেদ উপনিষদ। আজ যা ব্যাকরণের শেকলে বাঁধা, বেদের যুগে তাও ছিল শিথিল। বেদের কত কথা আজ যেমন লুপ্ত, বেদের অনেক জায়গায় ব্যাকরণের রূপ আছে সুপ্ত। বেদের ভাষার নমুনা—

'যচ্চিদ্ধিতে বিশো যথা প্রদেব বরুণ ব্রতম্। মিনীমসি দ্যবিদ্যবি ॥'

বৈদিক সাহিত্যের প্রাধান্য কাল—১০০০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত। তারপর বেদাঙ্গ প্রভৃতির যুগ চলে ৪০০ খৃঃ পর্যন্ত। ভাষা তখন কিছু পরিবর্ত্তিত।

লৌকিক সাহিত্য—বৈদিক-ভাষায় বেদব্যাসের লেখনি-চাতুর্য্যের পর সাহিত্যের মধ্যে আদি কাব্য-কথাই হচ্ছে রামায়ণ।

কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরক্ষরম্
আরুহ্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্মীকি কোকিলম্।

ভারতীয় প্রথম কাব্যের কাব্যরসে ফুটে উঠেছে এই দেব প্রণতিতে।

সাহিত্য পরিচয়ে, ভাষার বাহন যে শব্দ তাকেও যেমন হিন্দু-ভারত 'শব্দ ব্রহ্ম' বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছে, তেমনি বর্ণমালারও কল্পনা করেছে নটরাজের নৃত্য-ছন্দে, ডমরু-ধ্বনির ঝংকারে।

নৃত্যাবসানে নটরাজ রাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারং
উদ্ধর্তু কামঃ সনকাদিসিদ্ধা নেতাদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালং।
অত্র সর্বত্র সূত্রেষু অন্ত্যবর্ণ চতুর্দ্দশং
ধাত্বর্থ সমুপাদিষ্টং পাণিন্যাদিষ্ট সিদ্ধয়ে।

এমনি করেই হয় মহেশ-সূত্রের উদ্ভব—সৃষ্টি হয় অক্ষর বা বর্ণমালা। ভারতীয় সে ভাষার নাম ছিল দেববাণী বা গীর্ব্বাণবাণী। ঋগ্বেদেও আছে এই দেববাণীর মর্ত্তে আগমনের রীতি ও রূপের কথা।

ব্যাকারণের শক্ত বাঁধন যেমন বাঁধলেন পাণিনি তেমনই তার গাঁট খুলেছেন কাত্যায়ন আর পাতঞ্জল। তবু লৌকিক সাহিত্যকে ধ্যাকরণ মেনে চলতেই হয়।

লৌকিক সাহিত্যের মধ্যে আছে (১) পৌরাণিক ও তন্ত্র কাব্য (২) কাব্য, (৩) মহাকাব্য, (৪) লঘুকাব্য, (৫) নীতিকাব্য, (৬) স্তোত্রকাব্য, (৭) সন্দেশ, (৮) চিত্রকাব্য, (৯) সুভাষিত, (১০) দেশবৃত্ত, (১১) কথানক, (১২) গদ্যকাব্য, (১৩) দৃশ্যকাব্য। এ ছাড়াও আছে সাহিত্যের রীতি নীতি ভরা সাহিত্য-শাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র,

সঙ্গীতশাস্ত্র, কামশাস্ত্র। তারপর দর্শন, জৈনদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, তন্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, অলঙ্কার, নিবন্ধাদি আর শিলালিপি, তাম্রলিপি।

সাহিত্য কথাটি এসেছে 'সহিত' থেকে এবং সংস্কৃত ভাষার সহিত যা কিছু জড়িত—তাই সাহিত্য—সে নাটক, উপাখ্যান শিল্প, জ্যোতিষ, দর্শন, তন্ত্র, ভক্তি গ্রন্থ যাই হোক। তবে লোকতঃ মিশ্রিত সামাজিক-কৃষ্টি সাধনার সম্পদই সাহিত্য নামে খ্যাত।

এর মধ্যে গদ্য সাহিত্য ও পদ্য-সাহিত্য দুইপ্রকারের সাহিত্য আছে। প্রথমে পদ্যেরই বিস্তার হয়—তারপর গদ্য। কাব্য, মহাকাব্য স্তব-সাহিত্য বা উদ্ভট কবিতাদি পদ্যে লেখা—গদ্যে লেখা কাব্য যেমন—বাণভট্টের কাদম্বরী দণ্ডীর দশকুমার চরিত বা সুবন্ধুর বাসবদত্তা।

আবার গদ্যে পদ্যে মিলিয়ে যা লেখা তাহলে চম্পু।

কাব্য হল কবির কল্পনায় গাঁথা কাহিনী, ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত।

তবে সাধারণত কাব্য বলি তাকে কবিতায় যা লিখি, লিখি একটি বিস্তৃত ঘটনা বা একটি দুটি নায়ক বা নায়িকাকে নিয়ে। পুরাণাদি বা প্রথম কাব্য প্রভৃতি প্রধানত যে ছন্দে রচিত হতে থাকলো তা অনুষ্টুভ্ এবং তাই শ্লোক নামে পরিচিত।

> শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্র লঘু পঞ্চমম্
> দ্বি চতুঃ পাদয়োঃ হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ

পুরাণাদির চার ভাগের তিনভাগ এই ছন্দে বা শ্লোকে লেখা।

মহাকাব্য হবে কাব্যের চেয়ে বড়, বহু বিস্তৃত ঘটনা, বহু নায়ক, বহু স্থান ও বহু কবিতার সমষ্টি। রামায়ণ মহাভারত বা বহু পৌরাণিক মহাকাব্য এই পথে রচিত। তার কাল ৬০০ খৃ, পূঃ—৪০০ খৃষ্টাব্দ।

লঘুকাব্য আবার কাব্যের মধ্যে যা ছোট—মাত্র একটি লোক বা ক্ষুদ্র একটি ঘটনায় যার কল্পনা।

কাব্য মহাকাব্য সবই প্রথম বাঁধা পাণিনীর হ্যাতে—ব্যাকরণের শিকলে। অনেকে আবার বলেন পাণিনিও দুজন—কবি পাণিনি ও বৈয়াকরণিক পাণিনী।

সে যাই হোক, পাণিনীর মহাকাব্য পাতাল বিজয়ম্ বা জাম্ববতী বিজয়ম হলো প্রথম মহাকাব্য। আজও মালাবার অঞ্চলে এর প্রসিদ্ধি। তাছাড়া পাণিনীর বিবিধ কবিতাবলীরও প্রসিদ্ধি আছে।

ব্যাকরণ, অলংকার, জ্যোতিষ প্রভৃতি নিয়ে যা লেখা— তা নিবন্ধ, তার পর আলোচনা অথবা গ্রন্থ টীকা, টিপ্পুনি প্রভৃতি। তন্ত্র, বা ভক্তিশাস্ত্রও আছে অনেক।

পালি ও প্রাকৃত—ভাষা জননীর যেন দুটি হাত পালি ও প্রাকৃত। প্রাচীন বহু গ্রন্থ দেখে বোঝা যায়, দুর্লভ সংস্কৃত গ্রন্থের যেমন হয়েছে পালিতে অনুবাদ তেমনই পালি বা প্রাকৃতের বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছে সংস্কৃতে। প্রধানতঃ বৌদ্ধযুগ এর বাহক।

বৃহৎ কথা—সংস্কৃত ভাষার মধ্যে রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণাদির কথা ছেড়ে সাহিত্য পর্য্যায়ে যে সব গ্রন্থ পাই তারমধ্যে গুণাঢ্যের বৃহৎ-কথাই প্রাচীনতম। অনেকেই অনুমান করেন এখানা প্রায় ২০০০ বছর আগেকার লেখা। তবে দুর্লভ গ্রন্থখানির মূল লেখা প্রাকৃত ভাষায়। পরে সোমদেব ভট্ট ও ক্ষেমেন্দ্র নামক কাশ্মীরী পণ্ডিত তার অনুবাদ করেন সংস্কৃতে। অনুবাদ দুখানির নাম কথা সরিৎ সাগর ও বৃহৎ কথামঞ্জরী। ঐ অনুবাদের উপর ভিত্তি করেই বৃহৎ কথা, শ্লোক সংগ্রহ, পঞ্চতন্ত্র, বেতাল পঞ্চ-বিংশতি-হিতোপদেশ, তন্ত্রাখ্যায়িকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ও আরব্যেপন্যাস প্রভৃতি বৈদেশিক নানা গ্রন্থ রচিত হয়।

তবে গুণাঢ্যের বৃহৎকথা—প্রাকৃতে লেখার কারণ নিয়ে এক কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ আছে।

গল্পটি এই—রাজার মতন এক রাজার ছিলেন এক বিদূষীরাণী। কিন্তু রাজা ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ। এক দিন জলক্রীড়ার সময় রাণী বল্লেন 'মোদকং দেহি'—অর্থাৎ মা উদকং দেহি—'জল দিওনা'।

রাজা মোদক মানে 'মোয়া' ভেবে একটী মোয়া এনে রাণীকে দিলেন—রাণী উঠলেন হেসে।

মন্ত্রীকে সব বল্লেন রাজা। মন্ত্রী বুঝলেন রাজার মূর্খতাই এর কারণ।

রাজাও বুঝলেন—বল্লেন ১ বৎসরে তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রবেত্তা হবেন। সভাপণ্ডিত গুণাঢ্য বল্লেন অসম্ভব। মন্ত্রী বল্লেন অর্থে সবই সম্ভব। গুণাঢ্য বাজী রাখলেন—যদি তা সম্ভব হয়—তিনি সংস্কৃত লেখা ছাড়বেন, কালি কলম আর ধরবেন না।

আর হলও তা সম্ভব মন্ত্রীর চেষ্টায় আর রাজার রাত্রদিনের সাধনায়।

গুণাঢ্য হেরে বনবাসে গেলেন ও বিন্ধ্যপর্ব্বতে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু কবির মন, আবার চাইল কাব্য লিখতে। লিখলেন 'বৃহৎকথা'। প্রতিজ্ঞার কথা ভেবে সংস্কৃত ভাষায় না লিখে, আরণ্যক পল্লীতে প্রাকৃত ভাষা শিখে, গ্রন্থ লিখলেন প্রাকৃত ভাষায় কলম হল পাখীর পালক আর কালি হল নিজের দেহের রক্ত। কবির রক্তে লেখা হল তাঁর কাব্য!

রক্তে লেখা বই পাঠালেন কবি, শিষ্যের হাতে রাজাকে। রাজাকে না জানিয়ে মন্ত্রী ফেরৎ দিলেন—অসংস্কৃত আরণ্যক ভাষায় রচিত রক্ত-লিখিত অপবিত্র ঐ গ্রন্থ। দুঃখে গুণাঢ্য আগুন জ্বালিয়ে এক একখানা লেখা পাতা আবৃত্তি করে করে ফেলতে লাগলেন আগুনে। সে অপূর্ব কাব্যের আবৃত্তি শোনে বনের বিহঙ্গম—দেশের নরনারী। রাজার কাছে সংবাদ যায়। যখন সবাই এল গ্রন্থ-উদ্ধারে তখন প্রায় গ্রন্থখানি সবই ছাই হয়ে গেছে—আছে এক চতুর্থাংশ মাত্র।

তারই অনুবাদে হাজার দেশবিদেশের কত শত গল্প-কথা।

অনেকে আবার এও বলেন যে এই গুণাঢ্যই—বিষ্ণুশর্ম্মা।

এরপর খৃঃ পূর্ব্ব যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ভাস—ভাসের নাটক স্বপ্ন বাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধ নারায়ণ, চারুদত্ত বা প্রতিমা—প্রাঞ্জল, সরল ও অভিনয় উপযোগী। রাজা উদয়ণ ও বাসব দত্তার প্রেম, মন্ত্রী যৌগন্ধ নারায়ণে বুদ্ধি প্রভৃতি এই নিয়েই সব কাহিনী। চারুদত্ত পরবর্তী নাটক মৃচ্ছকটিকের মূল ভিত্তি।

এরপরই আমরা পাই পার্শ্বের ছাত্র অশ্বঘোষের গ্রন্থাদি। অশ্বঘোষ বৌদ্ধ কবি, তাঁর রচিত মহাকাব্য বুদ্ধচরিত। বুদ্ধজীবন ও উপদেশ বিবৃত হয়েছে—সপ্তদশ সর্গে এ কাব্য। ইনি কনিষ্কের সমসাময়িক।

আর একখানি গ্রন্থ তাঁর সৌন্দরানন্দ—অষ্টাদশ সর্গের এক মহাকাব্য। ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা নন্দ সুন্দরী নামক রূপময়ীর প্রেমতরঙ্গে যখন নিমজ্জিত, তখন এই অশ্বঘোষ তাকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন ও ভোগের পথ থেকে নিবৃত্ত করেন। এ নিয়েই এ কাব্য।

কনিষ্ক মগধ বিজয়কালে বুদ্ধদেবের ব্যবহৃত অশ্বঘোষকে দাবী করেন। অশ্বঘোষ রাজ্যের মঙ্গলে বিজয়ী কণিষ্কের সঙ্গেই যাত্রা করেন তাঁর রাজ্যে। রাজার সভাষদরা অশ্বঘোষের এত আদরে উঠলো জ্বলে--বল্লে, এত ভাল—ভাল নয়। রাজা কণিষ্ক বুঝলেন সব আর তারপর ঘোড়াশালার ঘোড়াদের দিলেন খাওয়া বন্ধ করে। দু দিনের জন্য উপবাসী রইল অশ্বদল। তারপর রাজা তৃতীয় দিনে অশ্বঘোষকে বল্লেন, স্তোত্র-কাব্য ও মন্ত্র-কাব্য আবৃত্তি করে শোনাতে। অশ্বঘোষ সুরু করলেন আবৃত্তি, ঘোড়াদের দেওয়া হ'ল ঘাস। কিন্তু অশ্ব খাওয়ায় মন দিল না, শুনতে লাগলো সেই কাব্যকথা। চোখ দিয়ে তাদের গড়াতে লাগলো অশ্রুধারা। তাই নাম হ'লো অশ্বঘোষ।

তারপরই বররুচির বাণ উভয়াভিসারিকা প্রসিদ্ধ মহাকাব্য। এই বররুচির অন্য নাম কাত্যায়ণ। ইনি পাণিনীর সহাধ্যায়ী। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন যিনি, তিনি সেই বররুচি কিনা তাতেও সন্দেহ আছে।

বররুচি সম্বন্ধে বহু কাহিনী আছে। প্রবাদ তিনি ১৮টি জাতের মেয়েদের বিবাহ ক'রে 'শ্বপচ' বা চণ্ডাল আখ্যা পান। বররুচি ছিলেন উপবর্ষের ছাত্র। পাণিনী, বররুচি, ব্যাদি, ইন্দ্রদত্ত সকলেই পড়তেন ঐ উপবর্ষের কাছে। উপবর্ষের এক মেয়ে ছিল---নাম উপকোশা। তারই সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব হয় বররুচির। অথচ বররুচির জন্মবৃত্তান্তে ছিল গভীর রহস্য।

ব্রাহ্মণ কলাপী—সুন্দরী কন্যা কাত্যায়ণী।

অগ্নি—দেবতাই হোক আর ঐ নামের পুরুষই হোক—এলেন কুমারী কাত্যায়ণীর কাছে। কাত্যায়ণীর গর্ভে এল সন্তান। ভুলের মাশুল দিলেন নদীতীরে নবজাত পুত্র-বিসর্জনে।

অগ্নি সে তনয় নিয়ে গেল। কলঙ্কের ভয় ছিল সর্ব্বকালে। সেই ছেলেই এই বররুচি। কিন্তু মানুষের সব গ্লানি যে জ্ঞান, বিদ্যা ও কবিত্বে ঢাকা পড়ে সেই শক্তি বররুচিকেও করেছিল মহীয়ান।

কবি না হয়েও সেরা কবি ঐ পতঞ্জলি। বররুচির পর ইনি। বিশেষ কোন কাব্য বা মহাকাব্য লেখেননি, লিখেছেন নীরস ব্যাকরণ সূত্র, শাস্ত্র কথা। কিন্তু তার রচনার নিদর্শনরূপে নানা কবিতায় ও তার রচনা-শৈলীতে মহাকাব্য রচনার পরিচয় পেয়ে সেই গৌরবই তাকে দিয়েছেন সবাই চিরদিন। মালতী, প্রমিতাক্ষরা, প্রহর্ষিনি, বসন্ত মালিকা সাহিত্য জগতের এক একটি রত্ন।

বৎসভট্টি—মান্ধাসারের সূর্য্যমন্দিরে উৎকীর্ণ রাজা কুমার গুপ্ত এবং বিশ্বকর্ম্মা, বন্ধুবর্ম্মার প্রশস্তি গাথাই বৎসভট্টিকে অমর ক'রে রেখেছে।

হরিসেনের রচিত এলাহাবাদ স্তম্ভে উৎকীর্ণ কাব্য-খণ্ডের কৃতিত্বই তাকে খ্যাত করেছে।

কিন্তু এদের সকলের দ্যুতি যেন চন্দ্রের দ্যুতি। সবাই ঋণী যে মহাকবির কাছে তিনি হলেন জগদ্বিখ্যাত কবি কালিদাস।

কিন্তু কালিদাসকে নিয়ে বিভ্রাটই কি কম! এ পর্য্যন্ত নয় জন কালিদাসের উদয় হয়েছে। না জানি পরে আরও ক'জন হবেন। বহু মতবাদের পর একটা সিদ্ধান্ত এই রকমের দাঁড়িয়েছে—

(১) কবি কালিদাস—প্রথম উজ্জয়িনীর হর্ষ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নেরই একটি রত্ন। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ছিলেন ইনি। নাম ছিল মাতৃগুপ্ত। তিনখানি নাটক ও সেতুবন্ধ নামক মহাকাব্য রচনা করেন। (২) কবি কলিদাস অথবা মেঘরুদ্র—মালব রাজ বিক্রমাদিত্যের সভা-কবি। খৃঃ পূঃ ৫৭ শতাব্দীতে ছিলেন ইনি। এঁরই লেখা কুমার সম্ভব, রঘুবংশ ও মেঘদূত জ্যোতির্বিদ্যা-ভরণ নামক একখানি জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থও এঁর লেখা পাওয়া যায়। (৩) কালিদাস অথবা কোটিজিৎ। ইনি কামকোটি পীঠমের মূকশঙ্কর নামক পণ্ডিতের ছাত্র। ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দের পর এঁর উদয়। তাঁরই লেখা ঋতুসংহার, শৃঙ্গার

তিলক, শ্যামলনী দণ্ডক, নবরত্নমালা, শ্রুতবোধ প্রভৃতি। অনেকে এই তিনজনকে নিয়েই ত্রয়ী কালিদাসের অস্তিত্ব বলেছেন।

যাঁদের মতে ৯ জন, তাঁরা বলেন, এছাড়াও (৪) পরিমল কালিদাস বা পদ্মগুপ্ত (৫) কালিদাস বা যমকবি (৬) নব কালিদাস (৭) কালিদাস আকবরিয়া (৮) কালিদাস যিনি লম্বোদর নামক প্রবচন লেখেন (৯) অভিনব কালিদাস—যাঁর নাম ছিল মাধব।

তবে নাম ৯টি হলে কি হবে— এর মধ্যে একটু তীব্র দৃষ্টি ফেললে শেষের ছয়জন যে শুধু নামেই মাত্র কালিদাস তার আর সন্দেহ নেই। এমন তো এখনও কত কালিদাস আছেন।

তবে প্রথম তিনটি—যার জন্যে রাজশেখর বা অভিনন্দ নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সমালোচক ত্রয়ী কালিদাস বলতে দ্বিধা করেননি তাঁদের সমস্যাও বুঝি গুরুতর।

"একোঽপি জীয়তে হন্ত কালিদাসো ন কেনচিৎ
শৃঙ্গারে ললিতোদ্গারে কালিদাসত্রয়ী কিমু।"

শৃঙ্গার ও ললিতরস বর্ণনায় এক কালিদাসকেই কেউ জয় করতে পারে না—তার আবার তিন কালিদাস কি রকম ?

অনেকে বলেন, তিনটি কালিদাস নয়—এ তাঁর তিনটি কাব্যধারার কথারই উল্লেখ। যাই হোক, কালিদাস তিনজনই হোক বা একজনই হোক—সে অমররচনা যাঁর কলমের, আমরা তাঁকেই করবো বার বার নমস্কার। তাঁর লেখা গ্রন্থের মধ্যে প্রধান—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব; শকুন্তলা বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক, মেঘদূত এবং ঋতুসংহার গীতিকাব্য। অনেকে নলোদয়, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গাষ্টক, দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা ও শ্রুতবোধকেও কালিদাসের রচনা বলেন।

তারপরই পাই আর এক বৌদ্ধ-কবি— বুদ্ধ ঘোষ। এঁর রচিত মহাকাব্য সামন্তোপসাধিকা। রাজা ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি যান সিংহল থেকে বৌদ্ধ পিটকের অনুবাদ আনতে। পথে জাহাজ তাম্রলিপ্তে রেখে বুদ্ধঘোষ প্রথম যান গয়ায় তারপর সিংহলে। সেখানে

তিন বছর থাকেন আর রচনা করেন বিশুদ্ধি মাগ্‌গ। তা ছাড়া বহু গ্রন্থের অনুবাদ করে সব নিয়ে তিনি আবার পৌঁছান রাজার কাছে। আজও দক্ষিণ ভারতে বুদ্ধঘোষকে মহাকবিই বলেন সকলে।

এতদ্ব্যতীত ঐ সময়ে মেন্থ, কুমারদাস প্রভৃতির গ্রন্থ পাওয়া যায়। মেন্থ ছিলেন হস্তিপালক। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের সভায়ও গৌরবে ছিলেন তিনি। মেন্থ ছিলেন ভারবী প্রভৃতি কবিগণের সমসাময়িক। শত সর্গের রামচরিত মহাকাব্য তাঁর কীর্ত্তি। হস্তিপক উপাধি পাওয়ার মূলেও ছিল তাঁর লেখা কাব্যে হাতিধরার অপূর্ব্ব কৌশল-কথা। তাঁর লেখা 'হয়গ্রীব বধ' আজ লুপ্ত। কুড়িটি সর্গে লেখা জানকীহরণ। প্রতিটি পংক্তি তাঁর কালিদাসের রঘুবংশের অনুসরণে লেখা, কিন্তু কোথায়ও ছিল না অনুকরণের গ্লানি।

কুমারদাস ছিলেন সিংহলের রাজা। কুমারদাস নামেও নানা মতভেদ—সময়েরও মতভেদ। প্রবাদ—তিনি ছিলেন অন্ধ।

কুমারদাস ও কালিদাসের বন্ধুপ্রীতির চরম পর্ব্ব আছে এক করুণ কাহিনীতে। প্রবাদ একদিন রাজা কুমারদাস নর্ত্তকী-গৃহে বিহারান্তে নর্ত্তকীকে তুষ্ট করতে লিখে দেন—কবিতার একটি পংক্তি—

'কমলে কপলোৎপত্তি শ্রুয়তে ন চ দৃশ্যতে'

অর্থাৎ—পদ্মে যে পদ্ম জন্মায় এ শোনা যায় কিন্তু দেখা যায় না।

এই ছত্রটি লিখে দিয়ে রাজা বল্লেন, এর দ্বিতীয় পংক্তিটি যে লিখবে তাকে তিনি দেবেন প্রচুর পুরস্কার।

রাত্রে রাজা চলে গেলে—সেখানে এলেন কালিদাস। নর্ত্তকী দেখাল সেই পংক্তি। তিনি হাস্যচ্ছলেই লিখে দিলেন—কবিতার অপর পংক্তি—

"বালে, তব মুখাম্বোজে দৃষ্টমিন্দীবরদ্বয়ং।"

—রূপসী গো, তোমার মুখ কমলেই জেগে আছে দুটি নয়ন-পদ্ম।

নর্ত্তকী পুরস্কারের লোভে লেখাটি নিয়েই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিল কালিদাসকে। আর পরের দিন রাজাকে দেখাল পূর্ণ কবিতা।

রাজা নিজে কবি—বুঝলেন, এ বন্ধু কালিদাসের লেখা। চল্লো

পীড়ন, নর্ত্তকী স্বীকার করলো সব কথা। বন্ধুর শোকে রাজা বন্ধুর শব-দেহের সঙ্গে বন্ধুর চিতায় দিলেন জীবন।

ভট্টি-লিখিত গ্রন্থ ভট্টিকাব্য নামেই খ্যাতি পেয়েছে। ভট্টিনাম পেয়েছিলেন তিনি ভর্ত্তৃ শব্দের প্রাকৃত রূপ থেকে। আসল নাম ছিল তাঁর ভর্ত্তৃ। কিন্তু এই নামটি নিয়েও নানা বিভ্রাট। অনেকে বলেন, ইনিই রাজা ভর্ত্তৃহরি। আবার অনেকে বলেন, বিক্রমার্ক নামক রাজার সভাপণ্ডিত ভর্ত্তৃহরি।

আবার অন্য গল্প আছে, চন্দ্রগুপ্ত নামক এক ব্রাহ্মণ সখ করে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্র-কন্যা বিবাহ করেন। এঁদের নাম যথাক্রমে ব্রাহ্মণী, ভানুমতী, ভাগ্যবতী আর সিন্ধুমতি। ছেলে তাঁদের পর পর হলো বররুচী, বিক্রমার্ক, ভর্ত্তৃ ও ভর্ত্তৃহরি। বিক্রমার্ক হলেন রাজা, ভর্ত্তৃ বা ভট্টি হলেন মন্ত্রী।

অনেকে বলেন, ভর্ত্তৃক নামক রাজার সভাকবি ভর্ত্তৃহরি। তাঁরই লেখা রাবণবধ মহাকাব্য। তবে সব চেয়ে সেরা গল্প—

ভর্ত্তৃহরি ছিলেন রাজা। প্রিয়া ছিল তাঁর রাজমহিষী। একদিন এক অমৃতফলের মতন ফল দিলেন তাকে এক সন্ন্যাসী—যে খাবে সে দীর্ঘায়ু হবে। রাজা প্রিয়াকে দিলেন ফল—কামনা প্রিয়া হবে আয়ুষ্মতি।

কিন্তু পরদিন তাঁরই এক সভাসদ রাজাকে সেই ফল দিলেন।

আশ্চর্য্য হলেন রাজা, বুঝলেন, প্রিয়া তার প্রিয়া নয়, রাণীর প্রিয়তম হচ্ছে এই সভাসদ—তাই ফল দিয়েছেন রাণী তাকে। ঘৃণায় রাজা সংসার ত্যাগ করে বনে গেলেন—সেখানেই তাঁর বিদ্যাচর্চ্চা। মহাকবি হলেন পরম ভক্ত।

আবার এও শোনা যায়—ভর্ত্তৃ ছাত্রকে বসেছেন পড়াতে, হঠাৎ তাদের মাঝখান থেকে চলে যায় এক হাতী। অমঙ্গল ভেবে এক বৎসর অধ্যাপনা বন্ধ রইল। আর এই এক বৎসরে মহাকাব্যের রসে তিনি গেঁথে তুললেন নীরস ব্যাকরণ ভট্টিকাব্য। কঠিন পাণিনীর সূত্র সহজ সরস হ'য়ে ধরা পড়েছে এতে।

এরপর অন্যান্য কয়েকজন কবির পরই আমরা পাই ভারবীকে। ভারবী—কৌশীকগোত্রের নারায়ণস্বামীর ছেলে—দামোদর।

দরিদ্র ভারবীর দুর্দ্দশা নিয়ে আছে অনেক গল্প। অভাবে আর দুর্ম্মুখ স্ত্রীর স্বভাবে—একদিন কবি বের হলেন পথে। পথশ্রান্ত কবি দেখলেন এক সরোবর—পদ্মপাতায় ভরা। স্নান ক'রে ভাবলেন, কেন অভিমানে বিবেচনা না ক'রে সহসা এ গৃহত্যাগ? সহসা তিনি একখানি পদ্মপত্র টেনে নিয়ে লিখলেন—

"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়া মবিবেকঃ পরমাপদাং পদং
বৃণুতেহি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সংপদাঃ।"

সেই লেখা-পত্র হাওয়ায় উড়ে গিয়ে পড়লো পথের ধারে—সেই পথেই যাচ্ছিলেন পল্লিব রাজ সিংহবিষ্ণু। কবিতাপড়ে দেখে—খুঁজলেন কবিকে, শুনলেন, কে যেন লিখে রেখে গেল এখনই। রাজা বললেন, দেখা পেলে যেন তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়—পুরস্কার দেবেন।

একদিন ভারবীও—শুনলেন সব কথা. ছুটলেন সৌভাগ্যের আলো দেখে রাজ-দ্বারে। দ্বারী দিলে না ঢুকতে।

এদিকে রাজা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখলেন সেই কবিতা শয়ন ঘরে।

একদিন বিলাসান্তে রাজা রাত্রে এসে দেখেন. মহারাণী এক যুবককে বুকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। ক্রুদ্ধ রাজা তরবারি খুলে দুজনকেই মারতে গিয়ে দেখলেন সামনে সেই স্বর্ণাক্ষরে লেখা কবিতাছত্রটি থামলেন। তারপর জাগালেন তাদের দুজনকে। শুনলেন, এই যুবক তাঁরই পুত্র—যে শিশুকালে ধাত্রী কর্ত্তৃক হয়েছিল অপহৃত।

আবার পড়লো কবির ডাক। প্রকাশ্যে ঢেঁড়া পিটে ঘোষণা করা হলো। কবি এলেন। সেই থেকেই ভারবী - ভারবী। কীরাতার্জ্জুনীয় ভারবীর প্রসিদ্ধ মহাকাব্য। আর এই কাব্যে তিনি তাঁর সৌভাগ্যের আধার রূপ এই শ্লোকটিকে ধরে রেখে দিয়েছেন।

কীরাতার্জ্জুনীয়ম গল্পাংশে আছে—ব্যাসের উপদেশে মহান অস্ত্র আহরণের জন্য অর্জ্জুন বনে শিবের আরাধনা করেন। এমন সময়

বাণবিদ্ধ বন্য-শূকর নিয়ে যুদ্ধ হলো। পরাভূত ক'রে অর্জ্জুন তার পা ধরে টান দিতে গেলেন—কিরাত-বেশী শঙ্কর তুষ্ট হয়ে তাঁকে পাশুপত প্রদান করলেন। মহাভারত থেকে নিয়েছেন এ কাহিনী ভারবী। মাঘও লিখেছেন কাব্য ঐ মহাভারত থেকেই।

মাঘ—ভোজ নৃপতির সভাকবি এই মাঘ সুপ্রভ দেবের ছেলে। দত্তক ছিলেন মাঘের পিতা। মাঘকে তিনি পণ্ডিত করেন সর্ব্বশাস্ত্রে। বিশেষ ব্যাকরণে। তার সে পাণ্ডিত্যের পূর্ণ পরিচয় পাই শিশুপাল বধ নামক কাব্যে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার তখন। অনেকে বলেন, ঐ কাব্যে তিনি হরির সহিত বুদ্ধদেবের এবং শিশুপালের সহিত মারের তুলনা করেছেন।

এরপরই অভিনন্দ, পদ্মগুপ্ত, কবি বিল্‌হন, ক্ষেমেন্দ্র প্রভৃতির রচনায় সংস্কৃতসাহিত্য-যুগ সমৃদ্ধ। ক্ষেমেন্দ্র ছিলেন কাশ্মীর রাজসভার সভা-পণ্ডিত। কাশ্মীর রাজবংশ ও উপাখ্যান নিয়ে বহুগ্রন্থ তাঁর।

শ্রীহর্ষ—এর পর মঙ্ক, হেমচন্দ্র প্রভৃতির পর যে কবিদ্যুতি ভারতে ভাস্বর হয়ে উঠে তিনি শ্রীহর্ষ। তাঁর গুরু প্রদত্ত চিন্তামনি মন্ত্রে সরস্বতী আরাধনা করে তিনি অর্জন করেন কবিত্ব শক্তি। তারই প্রথম স্ফুরণ নৈষধকাব্য। নিষধরাজ নলের জীবনী নিয়ে লেখা এই কাহিনী।

এইসময় এই কাহিনীটি নিয়ে অনেকে অনেক কাব্য লেখেন।

ভবভূতি—এর পরই নাম করতে হয়। অষ্টম শতাব্দীতে বেরার প্রদেশে তাঁর জন্ম। পিতা নীলকণ্ঠ, মাতা জাতুকর্ণী। তাঁর অপর নাম শ্রীকণ্ঠ। উত্তর রামচরিত ও মালতী মাধব তার দুখানি অপূর্ব্ব নাটক।

শূদ্রক—গুপ্তযুগে শূদ্রক নামক নরপতি লেখেন অপূর্ব নাটক মৃচ্ছকটিক—ভাসের চারুদত্ত ও গণিকা বসন্ত সেনার প্রেম কাহিনী নিয়ে। অনেকে বলে কবি দণ্ডীই শূদ্রক নামের আড়ালে লুকিয়ে আছেন।

কবি বাণভট্টের কাদম্বরী, দণ্ডীর দশকুমার চরিত, হর্ষবর্দ্ধনের রত্নাবলী ও নাগানন্দ, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, ভট্ট নারায়ণের বেণীসংহার এবং কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধ চন্দ্রোদয় সংস্কৃত সাহিত্যের এক একটি রত্ন।

প্রবোধ চন্দ্রোদয়ে বিবেক, বৈরাগ্য মোহ, প্রবৃত্তি ইত্যাদি পাত্র।

মেটারলিঙ্কের ব্লুবার্ড অপেক্ষা এ নাটক অনেক শ্রেষ্ঠ। আর বাংলা দেশের আত্ম-দর্শন এরই এক ক্ষীণ অনুকরণ মাত্র।

ভারতবর্ষ নাট্য কলায় যে কত উন্নত ছিল—তা যে ঐ সাগর পারের দান নয়, এ বোঝা যায় - বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্য দর্পণে বিবৃত নাটকের বিভিন্ন রীতি ও নিয়ম দেখলে। তিনি নাটকের রূপক ও উপরূপক দুটি ভাগ ও অষ্টাদশ বিভাগ করেছেন।

গ্রীক সভ্যতার অনেক আগে ভারতে নাটক প্রচলিত। আর সে সব নাটক আজ বৈদেশিক পণ্ডিতদের স্বীকার করিয়েছে যে ভারতীয় নাটক নিজস্ব ধারায় ও ভঙ্গীতে অপূর্ব ও অ-ঋণী।

নাটক ও কাব্যরস মিলে গেছে যেন কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে। ভারতীয় অসংখ্য গল্প আখ্যায়িকায় যেমন সবাই সেযুগে আকৃষ্ট হয়েছিল, সূত্র সাহিত্য ও দর্শনাদি প্রবন্ধেও হয়েছিল বিশ্ববাসী মুগ্ধ। বৈদেশিক পণ্ডিতরাই লিখে গেছেন—"জগতের অন্য কোন দেশ এত বড় গল্প সাহিত্য সৃষ্টি করেনি।"

এরপরই একটি যুগ আসে 'বন্ধ' কাব্য নিয়ে। নানা ভাবে অক্ষর সাজিয়ে নানা কাব্যাংশ হয়েছে রচিত।

এর চরম উদাহরণ—শতার্থিকা কবি সোমপ্রভাচার্য্যের একটি শ্লোকে একটি মহাকাব্য লেখা। একটি শ্লোকের শব্দের বিভিন্ন অর্থ নিয়ে একশ ব্যাখ্যা দাঁড়াল। যেমন এক অর্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি—অন্য অর্থে জৈন তীর্থঙ্কর মহিমা. অন্য অর্থে প্রসিদ্ধ নাগরিক বা কবিস্তুতি। গ্রন্থ বা শ্লোকের রচনাকাল ১১৭৭ খৃষ্টাব্দ।

তারপর 'কণক বন্ধে'—বন্ধের আদর্শ আরম্ভ। গোল সোনার বালার মতন ৩২টি অক্ষর সাজান। যেখান থেকে ইচ্ছে সুরু কর—শ্লোক হবে, মানে দাঁড়াবে—কাব্যের রূপে রসে পূর্ণ হয়ে। এই ভাবে ৩২ শব্দে এদিক থেকে ওদিক থেকে ৬২টি শ্লোকে হল পূর্ণ রামায়ণ রচনা। সে এক অপূর্ব্ব শক্তি, শুধু ভারতেই সম্ভব!

আবার দেখতে পাই দৈবজ্ঞ পণ্ডিত সূর্য্যদাসের এক কবিতা সোজা

পড়লেও যা উল্টোতেও তাই. এক অর্থে রামস্তুতি ও অন্য অর্থে কৃষ্ণস্তুতি। যথা—

তং ভূসুতামুক্তি মুদার হাসং বন্দে যতোভব্য ভবং দয়াশ্রী
শ্রীযাদবং ভব্য ভতোয় দেবং সংহারদা মুক্তিমুতাসুভূতং

এ রকম আরও দু একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রথমেই উল্লেখ করি কবিরাজ পণ্ডিতের লেখা "রাঘব পাণ্ডবীয়।" পুরো কাব্যখানার দুরকম অর্থ। এক অর্থে রাঘবের প্রশংসা অন্য অর্থে পাণ্ডবদের।

এই প্রসঙ্গে—খ্যাত কাব্যের রচনায় নানা পারিপাট্যের কথাও বলতে হয়। কিন্তু তাতে হবে বাহুল্য। তাই শিশুপাল বধ ও কীরাতজ্জু´নীয় কাব্যের দু'টী শ্লোক দিচ্ছি কৌতুক-চ্ছলে।—

দাদদো দুদ্দদুদ্দাদী দাদাদো দুদদী দদোঃ।
দুদ্দাদং দদদে দুদ্দে দদাদদ দদোদদঃ

'দা' ধাতুগত শব্দ নিয়ে—"যিনি দাতা শ্রেষ্ঠ, যিনি দাতা ও অদাতা উভয়কে দান করেন, যিনি দুঃখ দাতার দুঃখ দাতা, দুষ্ট-নাশক, ক্ষয়কারীর নাশকারী ইত্যাদি" ভাবে শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণনা করলেন।

অথবা— দে বা কা নি নি কা বা দে
বা হি কা স্ব স্ব কা হি বা
কা কা রে ভ ভ রে কা কা
নি স্ব ভ ব্য ব্য ভ স্ব নি।

শ্লোকে করলেন রণক্ষেত্রের বর্ণনা। "দেবগণ কর্ত্তৃক উৎসাহিত উৎকৃষ্ট বাহিকা দ্বারা বিপর্য্যস্ত এবং বাদ-প্রতিবাদে সমাকুল এই রণক্ষেত্রেই কাকের ন্যায় কাপুরুষ—(তুমি কি করিবে ?)"

কবি এই ভাবে অপূর্ব্ব কাব্য শিশুপাল বধে শুধু মাত্র একটি বর্ণে রচিত অথবা কীরাতাজ্জু´নীয়তে উল্টো ও সোজা ভাবে ক্রমিক গতিতে সাজান অক্ষরে শ্লোক ও তার অর্থ বর্ণনায় যে দক্ষতা দেখিয়েছেন—যে কোন ভাষায় তা বিরল।

আধুনিক জগৎ আজ অকুণ্ঠ ভাবে স্বীকার করেছেন—কি নাটকে, কি কাব্যে, কি মহাকাব্যে বা আখ্যায়িকায় মহান্ ভারতের দান সত্যই বিশ্বের গৌরব।

গৌরবময় মহান ভারত

মহান ভারতের সম্বন্ধে সবিস্তারে বলার সাধ্য এক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে কেন বিরাট কোন গ্রন্থেও সম্ভব নয়। অসংখ্য এর কাহিনী, অজস্র এর দান, অভূতপূর্ব্ব এর চিন্তাধারা! তবে এ গ্রন্থে কয়েকটি বিষয়ের একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে বাকী কয়েকটি বিষয় আরও সংক্ষিপ্ততর ভাবে দিতে হবে—কারণ গ্রন্থের উদ্দেশ্যই হচ্ছে—মহান ভারতের প্রতিটি বিষয়ের সামগ্রিক জ্ঞান-দান নয়, শুধু তার ইঙ্গিতটুকুই ধরে দেওয়া। তাই অতি সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের আভাস নিয়ে এই শেষ-অধ্যায়।

বিজ্ঞান—জ্ঞানময় ভারতে বিজ্ঞানের স্থান ছিল না এইটাই অনেকের মত। জ্যোতির্বিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান প্রভৃতির কথা আমরা আগেই বলেছি। এখানে তদ্ব্যতীত আরও দুএকটি কথা বলি।

পাটিগণিত সম্পূর্ণ ভারতের সম্পদ। ১ থেকে ৯ এবং "০" ভারতেরই আবিষ্কার। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল, ত্রৈরাশিক সবই ভারতে প্রথম আবিষ্কৃত। এমন কি ভগ্নাংশ ও তার যোগ বিয়োগও "নিরুদ্ধ" নামে হিন্দু ভারতেই মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিভিন্ন বৈদিক ছন্দ ঠিক করার জন্যই "ছন্দ"—Permutation and combination আবিষ্কৃত হয় আর শ্রেঢীও (Arithmetical and Geomatrical Progression) হিন্দুরাই আগে জেনেছে। জ্ঞানী ভাস্করাচার্য্য ছিলেন গণিত শাস্ত্রের শিরোমণি। প্রবাদ তার বিধবা কন্যা লীলাবতীকে ভুলিয়ে রাখতেই তার সব গণিতের প্রশ্ন। অপুর্ব্ব ধারায় ছন্দ গণিতের প্রশ্নের নমুনা দিচ্ছি একটি--

"পাশাঙ্কুশাহি ডমরুক কপাল শুলৈঃ
খট্টাঙ্গ শক্তি শরচাপযুতৈর্ভবন্তি
অন্যোন্যহস্ত কলিতৈকতি মূর্ত্তিভেদাঃ
শম্ভোর্হরেরিব গদারি সরোজ শঙ্খৈঃ ॥

অর্থ—মহাদেবের দশহাতে দশটি, হরির চার হাতে চারটি অস্ত্র। যদি তারা প্রতি হাতের জিনিস পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে অদল বদল করেন— তবে কত প্রকারের মূর্ত্তি হয় ?

উত্তর—মহাদেবের মূর্ত্তি হবে ৩৬২৮৮০০ এবং হরির— ৮৪।

আবার বর্গ সমীকরণের একটি অপূর্ব্ব প্রশ্ন—

মেঘ দেখা দিল। বলাকা চলেছে। যত হংস তাতে, তার বর্গমূলের দশগুণ গেল মানস সরোবরে। ৮ ভাগের ১ ভাগ স্থলপদ্মের বনে, তিন জোড়া পদ্ম-মৃণালের ধারে। বল বালিকে—মোট কত হাঁস ছিল ঐ দলে ? উত্তর—১৪৪। ভাস্করাচার্য্য কন্যা লীলাবতীকে প্রশ্ন করেন। কী সুন্দর কাব্যিক ভাবে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় চেতনায় সমৃদ্ধ প্রশ্ন !

তারপর আর্য্যভট্ট শ্রীধর, ব্রহ্মগুপ্ত, পদ্মনাভ সকলেই গণিতে নানা আবিষ্কার করেছেন।

সে যুগেই আবিষ্কৃত হ'লো বীজগণিত। বীজ বা মূল ধরে কিংবা অজ্ঞাত রাশি ধরে বীজগণিত বা অব্যক্ত গণিতের অনুকরণে আরবে আল-খোয়ারেজমী—"আলজেব—ওয়াল—মোকাবেলা" প্রচলিত করেন। তা থেকেই আজ আলজেবরা" নামের উৎপত্তি।

যজ্ঞের চিতি ও মণ্ডল আঁকা থেকেই জ্যামিতির উদ্ভব। বৌধায়ন থেকে একটা উদাহরণ ধরা যাক—"সমচতুরস্রস্যাক্ষ্ণয়ারজ্জুর্দ্বিস্তাবতীং ভূমিং করোতি"। অর্থাৎ— সম-চতুষ্কোণের কর্ণের উপর আঁকা বর্গক্ষেত্রের আয়তন ঐ চতুষ্কোণের দ্বিগুণ।

ত্রিকোণমিতিও হিন্দুদের আবিষ্কার। হিন্দুরা যাকে বলেছে জ্যা, কোটি-জ্যা বা উৎক্রম-জ্যা আজ তাই Sine. Co-Sine বা Versed Sine নামে আখ্যাত। বৌধায়ন ও আপস্তম্বের গ্রন্থে কঠিনতম অঙ্কও সাধিত হয়েছে।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য—ভারতের অতীত স্থাপত্যের প্রাচীনতম সাক্ষ্য মোহন্‌জোদড়ো (৩২৫০-২৯৫০ খৃঃ পূঃ)। তবে পরবর্তী মৌর্য্য স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যের সঙ্গে এই হিন্দু স্থাপত্যের বেশ মিল আছে।

সেদিন বস্তুতঃ ইতিহাসের পাতায় মৌর্য্য যুগেই এর সুরু। তখনকার প্রধান কীর্ত্তি চন্দ্রগুপ্তের রাজভবন—অপূর্ব্ব হলেও ছিল কাঠের। গ্রীক লেখকরা এবং বৈদেশিক পরিব্রাজকরা বলেছে এ প্রাসাদ ছিল বিশ্বের মধ্যে শিল্প সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ সৌধ। তারপরই অশোকের নানা কীর্ত্তি রাজী। সাঁচি, ভারহুতের ভাস্কর্য্য, সারনাথের সিংহচুড়া সারা বিশ্বের বিস্ময়। জনমাশাল বলেছিলেন—"·······আমার দৃঢ় চিশ্বাস জগতে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন জিনিস তৈরী হয়নি।"

অশোকের সময় ৪০টি স্তম্ভ তৈরী হয়। প্রতিটি একটি পাথরে—প্রতিটির শীর্ষে অন্য পাথরে খোদাই করা সিংহ বা পাখী। নন্দনগড় স্তম্ভটি ৩৩ ফিট লম্বা, ব্যাস ৩৫৷৷০ ইঞ্চি, ওজন প্রায় ৫০ টন। যাঁরা এই ওজনের স্তম্ভ—এইভাবে খোদিত করে, পালিশ করে যথাস্থানে স্থাপিত করেছেন, তাঁরা যে কত বড় শিল্পী তা অনুমান করা কঠিন নয়। এ সবগুলির পালিশ দেখে আজ সকলে স্বীকার করেছে—বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও পাথরে এমন পালিস আনতে পারে নি।

এই সব ভাস্কর্য্যের মধ্যে বুদ্ধের বুদ্ধত্ব থেকে পরিনির্ব্বাণ সব খোদাই হয়েছে প্রতীকে—বুদ্ধমূর্ত্তি দেওয়া হয়নি। তাই স্তম্ভের ধর্ম্ম-চক্র ধর্ম্ম প্রচারের কথা ব্যক্ত করে। স্তূপ করে নির্ব্বাণ প্রচার। সাঁচী ও 'ভারহুতে দেখা যায় চিত্রকলা—পাথরে খোদাই বুদ্ধ জীবনী। সাঁচীর তোরণ-দ্বারে যে চারটি উচ্চাঙ্গের কারুকার্য্য তা বিশ্বে অভুতপূর্ব্ব। বৈরাগ্য-দ্যোতক এমন শিল্প-মহিমা সত্যই বিরল।

এরপরই দেখি অমরাবতী, অজন্তা, মথুরা, গান্ধার, উদয়গিরি ও সারনাথে শিল্প চর্চ্চার পরাকাষ্ঠা। সাধারণভাবে ভাস্কার্য্যে তখন "মূর্তি" বা 'স্তম্ভাদি' ও 'গুহা' এই দুটি ধারা প্রচলন দেখি।

সারনাথ প্রভৃতি স্থানের মূ্‌ত বা স্তম্ভ ও স্তূপ গান্ধার শিল্পের নিদর্শন। গুহা-শিল্পের আদর্শ অজন্তা বা ইলোরা গুহা মধ্যে চিত্র শিল্পই এর গৌরব। গুহা হয়তো সাধুদের নিবাসের জন্য তৈরী হয়েছিল কিন্তু তারপর চৈত্য বা উপাসনা গৃহও হয় গুহায়। তাই ক্রমে আয়তন ও আড়ম্বরে

সে হয়ে ওঠে বিরাট। অজন্তা—কয়েকটি সংসারবিরাগী ভিক্ষুরই নির্ব্বাচিত সাধন স্থান। মোট ৪টি চৈত্য বা উপাসনা-গৃহ, ২৫টি বাসোপযোগী বিহার নিয়ে অজন্তার গিরি-গুহা দীর্ঘদিনের উপেক্ষা, অরণ্যের ব্যাপকতা, সাধুদের ব্যবহৃত আগুনের ধোঁয়ায়—নিজস্ব সৌন্দর্য্য হারিয়েও আজ বিশ্বের গৌরব হয়ে আসবে।

এছাড়া বাগ বা মহাবলিপুরমের গুহা-মন্দির, মামল্লপুরমের ভাস্কর্য্য, কাঞ্চীর কৈলাসনাথ, পট্টভকলের বিরুপাক্ষ—এক একটী অক্ষয় শিল্প-কারু।

তাছাড়া পুরী বা ভুবনেশ্বরের মন্দির, কোনারকের সূর্য্য দেউল বিশ্বের যে কোন শিল্পচাতুর্য্যের আদর্শ হবার স্পর্দ্ধা রাখে।

কোনারকের মন্দির ছিল ২৩০ ফুট উঁচু। আজ জলদস্যুর উৎপাতে তার ১০০ ফুট ভগ্ন। ১২০০ শিল্পী ১৬ বছর ধরে এ নির্ম্মাণ করেছেন। ৩৫ ফিট ৯ ইঞ্চি লম্বা ৮ ইঞ্চি চওড়া ও ১০ ইঞ্চি উঁচু লোহার কড়ি এতে লাগান। সে যুগের লৌহ-শিল্পেরও এ এক বিস্ময়কর অধ্যায়। পাশে পতিত গজসিংহ মূর্ত্তিটি ১০০০ মণ ওজনেও। উড়িষ্যা তখন শিল্পে এই উৎকর্ষতার প্রমাণ দিয়েছে।

সেই সময়—পিতল-শিল্পে চোল দেশের দক্ষতাও বিস্ময়কর। আপ্পাস্বামীর মূর্ত্তি বা নটরাজ মূর্ত্তি তার সাক্ষ্য।

তারপরই চন্দেল রাজাদের তৈরী বুন্দেলখণ্ডের খাজুরাহো। মন্দিরের মধ্যে সভাগৃহ, রঙ্গমঞ্চ, সঙ্গীতশালা, বিদ্যালয় ও বাসোপযোগী বিভিন্ন কক্ষ দেখে মনে হয়—ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সামাজিক উন্নতির কল্পনাও ছিল সে যুগের এই কারু-শিল্প-প্রতিষ্ঠার মধ্যে। তারপর জৈন মন্দির সমূহের প্রভাবও ভারতকে শিল্পী রূপে পরিচিত করে। আবু, পালিতানা গিরনারের নানা মন্দির সত্যই অপূর্ব্ব। আবু পর্ব্বতের দিলওয়ার মন্দিরকে দেখে টড বলেছেন—তাজমহল ছাড়া এর সমকক্ষ আর কোন মন্দির নেই। এর পরই বাঙ্গলার পালরাজদের ভাস্কর্য্য প্রতিভার নিদর্শন দেখি ধীমান ও বিতপাল নামক শিল্পীর শিল্প-চাতুর্য্য।

পাহাড়পুর প্রভৃতি স্থানে আজও বাংলার শিল্পকলার সাক্ষ্য আছে।

উৎসব ও ক্রীড়া—ভারত উৎসবময়। প্রতিটি ঋতু,প্রতিটি মাস, প্রতিটি তিথি, প্রতিটি বার এক এক উৎসবে পূর্ণ। তা ছাড়া ভারতের এক একটি স্থান এক একটি পর্ব্বে উৎসব মুখর হয়ে ওঠে।

এ উৎসব, ক্রীড়া বা মেলা প্রভৃতি শুধু বৈদিক যুগেরই নয়—বৈদিক-পূর্ব্ব যুগ থেকেই এর প্রচলন।

পূর্ব্বে বৈদিককালে যে খেলনা বা উৎসব ছিল প্রাচীন মহেঞ্জোদাড়ো বা হরপ্পায় তার প্রমাণ মেলে। তা ছাড়া নানা গ্রন্থে পাই—সে যুগে ছিল দৌড় প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বহু ক্রীড়া এবং যজ্ঞাদি বহু উৎসব (শতপদ ব্রাহ্মণ)। বৈদিকযুগেও রথ-দৌড়, ঘোড়দৌড়, শিকার সবই ছিল—সমাজে তখন যাদুবিদ্যা, গল্পবলা, বংশ-নর্ত্তন, অক্ষক্রীড়া, দ্যুতবাজুতম্ (জুয়া), জালকরী (ইন্দ্রজাল), সূত্রক্রীড়া (কাঠপুতলী) তক্ষণ (কাঠখোদা) অহিতুণ্ডিক (সাপুড়ের খেলা) দোলাকান (ঝুলা) কন্দুক (বলখেলা) জল বিহার, গোলকিতা (পাশা) রজ্জুমার্গানুগমন, বাজিবাহ্যালি বিনোদ (পোলো) সমস্যা-ক্রীড়া প্রভৃতি অনেক খেলা ছিল।

উদ্যানে সুন্দরী নারী—গাছে ফল আর ফুল ফোটাতে খেলতেন—শাল-ভঞ্জিকা, তাল-ভঞ্জিকা। উৎসবে তারা আচোষ খাদিকা (লজেন্স) খেতেন আর সহকার-ভঞ্জিকা, পুষ্পচারিকা, কুমকুম ক্রীড়ায় মাততেন—কৌমুদী-জাগর প্রভৃতি উৎসবে জাগরণ ছিল তাদের ব্যসন।

আধুনিক বল, পোলো, ঘোড়দৌড়, যাদুবিদ্যা কিছুই নতুন নয়!

রঙ্গ ও অভিনয়—ভারতের অভিনয় কলাও সে যুগের এক বিরাট কৃতীত্ব। পুরাণের অধ্যায় ছেড়ে দিলেও ইতিহাসের পাতায় প্রথমে অভিনয় স্থান দেখি গিরি-গুহায়। যেমন রামগড় পাহাড়ের গুহা। তারপর যে সব রঙ্গালয় তৈরী হ'তো তাও ছিল তিনরকম। বিকৃষ্ট, চতুরস্র (চৌকো) ত্র্যস্র (ত্রিকোণ)। এগুলি প্রায়ই ১২×১৬ গজের হ'ত। ৪০০ দর্শকের আসন থাকতো। তারও অনেক বিধি।

ভেতরে নেপথ্যে - রঙ্গপীঠ ও রঙ্গস্থল। রঙ্গস্থলের তুদিকে মত্তবারুণী (গেটউইংগস্)। হত্যা বা বিয়োগান্ত দৃশ্য ছিল নিষিদ্ধ।

অভিনয় হত আংগিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক। আংগিকের মধ্যে মাথা নাড়ানর প্রথাই ছিল ৩২ রকমের। মধ্য পথে হত বিশ্রাম— বলা হত—কক্ষবিভাগ। নাটকের নানা ভেদ দেখা যায় ভরতনাট্য-সূত্রে। তারপর বুদ্ধ নাটক ও ক্রমে প্রাদেশিক নাটক বিস্তার লাভ করে।

শিক্ষা—শিক্ষা নিয়েই তো ভারতের দীক্ষা-গ্রহণ। সাধনার স্বরু তার জ্ঞানার্জ্জনে। বৈদিক যুগের আশ্রম বা গুরু-গৃহের পর ঐতিহাসিক যুগে যে শিক্ষা-কেন্দ্রের বিবরণ আমরা পাই—তাতে দেখি প্রথমে বালকরা যে সিদ্ধন বা লিপি শিক্ষা পাঠ করতেন—তার এক খানার নাম —"সিদ্ধিঃঅস্তু"। পাঠ্য জীবনের প্রারম্ভে তারা পাঁচটি বিষয় স্থির করে নিতেন—(১) শব্দ-বিদ্যা বা ব্যাকরণ (২) হেতু-বিদ্যা বা ন্যায় (৩) শিল্পস্থান-বিদ্যা (৪) চিকিৎসা-বিদ্যা আর (৫) অধ্যাত্ম-বিদ্যা। এগুলি আয়ত্ত করতেই যেত তাঁদের ত্রিশ বৎসর। পাণিনী ব্যাকরণ, অভিধান কোষ ও হেতু বিদ্যা শেষ করে তাঁরা আসতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম ছিল কাশী এর শিক্ষা পীঠ। শঙ্করাচার্য্য ছিলেন কাশী বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র।

তারপর হ'লো তক্ষশীলা ও নালন্দা। কাশীতে ছিল হিন্দুর প্রাধান্য—নালন্দায় ছিল বৌদ্ধদের। বাঙালী শীলভদ্র ছিল এখানকার অধ্যক্ষ। বিহার বড়গাঁও নামক গ্রামে বুদ্ধের ৫০০ বণিকশিষ্য এক ধনীর আমবাগান কিনে এর প্রতিষ্ঠা করেন। দশ হাজার ছাত্র এখানে থেকে পড়াশুনা করতো। সব ব্যয় দিতেন বিশ্ববিদ্যালয়। সর্ব্ব বিষয় দেওয়া হ'ত শিক্ষা। নালন্দার সমকক্ষ বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় আজও হয়নি। দাক্ষিণাত্যে মাদুরায় ছিল এমনই শিক্ষাকেন্দ্র। তারপর বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করলেন রাজা ধর্ম্মপাল। হয়তো— ভাগলপুরের কাছে পাথর ঘাটাতেই ছিল বিক্রমশীলা। বাঙালী অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন এর প্রধান অধ্যাপক।

তীর্থপীঠ—এই বিশ্বজগতে ভারতবর্ষই এক পরম তীর্থ। তার মধ্যে আবার অসংখ্যতীর্থ কতনা কালের কতনা ঘটনার সাক্ষ্য!

সে যুগের অন্তরের আনন্দ, শিল্পের সৌন্দর্য্য, কলার পুষ্টি, ভ্রমণের বিলাস সবই ছিল ধর্ম্মের নামে ইষ্টের—স্মরণে। আজ দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছে মাত্র। আধুনিক যুগের নর নারী পুণ্য প্রয়াসী নন—বরং এইসব ক্রিয়া-কর্ম্মাদিকে তাঁরা উপহাসই করেন, কিন্তু তাঁরাও আজকাল নতুন করে দেশভ্রমণে বের হচ্ছেন—তবে পুণ্য-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, দেশ-ভ্রমণের আনন্দ লাভের জন্য। ভারতীয় সংস্কৃতি শিল্প-চাতুর্য্য দেখবার জন্যেই তাঁরা দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেই 'অজন্তা' অমরনাথেই যাচ্ছেন, তবে উদ্দেশ্য ভিন্ন।

সে যুগেও এই তীর্থ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল দেশ-দেশান্তরের সঙ্গে সংযোগ। বিভিন্ন দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আদান প্রদান, পরস্পরের পরিচয়-সাধন। তীথ দর্শনে গিয়ে তাই স্মৃতি হিসেবে, পুরীর কাঁসি, সাগরের বারকোষ, কাশীর বেনারসী এনে রাখতেন।

ভারতের তীর্থপীঠগুলি সে যুগে বা এ যুগে সভ্যতা ও জ্ঞানের সংবাহক। পুরাণ নির্দ্দেশে তীর্থ-দর্শনে মহা পুণ্য লাভ হয়।

পুরাণাদিতে এ কথাটি আছে যে তীর্থভ্রমণ ও স্নানাদিতে শুধু দেহ নির্ম্মল হলেই পুণ্য অর্জন হয় না—মনকেও নির্ম্মল করতে হয়। প্রতি তীর্থে অন্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস করবার ব্যবস্থা আছে। এর কারণও বোধ হয় মনকে পবিত্র করবার জন্যে প্রস্তুতি।

এই তীর্থ-ভ্রমণকে কেন্দ্র করে মানুষের নানা ব্রত ও নিয়মাদির প্রচলন ছিল সেকালে। নিয়ম ছিল, তীর্থযাত্রার প্রারম্ভে উপবাস এবং তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে দান, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে তবে দেব-দর্শন। যাঁরা অন্যের অর্থে তীর্থ করতেন তাঁরা পুণ্যফলের ১/৬ অংশ লাভ করতেন। সেই জন্যে নিজ অর্থে তীর্থ-ভ্রমণই বিধেয়।

তীর্থ স্থানগুলির কথা বলতে হলেই স্বতঃই মনে হবে কোন সে যুগের বৃন্দাবন বা অযোধ্যা, কাশী বা কামাখ্যা কি এখনও সেই ভাবেই

আছে। হাজার হাজার বছরের প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে কি তা নষ্ট বা স্থান-ভ্রষ্ট হয় নি ? অনেকে যেমন বলেন বর্ত্তমান কাশী সে কাশীই নয়—

তবে মতবাদ বা মতান্তর যাই হোক—অতীত-দ্রষ্টা ঋষি বা ভক্ত, বিশেষ লক্ষণযুক্ত স্থানকে বিশেষ কোন তীর্থরূপে যখনই তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, আস্তিক হিন্দু তাকেই পরমধাম মনে করে নিয়েছেন। কারণ সর্ব্ব ভূতে সর্ব্বব্যাপী যিনি, তার অবস্থান বা স্পর্শে কোন্ ভূ-খণ্ডই বা মহাতীর্থ নয় ?

তবু হিন্দু-সন্তান ভারতে মহাতীর্থ বলতের প্রাচীন কালেই বলেছে—অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বার) কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা ও দ্বারাবতী। এই সপ্ততীর্থই মোক্ষদায়িনী।

অযোধ্যা—সূর্যবংশীয় রাজাদের রাজত্ব—এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের প্রথম রাজধানী। কীর্ত্তিগাথা নিয়ে আজও সরযূতীরে এই অযোধ্যা।

অনেকে বলেন অযোধ্যা রাজ্যের রাজধানী ছিল লক্ষণাবতী। লক্ষণ এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা। লক্ষণাবতী থেকেই হয়তো লক্ষ্ণৌ নাম।

মথুরা—মহারাজ কংসের রাজধানী - যমুনার তীরে ছিল অবস্থিত। আজও যমুনাতীরে বিশ্রামঘাট প্রাচীনদিনের স্মৃতি জাগায়। মথুরায় —শ্রীকেশবদেব, দ্বারকাধীশ। বিশ্রামঘাট, ধ্রুবঘাট, যমুনাবাগ, মথুরানাথ, বঙ্গেশ্বর মহাদেব কংসটিলা, বাসুদেবঘাট, গোকুল, গোকর্ণেশ্বর প্রভৃতি। বহু দেবালয় আজও বর্ত্তমান।

গোকুল—এই গোকুলেই ছিল দ্বাপরে নন্দরাজার ঘর। এই গোকুলেই বসুদেব কৃষ্ণকে কংস কারাগার থেকে এনে নন্দগৃহে রেখে যান : কৃষ্ণের শৈশব কাটে এই গোকুলে। কিন্তু তারুণ্যের রক্ত যখন এল দেহে তখন মন ছুটলো শ্রীবৃন্দাবনে।

বৃন্দাবন পরম রমণীয় স্থান। লীলাময় কৃষ্ণের লীলাস্থান। ভারতীয় বৈষ্ণব-তত্ত্বের রসপ্রবাহে বৃন্দাবন ভরপুর। বৃন্দাবনকে ঘিরেই ব্রজমণ্ডল, এই যেখানে গোপীগণ সহ কৃষ্ণের গোচারণ, গোবর্দ্ধন ধারণ, কালীয় দমন ও রাসাদি লীলা হয়েছিল।

ব্রজধামে—৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা করতে হয়। লীলাময়ের লীলাস্থানগুলি দেখাই বন-পরিক্রমার উদ্দেশ্য।

হরিদ্বার—(মায়া) ষাটহাজার সগরনন্দন কপিলের ক্রোধে ভস্ম হবার পর ভগীরথ গঙ্গা-বারিতে সেই মৃত সগরনন্দনগণকে বাঁচাবার জন্য গঙ্গাকে আবাহন করলেন এবং হিমালয় থেকে গঙ্গা-প্রবাহ বইয়ে নিয়ে এলেন ভারতের বুকে—সাগরদ্বীপে।

সে ধারা প্রথম নির্গত হয় গোমুখী থেকে, আর পতিত হয় ভারতের বুকে এই হরিদ্বার। এখানে দুটি ধারায় গঙ্গা প্রবাহিতা—পশ্চিমধারা ও কুশাবর্ত্ত। পশ্চিম ধারার তীরেই সব তীর্থাদি—কুশাবর্ত্ত তীরে শ্রাদ্ধাদি করা হয়। পর্ব্বতবেষ্টিত হরিদ্বার স্বভাব-শোভায় অপূর্ব্ব। হরিদ্বারের অদূরেই ভীমঘোড়া ও চণ্ডীর পাহাড়।

কাশী—কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে, কি শিক্ষা বা সাধন-দীক্ষায় প্রাচীনতম কাল থেকে কাশী পরমধাম ও মহানগরী। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, উত্তরবাহিনী গঙ্গাতীরে—গঙ্গাবক্ষ থেকে প্রায় ৭০ হাত উচ্চে এই নগরী প্রতিষ্ঠিত। কাশী প্রবেশ কালীন সেতু থেকে যাত্রীরা বরুণা ও অসির মধ্যবর্ত্তী বারানসীর যে শোভা দেখতে পান তা সত্যই অপূর্ব্ব!

পৌরাণিক আখ্যান মতে মহা প্রলয়ের পর ব্রহ্মা যখন বাস্তব সৃষ্টির জন্য এক মূর্ত্তির কল্পনা করেন, তখন যে মূর্ত্ত হলো প্রকট, তাই অনাদিদেব বিশ্বেশ্বর এবং পরমাশক্তি পার্ব্বতী। এই বিশ্বেশ্বর ও পার্ব্বতী নিজ বিহারের জন্য এই কাশী ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এখন এই কাশীক্ষেত্রের পালক ও পোষকরূপে কোন শক্তিমান ব্যক্তি চাই। বিশ্বেশ্বর তো ভোলানাথ। তাই পার্ব্বতী ও ভোলানাথের ইচ্ছায় বিষ্ণু আবির্ভূত হলেন। মহাদেব তাঁর নাম দিলেন 'মহাবিষ্ণু,' এই মহাবিষ্ণু প্রথমেই তাঁর চক্রের দ্বারা একটি পুষ্করিণী খনন করেন। তাঁরই স্বেদজলে এই পুষ্করিণী। মহাবিষ্ণু এই পুকুরের পাশে বসে পঞ্চাশ হাজার বছর তপস্যা করেন। তপস্যায় তুষ্ট শিব আনন্দে আত্মহারা হলেন। তখন তাঁর কর্ণ থেকে মণি-খচিত অলঙ্কার পড়লো

মাটিতে। এই পবিত্র ভূমির নাম হ'লো মণিকর্ণিকা। কাশীধামের প্রধান আকর্ষণ বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ ও মন্দির। প্রাচীন বিশ্বনাথ মন্দির মোগল অভিযানে ভগ্ন। বর্ত্তমান মন্দির পরবর্ত্তী কালের—এ মন্দিরের উপরের অংশ স্বর্ণমণ্ডিত। মহারাজ রণজিৎ সিংহ একবার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তিনি রোগ-মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন বিশ্বেশ্বরের কাছে। আরোগ্য হবার পর ঐ মন্দিরকে স্বর্ণমণ্ডিত করে দেন। এতদ্ব্যতীত অনাদিলিঙ্গ কেদার, জ্ঞানবাপী, সঙ্কটা, চতুঃষষ্ঠী, বহু দেবমূর্ত্তি এখানে আছে। প্রবাদ ভারতের সব তীর্থ-প্রতীকই এখানে বর্ত্তমান।

কাঞ্চী—ভারতের সপ্তমহাতীর্থের অন্যতম। কাঞ্চী আবার দুটি—বিষ্ণুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চী। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের অর্চনা হয় পঞ্চলিঙ্গে—পঞ্চস্থানে।

এই শিবকাঞ্চীর একাম্রনাথ ক্ষিতিলিঙ্গ, শ্রীরঙ্গমের জম্বুকেশ্বর অপলিঙ্গ, তিরুবান্নামলয়ে তেজোলিঙ্গ, কালহস্তীতে মরুৎলিঙ্গ এবং চিদম্বরে ব্যোমলিঙ্গ। এখানে পার্ব্বতী ও কামাখ্যার মূর্ত্তি আছে এবং তাদের উৎসবে মেলা বসে। কিছু দূরে বালাজী মন্দির—পর্ব্বতোপরি এই মন্দিরটি অপূর্ব্ব ; মূর্ত্তিও সুন্দর।

অবন্তিকা—নর্ম্মদার উত্তরে শিপ্রা নদী তীরে এই অবন্তিকা প্রাচীন বহু কাহিনী ও কাব্যের ধারক। রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী।

দ্বারাবতী- দ্বারকা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত তীর্থ। বর্ত্তমান গুজরাট প্রদেশের প্রায়-দ্বীপে অবস্থিত। ভেট দ্বারকা বা দ্বারকার বহু মন্দির ভারতীয় ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন।

একান্ন পীঠ—পৌরাণিক এক কাহিনীতে পাই ৫১টি পীঠস্থানের কথা। দক্ষ-অবমানিত শিবের অপমানে দেহ ত্যাগ করেন সতী। মৃতা সতীর দেহ নিয়ে উন্মত্ত নর্ত্তনে নাচেন নটরাজ। সতীর ৫১টী অঙ্গ একান্ন স্থানে পতিত হয়- এইভাবে ৫১টি তীর্থ পাই। হিঙ্গুলায় পতিত হয় ব্রহ্মরন্ধ্র বক্রনাথে ভ্রু-মধ্য, শর্করায় ত্রিনেত্র, তারায় চক্ষুতারকা, করতোয়ায় বাম কর্ণ, কর্ণাটের শ্রীপর্ব্বতে দক্ষিণ কর্ণ, বারাণসীতে কুণ্ডল, সুগন্ধায়

নাসিকা, গোদাবরীতে বাম গণ্ড, গণ্ডীতে দক্ষিণ গণ্ড, শুচিদেশে উর্দ্ধ দন্তপংক্তি, পঞ্চ সাগরে অধো দন্তপংক্তি. পাঞ্জাবের জ্বালামুখীতে জিহ্বা, ভৈরব পর্ব্বতে ওষ্ঠ, প্রভাসে মথুরা মণ্ডলে জনস্থানে চিবুক, কাশ্মীরে কণ্ঠ, শ্রীহট্টে গ্রীবা, মিথিলায় বামস্কন্ধ, বড়া বলীতে দক্ষিণ স্কন্ধ, প্রভাসখণ্ডে জলন্ধরে বাম স্তন, রামগিরি চিত্রকূটে দক্ষিণ স্তন। বৈদ্যনাথে হৃদয়, বৈবস্থতে পৃষ্ঠ. কাটোয়ার কেতু গ্রামে বামবাহু, বক্রেশ্বরে দক্ষিণ বাহু, উজানিতে বাম কনুই, রণখণ্ডে দক্ষিণ কণ্ঠ, মানসসরোবরে বামহস্ত, চট্টগ্রামে দক্ষিণ হস্ত, মনিবন্ধে বাম মনিবন্ধ, মানবেদে দক্ষিণ মনিবন্ধ. প্রয়াগে হস্তাঙ্গুলি, উৎকলে নাভি, হরিদ্বারে জঠর, কোঁকে কক্ষ বোলপুর কোশাই নদী তটে--কাঞ্চীতে কঙ্কাল, কালমাধবে বাম নিতম্ব, নর্ম্মদায় দক্ষিণ নিতম্ব, কামরূপে যোনী, নেপালে মলব ও স্রোতায় জানুদ্বয়, জয়ান্তিয়ায় বাম জঙ্ঘা. নেপালের মগবে দক্ষিণ জঙ্ঘা, তিরোতায় বাম চরণ, ত্রিপুরায় দক্ষিণ চরণ, বৃন্দাবনে স্কন্ধ, বর্দ্ধমান ক্ষীর গ্রামে দক্ষিণ পদাঙ্গুলী কালীঘাটে বাম পদাঙ্গুলী, তমলুকের বিভাসে বাম গুল্‌ফ, কুরুক্ষেত্রে দক্ষিণ গুল্‌ফ।

তাছাড়া প্রয়াগের ত্রিবেণীসঙ্গম, পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য গয়া—ও চার ধাম রামেশ্বর, কামাখ্যা, দ্বারকা ও নেপালের পশুপতিনাথ হিন্দুর প্রধান তীর্থ রূপে পরিকল্পিত।

ভারতের বহু তীর্থ পৌরাণিক দেবসমাগমে এবং বহু তীর্থ ভক্ত সম্মিলনে মহাতীর্থের সম্মান পেয়েছে। কোথায়ও গড়ে উঠেছে স্থাপত্য শিল্পের আদর্শ রূপে বিরাট দেউল, কোথায়ও নিভৃত গিরি গুহায় অতীত স্মৃতির সংরক্ষণ। কোন তীর্থের ঘটনা নিয়ে দেবদেবী জড়িত, কোন তীর্থ ভক্ত জীবনীর মাধুর্য্যে মহিমান্বিত। আমরা তারই দু'একটী উদাহরণ দিচ্ছি।

গয়া--গয়া হলো হিন্দুর এক পরমতীর্থ। পুরাণে আছে— ত্রিপুরাসুরের ছেলে গয়াসুর ছিলেন পরম বৈষ্ণব ও হরিভক্ত। ভক্তের আহ্বান ভগবান প্রত্যাখ্যান করেন না এই জেনে, আর দেবগণ কর্ত্তৃক পিতৃবধের বৃত্তান্ত শুনে তিনি দেবদ্বেষী হয়ে উঠলেন।

ব্রহ্মা কৌশল করে দেবগণ সহ গয়াসুরের অতিথি হন। অতিথি সেবায় গয়াসুর বিমুখ নন। ব্রহ্মা গয়াসুরকে দিয়ে এক যজ্ঞের আয়োজন করালেন, কিন্তু সে যজ্ঞ হবে গয়াসুরের দেহের উপর। গয়াসুর অতিথিদের অভিলাষ পূর্ণ করলেন। তিনি ভূতলে শয়ন করলেন। যজ্ঞকুণ্ডের পরিবর্ত্তে তাঁর দেহই হলো যজ্ঞ ভূমি। কিন্তু দেহ তো নির্জীব নয়। শ্রীহরি ভক্তের মাথায় রাখলেন পাদপদ্ম। ইষ্টদেবের শ্রীচরণ মাথায় পেয়ে গয়াসুর নিশ্চল হয়ে গেলেন। যজ্ঞ শেষ হলো —ভক্তের ভগবান তখন তাঁর কামনা পূর্ণ করতে ব্যগ্র হলেন।

গয়াসুর বললেন, যদি করুণাই করবে প্রভু, তবে এই কর যেন আমার দেহোপরি এই শিলায় সকলেই করেন নিজ নিজ পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ —সর্ব্ব দেবতা যেন থাকেন এই তীর্থের মাটিতে আসীন এবং সব পিতৃলোক যেন মুক্ত হয় তোমার এই শ্রীপাদ-চিহ্নিত শিলায় পিণ্ড-দানে।

শ্রীহরি বললেন, তথাস্তু। তাই আজও গয়াসুরের নিশ্চল দেহস্থিত পবিত্র শিলাপীঠে হিন্দুরা পিতৃ-পুরুষকে পিণ্ড দেয়।

গয়ার এই পবিত্র ভূমি পরবর্ত্তী যুগে গৌতম বুদ্ধদেবকেও আকর্ষণ করেছিল। এইখানেই বোধিদ্রুমতলে তিনি বোধপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই গয়াতীর্থে ৪৫টি তীর্থস্থান আছে। তার মধ্যে ফল্গু নদী, প্রেত-শিলা রামশিলা, ব্রহ্মযোনি পাহাড়, অক্ষয়বট, গদাধরের পাদপদ্ম, সীতাকুণ্ড, ব্রহ্মযোনি, ভীম পাহাড় প্রসিদ্ধ।

প্রকৃতির দান রূপে মহাতীর্থ হয়েছে—

প্রয়াগতীর্থ—গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মিলনক্ষেত্র এই প্রয়াগ সঙ্গমে সরস্বতী অদৃশ্য। কিন্তু গঙ্গা যমুনার শ্বেত নীল ধারার মিলিত প্রবাহ এক অপূর্ব্ব শোভায় সমুজ্জ্বল। এইখানেই রাজা হর্ষবর্দ্ধন বৎসরান্তে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতেন।

বৌদ্ধযুগে মহারাজ অশোক এইখানে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আজও প্রাচীন কেল্লায় অশোক স্তম্ভটি দেখা যায়। তারপর ১৫৭৫ খৃঃ অঃ মোগল সম্রাট আকবর শহরটির সংস্কার করেন। এবং আল্লার

আবাস বা আবাদ রূপে নাম দেন আল্লাবাদ। আজ তা এলাহাবাদ।

গোদাবরী তীর্থ দাক্ষিণাত্যের কিছুদূরে স্বভাব-শোভায় সুন্দর গোদাবরী তীর্থ। গোদাবরী থেকেই ধারা ও উপধারা বেরিয়েছে। ৭টি—তারমধ্যে গৌতমী, বশিষ্ঠা বিশেষ খ্যাত। এই সাতটি ধারা নিয়েই গোদাবরী তীর্থ। আর তারই একটি কোকনদ।

প্রবাদ এখানেই শ্রীমন্ত সদাগর কমলেকামিনী দেখেন। কমলের অন্যনাম কোকনদ।

ভাগীরথী কৃষ্ণা, কাবেরী, তুঙ্গভদ্রা ও গোদাবরী—এই পঞ্চ নদী যেন দাক্ষিণাত্যের জল-সম্পদ। তীর্থও দাক্ষিণাত্যে শতশত। তন্মধ্যে শ্রীশৈলম, তিরুপতি, তিরুমলয় বা ভদ্রচলম বিখ্যাত।

দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের চিরন্তন সাক্ষ্য।

পুরী—দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য-প্রভাব আমরা দেখি এদিকে পুরীর মন্দিরে— ভুবনেশ্বর ও কোনারকের ভাস্কর্য্যে। জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি নিয়ে এই বিরাট মন্দিরে অস্পৃশ্যতাকে বর্জ্জন করেছে। মন্দির গাত্রে অশ্লীল মূর্ত্তি মনকে একটু ক্ষুব্ধ করে বটে কিন্তু এর বিরাটত্বের মহিমা যেন সব ভুলিয়ে দেয়। এখানে অন্য বহু দর্শনীয় দেবমন্দির আছে। ভুবননেশ্বর ও কোনারক—প্রতি যাত্রীর দর্শনীয় স্থান।

ভারতে তীর্থের শেষ নাই—দ্বারকা থেকে সুরু ক'রে কামাখ্যা—কন্যাকুমারিকা বা রামেশ্বর থেকে সুরু ক'রে বদ্রিনাথ ও কেদারনাথ পর্য্যন্ত—শতসহস্র দেবদেবীর মন্দির ও তীর্থ—এ গ্রন্থে তা বলা অসম্ভব। মহান ভারত তীর্থময়।

সাধক—ভারতের শিক্ষা পারঙ্গমতা লাভ করে সাধকের সাধনায়— তার জীবনের গতি মাধ্যম। ভারতে—লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে আছেন অসংখ্য সাধক। তারমধ্যে ব্যাস, বশিষ্ঠ বা পৌরাণিক যুগের কথা ছেড়ে দিলে এ যুগের—ঐতিহাসিক ধারার মধ্যে প্রথমেই পাই বুদ্ধ। তিনি কপিলাবস্তুর রাজকুমার—বোধ-প্রাপ্তি কামনায়, রাজ্য ও পরিবারবর্গ ছেড়ে গয়ায় বোধি বৃক্ষ-তলে লাভ করেন সেই জ্ঞান। জড়া, ব্যাধি

দেখেই তার মনে হয় বৈরাগ্যের কথা, তাই প্রকৃত শান্তিলাভে সত্য, অহিংসা ও প্রেমের মন্ত্র নিয়েছিলেন জীবনের চরম সাধনা করে।

শঙ্করাচার্য্য—তারপর পাই শঙ্করাচার্য্যকে। কেরল রাজ্যে ইহার জন্ম। অদ্বৈত মত প্রচার করেছিলেন কিন্তু তাঁর দ্বৈতবাদের পরাকাষ্ঠা দেখি নানা দেব দেবীর স্তব ও সাধনায়। বিরাট পাণ্ডিত ছিলেন তিনি। দিগ্বিজয় করেন নিজ পাণ্ডিত্যে এবং বদরীনারায়ণে যোশীমঠ, দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গারী বা বিদ্যামঠ, দ্বারকায় সারদামঠ এবং পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ স্থাপন করে বিশ্ব-ব্যাপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে নিজ ধর্ম্ম মতের প্রতিষ্ঠা করেন।

চৈতন্যদেব—১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর সন্তানরূপে ভগবৎ অংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করলেও, ভগবৎ আরাধনার নিকট তা অতি তুচ্ছ মনে করেন। দুই বার বিবাহান্তে ভগবৎপ্রাপ্তির কামনায় সংসার ত্যাগ করতঃ তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন সুরু করেন ও অসংখ্য ভক্তের মনে ভক্তির ধারা প্রবাহিত করেন। নাম কীর্ত্তন, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও প্রেম বিতরণই তার মুখ্যধর্ম্ম।

এর পরই আমাদের মহান ভারতে যবন করলো আগমন, আর সে দুর্যোগের মধ্যে নানা রূপে ভগবৎ আবেশে নানা সাধকের হয় আবির্ভাব। তার মধ্যে-রামানুজাচার্য্য, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, রামদাস, কবীর, ভাস্করানন্দ, দয়ানন্দ, তুকারাম, তুলসীদাস, কবীর, নানক, যবন হরিদাস, হরিদাস সাধু, রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, আউলচাদ, উদ্ধারন ঠাকুর, পওহারী বাবা রূপসনাতন, বিশুদ্ধানন্দ, বামাক্ষেপা, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্যামাকান্ত, জগদ্বন্ধু হরিহর বাবা, অরবিন্দ প্রভৃতি মহামানবগণ অবতীর্ণ হন।

মহান ভারতের সমস্ত সাধনা তার অধ্যাত্ম পথে—চরম কামনা তার মোক্ষ। তাইতো জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে ঐশ্বর্য্যে বিশ্বের বিস্ময় হয়ে সে আজও মাটির পুতুলে দেবতার দেখা পায়, অন্তরের মাঝে পরম সুন্দরকে অনুভব করে। আজও মহান ভারতের মাটিতে, নদীতে,

অরণ্যে, কান্তারে, সেই অতীত কথাই ধ্বনিত হয়—"ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি"—ভূমাকে লাভ করাই সুখ, অল্পে সুখ নাই।"

ভেদ, বিভেদ ভুলে গিয়ে যে ভারতের পতঞ্জলি বলতে পেরেছেন "যথাভিমত ধ্যানাদ্বা"—"যেরকম চাও সেইভাবে তাঁকে ধ্যান কর"—

যে দেশের—রাম পিতৃ আজ্ঞায় বনবাসী, লক্ষণ ভ্রাতৃ-অনুসারী,

যে দেশের—রাজকুমার বোধ-সাধনায় রাজ্যসুখ, স্ত্রী-পুত্রত্যাগী,

যে দেশের—নারী বলেছেন—যা দ্বারা অমৃত লাভ হবেনা—তা দিয়ে আমার প্রয়োজন কি?—

যে দেশের রাজা শপথ করেন—অভিষেক মন্ত্রে—'যে দেশে জন্মেছি আর যে দেশে মরবো—তার মধ্যে সাধিত সমস্ত সৎকর্ম্মে ফল এবং আমার পরলোক যেন নষ্ট হয়, সন্তান সন্ততি থেকে যেন হই বঞ্চিত যদি প্রজাদের উপর করি অত্যাচার'—

যেদেশের—আস্তিক ঋষি বলে গেলেন—

রুচিণাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানাপথযুষাং।
নৃণামেকো—গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব"—

রুচিভেদে পথভেদ—কিন্তু সব ধারাই এক সমুদ্রে মিশেছে—

যে দেশের মাটিতে আমার ভগবৎ কৃপায় আমাদেরই যুগে পেয়েছি —সাধক বুদ্ধ, প্রচারক শঙ্কর, ভক্ত চৈতন্য, পর্য্যটক বিবেকানন্দ—আর বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ—

সেই রাম, কৃষ্ণ, সীতা, সাবিত্রী, বুদ্ধ, শংকর ও রামকৃষ্ণের দেশকে আমরা বারবার নমস্কার করি।

শুভায়-ভবতু

—জনৈক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর চিত্রানুলিপি

●
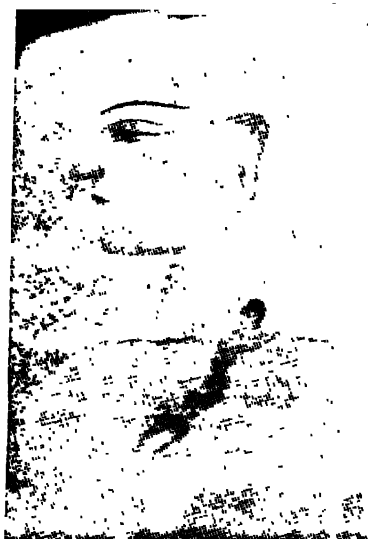
মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম, এ, পি, এইচ, ডি

ডক্টর অমরেশ্বর ঠাকুর বেদান্ততীর্থ এম, এ, পি, এইচ, ডি

তারকেশ্বর মঠাধীশ শ্রীমৎ দণ্ডী স্বামী হৃষিকেশ আশ্রম

কাশীরাজ সভাপণ্ডিত শ্রীশ্যামাকান্ত তর্ক পঞ্চানন

মহামহোধ্যাপক শ্রীতারাচরণ সাহিত্যাচার্য্য

প্রভৃতি মহোদয়গণের উপদেশ, শুভেচ্ছা ও আশিস

এবং

কাশীরাজকীয় সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিভূতিভূষণ ন্যায়াচার্য্য,

ডক্টর শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, বি, এল, এম, এস, সি, পি, এইচ, ডি

ডক্টর সুকুমার মুখোপাধ্যায়, এম, এস, সি, পি, এইচ, ডি

অধ্যাপক বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম. এ

'হিমাদ্রি' সম্পাদক—শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য

অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ

বিচারক শ্রীমতিলাল চক্রবর্ত্তী, (রিটায়ার্ড)

ব্রিঃ গায়নার টেগোরস মেমোরিয়াল ইনষ্টিটিউশনের

প্রিন্সিপল ব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য এম-এ,

আমেরিকা উটা গবেষণাগারের স্নাতক, গবেষক

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এস, সি, পি, এইচ, ডি

আমেরিকাস্থ নৃ-তত্ত্ববিদ্ শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এস, সি

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ভিষগ্‌শাস্ত্রী

কবিরাজ বিন্দুমাধব ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ

প্রভৃতি হিতৈষীবর্গের উৎসাহ ও প্রেরণার প্রশস্তি-চিহ্নে এ গ্রন্থ স্বাক্ষরিত।

তাঁহাদের জানাই কৃতজ্ঞ চিত্তে প্রণতির

পাণ্ডুলিপি দেখে যাঁরা আশীর্ব্বাণী পাঠিয়েছেন তাঁদের সে স্নেহলিপি মুদ্রিত হয়েছে প্রথম পর্ব্বে।

আমার কথা—

আমি গ্রন্থ-ব্যবসায়ী নই। এ বইখানি ছাপিয়ে ব্যবসা করতেও আসিনি তবে কেন এই বই ছাপালাম — এ একটা রহস্য বটে!

নিজের সন্তান-সন্ততির জন্য ছোট বড় অনেক বই কিনেছি— হাসি গল্প, নাটক, নভেলও কিনেছি—কিনেছি নিজের জন্য অনেক ধর্ম-গ্রন্থ।

কিন্তু মন-প্রাণ দিয়ে যা ভাবতে চাই, যখন বুঝতে চাই আমাদের ধর্ম্মের নানা অনুষ্ঠানের কথা, আমাদের বেদ বেদান্তের কথা—যখন ছেলেদেরও তা জানাতে চাই, বোঝাতে চাই— তখনই লাগে গোল। সমাধান—পণ্ডিত হয়ে সে সব গ্রন্থ পড়, নয় তো সব ছেড়ে গুরুগৃহে যাও শুনতে। কিন্তু তা হয় কই! ছেলেদেরও স্কুল, কলেজ, সিনেমা আর খেলা আছে—আমাদেরও অফিস, আদালত, বিশ্রাম আর আরাম আছে—তবে আমাদের দেশের কথা জানি কি করে?

অথচ সত্যই সব জানতে চাই—ইচ্ছে হয় ছেলেদের সব বোঝাই। বিজ্ঞানের যুগে, মন্ত্রের মানে করে আধুনিক মতে আর পথে যদি তাদের বোঝাতে পারি—প্রাচীন ভারত সে সব কথাই বলেছে, হয়তো বেশভূষায় সাহেব সেজেও তারা নিজের দেশকে জানবে, বুঝবে, ভালবাসবে।

তাহলেই চাই সহজ ভাষায় লেখা বই আর সংক্ষেপে লেখা বই। আমাদের ভারতের বেদ, বেদান্ত, দর্শন—আমাদের স্মৃতি, শ্রুতি, পূজা, যজ্ঞ, অনুষ্ঠান, পর্ব্ব, তীর্থ—সবই তার অপূর্ব্ব।—তার ওপর জ্ঞান বিজ্ঞানেও প্রাচীন ভারত পিছিয়ে ছিল না, ছিল অর্ণবযান, ব্যোমযান, শতঘ্নী, শব্দভেদী—ছিল ক্রম-বিকাশ-তত্ত্ব, জ্যামিতি, বীজগণিত, জ্যোতিষ সব।

মহান ভারতে—প্রথম পর্ব্বে বলা হয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব, অণু-পরমাণু আর ঐশী শক্তির কি সম্বন্ধ—বলা হয়েছে গ্রহ আর গ্রহণের কথা—কেন ঐ নক্ষত্রের নাম অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা— নামের মধ্যে পৃথ্বীর গঠন ও গতির ব্যাখ্যা।

তারপর কবে এল আর্য্য সন্তান ভারতে—কেন এলো, অন্য আর্য্যের দল বিশ্বের কোথায় কোথায় ছড়াল—গেল কি তারা ঐ রাশিয়া আর আমেরিকায়? বলা হ'লো আর্য্যদের সব বংশ কথা—গল্প-গাথায়।

ভারতের বিষয় যা জানা প্রয়োজন—সাধারণ মানুষ যা কিছু জানতে চায়—তাই সংক্ষেপে সরলে বোঝাবার চেষ্টা করেছে এই মহান ভারত। মহান ভারত তাই চায়। ইতি—

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়